তারিক
ইবনে
যিয়াদ
মাওলানা
সাদিক
হুসাইন

মাওলানা সাদিক হুসাইন

তারিক ইব্ন যিয়াদ

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

ফরিয়াদ ৯
বিস্ময়কর স্বপ্ন ১৫
রওয়ানা ১৯
সুসংবাদ ২৪
অপর এক মজলুম ২৮
যুদ্ধ ৩৭
পরাজয় ৪৩
বন্দীকরণ ৪৬
পশ্চাদ্ধাবন ৫১
পলাতকগণ ৫৪
সম্রাট রডারিক ৫৮
দুই বৃদ্ধ রক্ষী ৬২
ভয় ৬৬
সামরিক চুক্তি ৭১
রহস্যময় গম্বুজ ৭৬
গম্বুজের গোপন রহস্য ৮০
প্রস্থান ৮৪
নিখোঁজ ৮৭
দুঃখজনক সংবাদ ৯২
সাহায্যকারী বাহিনী ৯৬
একটি সুন্দর প্রতিকৃতি ১০০
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১০৪

দ্বিতীয় ভাগ

বিলকীস হারিয়ে যাওয়া ১০৯
বিরাট বিজয় ১১৩
অগ্রযাত্রা ১১৮

প্রকৃতির ভাণ্ডার ১২২
অহংকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায় ১২৫
মালাগা বিজয় ১২৯
হারানো প্রিয়তমা ১৩৩
রূপের রানী বিলকীস ১৩৭
জিহাদী প্রেরণা ১৪১
দুঃসাহসী অভিযান ১৪৫
দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদীন ১৪৯
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১৫৩
কর্ডোভা বিজয় ১৫৮
অদ্ভুত কৌশল ১৬২
ফরমান ১৬৭
টলেডো বিজয় ১৭১
সুন্দরী রাহীল ১৭৬
বিচ্ছিন্নদের পুনর্মিলন ১৮১
বিজয়ের বন্যা ১৮৬
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ১৯২
শহীদী বুরুজ ১৯৬
স্বপ্নের ব্যাখ্যা ২০১
মোহময়ী নারী ২০৫
হৃদয়ের আকর্ষণ ২০৯
নতুন সিদ্ধান্ত ২১৪
মহান বিজয়ীর অপসারণ ২১৯
বিদ্রোহের শাস্তি ২২৪
স্পেনের শাসক ২২৮
প্রতারক খ্রিস্টান ২৩৩
অপর এক বিজয় ২৩৭
সুন্দরীদের আনন্দ ২৪১
তাদমীরের চালাকি ২৪৫
তাদমীরের বুদ্ধিমত্তা ২৪৯
তুষ্ট লোকদের আকাঙ্ক্ষা ২৫৪

প্রকাশকের কথা

ইসলামের ইতিহাসে স্পেন বিজয় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। মুসলমানদের স্পেন বিজয়ে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন তারিক ইবনে যিয়াদ। একজন অসম সাহসী ও রণকৌশলী যোদ্ধা হিসেবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত বীর সেনানীদের অন্যতম। ছোটবেলায় তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আফ্রিকার মুসলিম অঞ্চলের সেনাপতি, শাসক মূসা ইব্‌ন নুসায়ের-এর তত্ত্বাবধানে। যৌবনে তিনি তাঁরই অধীনে সামরিক বাহিনীতে অফিসার পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং নিজের যোগ্যতাবলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে মরক্কোর তানজারের গভর্নর নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি মুসলিম বাহিনীর স্পেন অভিযানের নেতৃত্ব লাভ করেন।

স্পেন ছিল তখন মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল থেকে সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ইউরোপ মহাদেশের খ্রিস্টানপ্রধান একটি দেশ। এ দেশটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের তেমন কোন ধারণা ছিল না। এ সব কারণে স্পেন অভিযান ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, বিপদসংকুল এবং দুরূহ অভিযান। কিন্তু এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কুশলী সমরনায়ক তারিক দমে যাননি।

সীমিত অস্ত্র ও জনবল নিয়ে একের পর এক যুদ্ধে তুলনামূলক উন্নত অস্ত্রবল ও অশ্বারোহী বাহিনী সমৃদ্ধ স্পেনীয়দের পরাজিত করে তারিক যে বিজয় অর্জন করেন তা ইতিহাসে অনন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক। ঘোরতর সংকটকালে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেন। তারিক ইবনে যিয়াদ শুধু রণকৌশলী সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক, সর্বোপরি ইসলামের একজন মহান সেবক।

স্পেন বিজয়ে ইউরোপের মাটিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে প্রায় সাতশত বছর মুসলমানরা স্পেন শাসন করেন। এ সময়ের মধ্যে স্পেন হয়ে উঠে গোটা ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। আজকের ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের অকল্পনীয় উন্নতির ভিত্তি রচিত হয়েছিল স্পেনের মুসলিম আমলের শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে। সমগ্র ইউরোপের শিক্ষার্থীরা দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও স্থাপত্যকলা শিক্ষার জন্য স্পেনের কর্ডোভা ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভিড় জমাতো। এদিক থেকে বিচার করলে তারিক শুধুমাত্র স্পেন বিজয়ী বীরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ নতুন এক সভ্যতার ভিত্তি নির্মাতা।

ইসলামের ইতিহাসের এ অমিত বিজয়ী বীরের উপর অনেক বই-পুস্তক রচিত হলেও তাঁকে নিয়ে কথাসাহিত্য রচিত হয়েছে খুবই কম। মাওলানা সাদিক হুসাইন এ শূন্যতা পূরণ করেছেন উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর উপন্যাস 'তারিক ইবনে যিয়াদ' শীর্ষক উপন্যাসটির মাধ্যমে। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য বইটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এটি ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আশা করি, গ্রন্থটি এবারও সুধী পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় নাম তারিক ইব্ন যিয়াদ। একজন অসীম সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তাঁর নাম বিশ্ববিশ্রুত। লেখক মাওলানা সাদিক হুসাইন একজন ঐতিহাসিক ও উর্দু ভাষার একজন কথা সাহিত্যিক। ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখক সে মহান বিজয়ীর চরিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বইটি একটি উপন্যাস; কিন্তু লেখক কোথাও কোন চরিত্রে অতিমানবিক গুণাবলী আরোপ করার চেষ্টা করেন নি; বরং ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণে লেখকের সংযমী ভাষা কাহিনীকে করে তুলেছে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী।

ইসলামের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ তারিক ইব্ন যিয়াদের 'ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দুর্বার সংকল্প' নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির জন্য তাঁর দরদ ও আকুতি আমাদের প্রেরণার উৎস। সে মহান বিজয়ীর অজানা ইতিহাসকে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গ্রন্থখানি নির্বাচন ও অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছেন শ্রদ্ধেয় জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। বলতে গেলে তাঁর একক উৎসাহেই আমি বইটির অনুবাদ শুরু করি। পরে আমার সহধর্মিণী বেগম জাকিয়া পারভীনের ব্যক্তিগত প্রেরণা ও উৎসাহে অনেক বিলম্বে হলেও বইটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হই। বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরীতেও তিনি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে জনাব মনসুর উদ্-দোলাহ্ পাহ্লোয়ানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। মূলত তাঁর একক প্রচেষ্টায়ই স্বল্প সময়ে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। বইটি প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে তাঁদের সকলের কথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পাঠকের কাছে বইটি ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব– আল্লাহ্ হাফিজ।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

সন্তানের সুখ প্রচেষ্টায়
যাঁরা জীবন করেছেন দান,
সেই আব্বা ও আম্মার স্মরণে–

প্রথম ভাগ

এক

ফরিয়াদ

দিনটি ছিল শুক্রবার। কায়রোর মুসলিম বাসিন্দারা জুমআর নামাযে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কায়রো আফ্রিকা মহাদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। সে শহরে মুসলিম আরব সাম্রাজ্যের ভাইসরয় বা রাজ-প্রতিনিধি বাস করেন। তাঁর নাম মূসা ইবন নুসায়র।

তিনি ছিলেন খুবই সাহসী, বিচক্ষণ ও কৌশলী ব্যক্তি। খলীফা তাঁকে 'আমীর-ই-খলীফা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল অভিযানে তিনি যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। খ্রিস্টান জগতেও তাঁর বেশ পরিচিতি ছিল। তিনি ছিলেন একজন উঁচুমানের শাসক। ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর শাসনে কেবল মুসলিম অধিবাসীরাই সন্তুষ্ট ছিল না; অমুসলিম প্রজারাও ছিল তাঁর প্রশংসামুখর।

হিজরী ৯৩ সালের ঘটনা। সে সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা ছিলেন ওয়ালিদ ইব্ন আবদুল মালিক। তাঁর রাজধানী ছিল দামেশ্ক। কায়রো শহর মুসলমানরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শহরটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক একটি চমকপ্রদ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হিজরী ৬০ সালে মুআবিয়া ইবন ফুদায়হ আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল জয় করে নৈসর্গিক দৃশ্যে সুশোভিত একটি সুন্দর উপত্যকায় উপস্থিত হন। স্থানটি তাঁর এতই পছন্দ হয় যে, তিনি সেখানে একটি শহর প্রতিষ্ঠার মনস্থ করেন। কিন্তু সমস্যা হলো, পুরো উপত্যকা তখন নানা প্রকার হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও সাপ জাতীয় প্রাণীতে ভর্তি ছিল। সেখানে তখন মানুষের বসতি স্থাপন কিংবা কোন শহর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু মুআবিয়া ইব্ন ফুদায়হ সেখানে একটি শহর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে উপত্যকার অদূরে শিবির স্থাপন করেন।

একদিন ফজরের নামাযের পর ঘন বৃক্ষের সারি ও ডাল-পালা অতিক্রম করে তিনি সে উপত্যকায় পৌছান। উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, "হে জন্তু-জানোয়াররা, বনকুঞ্জ সুশোভিত এ ছায়াঘেরা অঞ্চলে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করতে চায়। তারা রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর আদর্শের অনুসারী মুসলিম জাতি এবং আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ। তোমরা এ স্থান ছেড়ে চলে যাও। এখন থেকে এটা আর তোমাদের আবাস নয়।"

এই বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। পরপর তিনদিন তিনি সেখানে গিয়ে একই বাক্য উচ্চারণ করেন। তৃতীয় দিন সকল জীবজন্তু সে উপত্যকা ছেড়ে চলে যায় এবং সেটি সম্পূর্ণরূপে একটি জন্তুমুক্ত স্থানে পরিণত হয়। একদিন এমন মুসলমানও ছিলেন, যাদের কথা জীবজন্তুরা পর্যন্ত মেনে চলত; কিন্তু এখন মুসলমানদের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, আমাদের কথা আমরা নিজেরাই মেনে চলি না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম যুগের মুসলমানরাই ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তাঁরা এত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, সব সময় তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুসরণ করতেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন এবং নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতি তাঁরা সব সময় খেয়াল রাখতেন। ফলে আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁদের দু'আরও প্রভাব ছিল। তাঁরা যা দু'আ করতেন, তা-ই কবুল হতো, তাঁরা যা আশা করতেন, আল্লাহ্ তা-ই পূরণ করতেন।

কিন্তু আমরা মুসলমান কেবল মুসলমানের সন্তান হিসেবেই পরিচিত। নতুবা আমাদের রীতিনীতি মুসলমানদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আমরা নামায পড়ি না, রোযা রাখি না, হালাল-হারাম বুঝি না, আমরা কিসের মুসলমান, কেন আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। উপত্যকা থেকে সব জীবজন্তু চলে যাওয়ার পরই মুআবিয়া ইবন ফুদায়হ সেখানে শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অল্পকালের মধ্যে সেখানে একটি বিরাট শহর গড়ে উঠে।

দূর-দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ী, কারিগর ও পেশাজীবী লোকেরা সেখানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফার প্রতিনিধি কায়রোয় বাস করতে শুরু করেন। তাতে শহরটির সৌন্দর্য আরো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ইসলামী শাসন ছিল, ইসলামী শহর ছিল, ইসলামী বিধিবিধান জারি ছিল। জুম'আর দিনে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট ও হাট-বাজার বন্ধ থাকত। সকাল থেকেই মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ বণিতা জুম'আর নামাযে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করত। আজকাল ঈদের দিনে আমাদের সমাজে নামাযে যাওয়ার যেমন ধুম পড়ে তখনকার দিনে জুম'আর নামাযে যাওয়ার তেমনি ধুম পড়ে যেতো। কায়রোয় তখন পঞ্চাশটি গোসলখানা ছিল। লোকজন সেদিন সকাল সকালই গোসল সেরে মসজিদে আসতে শুরু করে। সেদিন তাদের সকালে মসজিদে পৌঁছার কারণ, তারা শুনেছিল, সিউটা থেকে কয়েকজন খ্রিস্টান একটি ফরিয়াদ নিয়ে কায়রো এসেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের সেখানকার প্রতিনিধি মূসা ইবন নুসায়র আজ তাদের ফরিয়াদ শুনবেন। তাই সূর্য মধ্যগগনে হেলে পড়ার পূর্বেই পঞ্চাশ হাজার লোক সংকুলান উপযোগী কায়রোর বিরাট মসজিদটি মুসল্লিতে ভরে যায়। কয়েকজন মিনারে উঠে আযান দেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত

মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরপরই মূসা ইব্‌ন নুসায়র তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হন। বয়সের ভারে তিনি ছিলেন ন্যুব্জ, মুখে ছিল পাকা লম্বা দাড়ি, নূরানী চেহারা, প্রশস্ত ললাট এবং ডাগর ডাগর চোখ। আবদুল আযীয ছিলেন সুদর্শন ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী যুবক, মুখে ছিল সুন্দর কাঁচা দাড়ি।

মূসা মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন এবং জুম'আর নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি মিম্বারে উঠেন। সকল মুসল্লি নিজ নিজ স্থানে বসে থাকেন। সবার মাঝে গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল। মূসা প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণকীর্তন করে তিনি বলেন, হে মুসলিমগণ। আমরা মুসলমানদের জন্য এটা আল্লাহ্‌র এক বিরাট অনুগ্রহ, যে জাতি নিজেদেরকে খুবই সম্মানিত ও শক্তিধর বলে মনে করত, তারাই আজ ফরিয়াদীরূপে আমাদের দরবারে উপস্থিত হয়েছে। তোমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সিউটা[১] নামক একটি শহর রয়েছে। এটা একটি প্রদেশের রাজধানী। সে শহরের গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান একটি ফরিয়াদ নিয়ে আজই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। যদিও তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার জানা নেই তথাপি আমার ধারণা, তিনি স্পেনের খ্রিস্টান রাজা রডারিক কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছেন। খ্রিস্টান রাজাদের আরাম-আয়েস ও বিলাসের স্পৃহা এত বেড়ে গিয়েছে যে, জনসাধারণের আবরু-ইজ্জত ও জান-মালের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমি কাউন্ট জুলিয়ানকে তোমাদের সামনে ডেকে নিয়ে আসছি। আমি চাই, তোমরা সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন এবং সামনে আট-দশ জন লোক বসার মত জায়গা খালি করিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরই পাঁচ-ছয়জন খ্রিস্টান আসে এবং তারা মূসার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারা যেদিক দিয়ে যাচ্ছে, বসা লোকেরা তাদের জন্যে জায়গা করে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে মাঝারি বয়সের এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল গৌর। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে দামী রেশমী পোশাক, গলায় ছিল কয়েকটি মোতির মালা। তিনিই কাউন্ট জুলিয়ান।

সে দলে এক বৃদ্ধ ছিলেন, তার পরনে ছিল পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আবৃত এক লম্বা চৌগা, কোমর ছিল রেশমী ডোর দিয়ে বাঁধা, মাথায় ছিল উঁচু টুপি, মুখে নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। তিনি ছিলেন সেভিলের পাদ্রী। সে দলের অন্যরা ছিল জুলিয়ানের কর্মচারী। তারা মসজিদে ঢুকেই একবার চতুর্দিকে তাকান; মসজিদে এত লোকের সমাবেশ দেখে তারা বিস্মিত হন; তারা মূসার নিকট গিয়ে পৌঁছেন; মূসা দাঁড়িয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান।

১. সিউটা মরক্কোর উত্তর উপকূলে অবস্থিত একটি শহর। সে শহরে কনস্টানটিনোপল সম্রাটের মনোনীত একজন গভর্নর বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল কাউন্ট জুলিয়ান। কিন্তু শহরটি বহু দূরে ছিল। ইস্তাম্বুল থেকে তাই রোমান সম্রাট স্বেচ্ছায় উক্ত প্রদেশটি স্পেনের অধীনে ছেড়ে দেন।— লেখক

জুলিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা মূসাকে অভিবাদন জানান। তিনি হাসিমুখে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং তাদেরক বসতে দেন। তারা সবাই শান্তভাবে বসে পড়েন। মূসা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–বলুন, আপনারা কি বলতে চান।

জুলিয়ান বলেন, আমি নিপীড়িত-মজলুম। রাজা রডারিক আমার ইজ্জতের উপর আঘাত হেনেছে। সে এতই শক্তিধর ও প্রতাপশালী যে, ইতালী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের রাজারাও তাকে ভয় পায়। তার স্বভাব এতই হিংস্র যে, কেউ তার প্রতিশোধ নিতে পারবে না; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে না পারব, ততক্ষণ আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাপিত হবে না।

মূসা–সে আপনাকে কিরূপ অপমান করেছে?

জুলিয়ান–সে এক দুর্ভাগ্যের কাহিনী। অত্যাচারী রডারিক আমার বংশের মান-ইজ্জত ভূ-লুণ্ঠিত করেছে। এর পর সেভিলের পাদ্রী স্ক্যাফ বলেন, সে এক লজ্জাকর ও হৃদয়বিদারক কাহিনী হুযুর। আমার কাছ থেকে শুনুন। রডারিক এক লাম্পট্যজনক আচরণ করেছে। তাতে ধর্ম ও মানব সভ্যতায় হাহাকার পড়ে গেছে।

মূসা–আমি আরও বিস্তারিত শুনতে চাই।

স্ক্যাফ–আমিও আপনাকে বিস্তারিত বলতে চাই। আপনি তো জানেন স্পেনের বর্তমান রাজা রডারিক[১]।

মূসা–হাঁ, আমি জানি।

স্ক্যাফ–কয়েক যুগ ধরে স্পেনে এই রীতির প্রচলন রয়েছে যে, প্রত্যেক গভর্নর, দুর্গাধিপতি বা নগরপাল, প্রত্যেক নেতা, সভাসদ এবং উপদেষ্টাদের সন্তানরা প্রাপ্ত-বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত রাজা ও রানীর সান্নিধ্যে লালিত-পালিত হয়ে থাকে। ছেলেরা রাজার কাছে এবং মেয়েরা রানীর কাছে থাকে। রাজপ্রাসাদেই তাদের পড়াশোনা চলে। পরিণত বয়সে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তাদেরকে বিদায় দেয়া হয়।

মূসা–এ অভিনব রীতির পশ্চাতে কি কারণ রয়েছে?

স্ক্যাফ–এর উদ্দেশ্য হল রাজদরবারে থেকে নেতা, আমীর ও গভর্নরদের সন্তানরা দরবারী রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা সম্পর্কে অবহিত হবে।

---

১. রডারিক সামরিক বাহিনীর একজন সাধারণ নেতা ছিলেন। সে ছিল খুবই চতুর এবং অসৎ। স্পেনের রাজা ছিলেন গথ বংশীয় ডন্‌রা। তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু ও ধর্মভীরু। সে সময় পাদ্রীদের খুবই প্রভাব ছিল এবং তারা ইহুদীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। তারা অসহায় ইহুদীদের প্রতি জুলুম শুরু করে, এতে স্পেনের রাজা ডনরা পাদ্রীদেরকে বাধাদান করেন। সময় বুঝে রডারিক পাদ্রীদেরকে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং ইহুদীদের প্রতি রাজার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করে। পাদ্রীরা ডন্‌রাকে বরখাস্ত করে রডারিককে রাজা মনোনীত করে। রডারিক রাজা হওয়ার পর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হলেও ক্ষমতার অহমিকা তাকে পাপী করে তোলে। আরাম-আয়াসে মত্ত হয়ে মানুষের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে থাকে; কিন্তু তার প্রতি প্রভাবশালী পাদ্রীদের সমর্থন থাকায় কেউ তার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতে পারত না।–লেখক

মূসা–আমার ধারণা, এই রীতির পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে।

স্ক্যাফ–আপনার মতে আর কি কারণ থাকতে পারে?

মূসা–আমীর, নেতা, গভর্নর এবং উপদেষ্টাদের সন্তানদেরকে রাজা এই উদ্দেশ্যে নিজের কাছে লালন-পালন করেন যাতে পরিণত বয়সে তাদের কেউ বিদ্রোহ করতে না পারে।

স্ক্যাফ–জী হাঁ, তাও হতে পারে; তা শুধু নিয়মই ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আইন এবং বহুদিন যাবত এ আইনটি চলে আসছিল। কাউন্ট জুলিয়ানের এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে; তার নাম ফ্লোরিণ্ডা। বাল্যকাল থেকেই সে রানীর কাছে লালিত-পালিত হয়ে আসছিল। যৌবনে পদার্পণের ফলে তার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা রডারিক তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। জোরপূর্বক তার সতীত্ব[১] হরণ করে। এই কাহিনী শুনে মূসার চেহারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। রাগতঃ কণ্ঠে তিনি বলে উঠেন, এরূপ নির্মম অত্যাচার!

স্ক্যাফ–জী হাঁ, ফ্লোরিণ্ডা তার এ অত্যাচারের কাহিনী তার পিতাকে চিঠি লিখে জানায়। জুলিয়ান তা জেনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন; কিন্তু বিপদের ভয়ে তিনি তা সহ্য করেন। তিনি রডারিকের কাছে গিয়ে আবেদন করেন, ফ্লোরিণ্ডার মা অত্যন্ত অসুস্থ। তার বাঁচার কোন আশা নেই। সে শেষবারের মতো তার কন্যাকে একনজর দেখতে চায়। এই বাহানা দিয়ে তিনি তাঁর কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। আপনি হয়ত অবগত আছেন, রডারিকের পূর্বে স্পেনের রাজা ছিলেন ডন্‌রা। তিনি তাঁর কন্যাকে কাউন্ট জুলিয়ানের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। ডন্‌রা ছিলেন গথ রাজ বংশোদ্ভূত। এই ঘটনা দ্বারা রডারিক গথ বংশেরই অপমান করেছে।

মূসা–সাধারণ খ্রিস্টানেরা কি এ অমানবিক কাহিনী জানতে পারেনি?

স্ক্যাফ–ঘটনাটি সকলেই জেনেছে। সবাই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে।

মূসা–এর পরেও কেন এরূপ পাপী ও লোভী রাজাকে অপসারণ বা হত্যা করা হয়নি?

স্ক্যাফ–কারণ, সকলেই তাকে ভয় পায়।

মূসা–আপনারা আমার কাছে কি চান?

জুলিয়ান–কেবল এইটুকু যে, আপনি আমার প্রতি তার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন।

মূসা–কিন্তু আমরা তো বিনা কারণে কোন দেশের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করি না।

জুলিয়ান–একজন মজলুমের সাহায্যার্থে আপনি সৈন্য প্রেরণ করবেন, এর চাইতে অধিক যুক্তিসঙ্গত কারণ আর কি থাকতে পারে?

---

১. খ্রিস্টান এবং আরব ঐতিহাসিকগণ রডারিকের এ পাপাচার কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এখানে শুধু যুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হলো–লেখক।

মূসা–এটা তো আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার, আপনাদের নিজেদেরই এর সমাধান করা উচিত।

জুলিয়ান–আমাদের নিজেদের পক্ষে এর সমাধান সম্ভব হলে হয়ত আপনার দ্বারস্থ হতাম না।

স্ক্যাফ–আমরা তো মুসলমানদের সম্পর্কে শুনেছি, তাঁরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং মজলুমের সাহায্য করা নিজের অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করে।

মূসা–হাঁ, আপনি সত্য কথাই শুনেছেন।

স্ক্যাফ–জুলিয়ানকে যে অপমান করা হলো, তা কি তাঁর প্রতি জুলুম নয়?

মূসা–নিশ্চয়ই, এটা তাঁর প্রতি চরম জুলুম।

স্ক্যাফ–আর রডারিক!

মূসা–সে তো জালেম, অত্যাচারী।

স্ক্যাফ–এর পরও একজন মজলুমকে সাহায্য করা এবং জালেমকে তার অত্যাচারের শাস্তি বিধান করা আপনার দায়িত্ব নয় কি?

মূসা–নিশ্চয়ই, মুসলমান হিসেবে এটা আমার জন্য অপরিহার্য।

স্ক্যাফ–তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র নামে একজন মজলুমকে সাহায্য করুন এবং জালেমকে শাস্তি দিন। মানবতার নামে আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

জুলিয়ান–আপনি যদি আমাদেরকে সাহায্য না করেন এবং আমি যদি বর্বর রডারিকের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে না পারি, তাহলে ঈসা (আ)-এর নামে শপথ করে বলছি, আমি সাগরে ডুবে আত্মহত্যা করব। আর আমার মৃত্যুর জন্য আপনি দায়ী হবেন।

মূসা তা শুনে ঘাবড়ে যান, তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠেন–আল্লাহ চাহে তো আমি আপনাদের সাহায্য করব। কিন্তু........

স্ক্যাফ–কিন্তু, কিসের কিন্তু?

মূসা–আমি খলীফার অধীন একজন প্রতিনিধি মাত্র, আমি স্বাধীন নই।

আপনি যদি চান, তাহলে আপনার সব ঘটনা লিখে খলীফার নিকট দূত পাঠিয়ে সামরিক অভিযানের জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে পারি।

স্ক্যাফ–আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম।

মূসা–তাহলে আমি শিগগির তা লিখে পাঠাচ্ছি।

মূসা তৎক্ষণাৎ একটি পত্র লিখেন এবং একজন বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে তা খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেন। কাউন্ট জুলিয়ান ও স্ক্যাফ মূসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাদের বিদায়ের পর মূসা তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে সঙ্গে নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেন। এর পর সকলেই উৎসাহভরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে যান।

দুই

বিস্ময়কর স্বপ্ন

সকল মুসলমান, মূসা ও অন্য কর্মকর্তারা সবাই ভাল করে জানতেন, খলীফা ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক যেমন নিজে উদার, দয়ালু ও দাতা ছিলেন, তেমনি তিনি এও চাইতেন, দুনিয়ার কোন অংশেই যেন কোন মুসলমানের সামান্যতম দুঃখ-কষ্ট না হয় এবং তাঁর প্রতিবেশী শাসকদের মধ্যে যেন কোনরূপ তিক্ততা না দেখা দেয়। তিনি চাইতেন, সকল দেশে যেন শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে। মূসা ইবন নুসায়র যখন পাশ্চাত্য প্রদেশগুলোর শাসক ছিলেন, তখন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস-সাকাফী ছিলেন প্রাচ্যের প্রদেশগুলোর শাসক। হাজ্জাজ থাকতেন ইরাকে এবং মূসা আফ্রিকায়। মূসা জানতেন যে, সিন্ধুর এক স্বেচ্ছাচারী রাজা লংকা দ্বীপ থেকে আগমনকারী একদল মুসলমানকে আটক করেছে এবং সেই রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ব্যাপারে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ খলীফার অনুমতি লাভ করেছেন।

মূসা ধারণা করেছিলেন, সিন্ধুতে বন্দী মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য খলীফা হাজ্জাজকে সেখানে সৈন্য পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু তিনি স্পেন অভিযানে সম্মত হবেন না। কারণ, তখন স্পেনের সঙ্গে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া স্পেনের খ্রিস্টানরা তখন পারস্পরিক কলহ-বিবাদে লিপ্ত ছিল। তা সত্ত্বেও খলীফার উদারতার কথা ভেবে মূসা কিছুটা আশান্বিত ছিলেন। সে আশার উপর ভরসা করে তিনি স্পেন অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন। আফ্রিকা থেকে স্পেন যাওয়ার পথে সাগর পড়তো। জাহাজ ছাড়া সে সাগর পাড়ি দেয়া সম্ভব ছিল না।

ভূমধ্যসাগর আফ্রিকাকে স্পেন থেকে পৃথক করে দিয়েছিল। মুসলমানরা তখনো ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চালায়নি। কিন্তু স্পেন অভিযানে যেতে হলে সে সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য জাহাজ তৈরী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং মূসা জাহাজ তৈরী শুরু করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা জাহাজ তৈরী ও চালাতে জানত না। তারা সবই জানত। কিন্তু এতদিন এর প্রয়োজন হয়নি। তাই করা হয়নি। শুধু চারটি জাহাজ তৈরী করা হচ্ছিল। জাহাজগুলো বেশ বড় ছিল। প্রতিটি জাহাজে দুহাজার লোক ও তাদের পনের-বিশ দিনের রসদপত্র সহজে ধারণ করা যেতো।

কায়রোর প্রতিটি মুসলমানের এই যুদ্ধে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সে অভিযানে কি পরিমাণ সৈন্য পাঠানো হবে এবং কে এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্ব দিবেন, তা কেউ জানত না। অবশ্য আগ্রহী মুসলমানরা তখন থেকেই যুদ্ধে যাওয়ার আবেদন পেশ করা শুরু করে। যারা অভিজ্ঞ ছিলেন, বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা নেতৃত্ব লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা শুরু করেন।

অনেকেই ধারণা করেছিলেন, হয়ত মূসা তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু মূসা ছিলেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। তাই নিশ্চিতভাবে এ ব্যাপারে কারো পক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিল না।

মুসলমানরা ইতিপূর্বেও স্পেনের অত্যাচারী রাজা রডারিকের বিলাসী জীবন-যাপনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তখন থেকেই তারা রডারিকের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁরা চাইতেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার এই পাপাচার ও লোভ-লালসার সমুচিত শাস্তি দেয়া হোক। কারণ তারা নিজেরা অন্যায় ও অসৎ কাজ করতেন না। অন্য কেউ অন্যায় করুক, তাও তাঁরা পছন্দ করতেন না। মুসলমানদের প্রত্যাশ্যা ছিল তাদের ন্যায় সারা দুনিয়ার মানুষ সোনার মানুষ হয়ে উঠুক। জুলুম, অত্যাচার নির্মূল হয়ে সারা দুনিয়ায় ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

একদিনের ঘটনা। মূসা তাঁর কার্যালয়ে বসা ছিলেন। সে সময় তাঁর কাছে ছিলেন আলী ইবন রাবী, হাব্বাব ইবন তামীমী ইবন আবদুল্লাহ আয়্যুব এবং তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা সবাই ছিলেন খ্যাতিমান যোদ্ধা এবং কোন না কোন অভিযানের নেতা।

আলী জিজ্ঞেস করেন, স্পেন অভিযানের নেতৃত্বদানের ব্যাপারে কারো কথা ভেবেছেন কি?

মূসা বলেন, হাঁ ভেবেছি। তাঁর নাম বললে আপনারা সবাই তাঁকে সমর্থন করবেন।

আবদুল আযীয বললেন, হযরত! আজ রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি।

মূসা বললেন, স্বপ্ন? তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ!

ইতিমধ্যেই কাউন্ট জুলিয়ান ও পাদ্রী স্ক্যাফ দরবারে এসে হাযির হলেন। তাঁরা কায়রোতেই অবস্থান করছিলেন। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর তারা উভয়ে আসন গ্রহণ করেন। মূসা আবদুল আযীযকে তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার নির্দেশ দেন।

আবদুল আযীয–দেখি, আমি সাগরে ভ্রমণ করছি, আমার সঙ্গে রয়েছে বহু লোক। আমরা একটি সবুজ-শ্যামল পাহাড়ে অবতরণ করি। পাহাড় থেকে নেমে নৈসর্গিক দৃশ্য সুশোভিত মাঠের উপর দিয়ে আমরা যেতে থাকি। চারিদিকে হাজার হাজার পাখী ছিল। আমাদের দেখলেই পাখীগুলো উড়ে যেতো। কখনো কখনো আমাদেরকে ঠোকর মারতে আসতো; কিন্তু আমরা যখন তাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতাম, তখনই তারা উড়ে যেতো।

মাঠ পার হয়ে আমরা জনবসতি দেখতে পেলাম। বসতিগুলো ছিল খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজানো-গোছানো। আরো এগিয়ে গিয়ে একটি প্রশস্ত নদী দেখতে পেলাম। নদীর উপরে ছিল একটি উঁচু সেতু। সেতুটি ছিল খুবই মজবুত এবং দেখতেও ছিল সুন্দর। সেতুর নীচ দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হতো। আমি ইতিপূর্বে এত উঁচু সেতু আর কখনো দেখিনি। আমি সেতুর উপর দিয়ে নদী পার হলাম এবং একটি সুন্দর উপত্যকায় গিয়ে উপনীত হলাম। সেখানে অনেকগুলো ভাঙ্গাচুরা ইমারত ছিল। তার একটিতে ছিল একটি অতিকায় মূর্তি। মূর্তিটি এত উঁচু ছিল যে, নীচে দাঁড়িয়ে এর মস্তক দেখা যেতো না। আমরা সকলেই মূর্তিটি দেখে বিস্ময়াভিভূত হলাম। এমনি মুহূর্তে মূর্তিটির পেছন দিক থেকে কয়েকজন স্ত্রীলোককে আসতে দেখলাম। তারা ছিল খুবই সুন্দরী এবং দামী রেশমী পোশাক পরিহিতা। তাছাড়া তাদের গায়ে ছিল হীরা-জহরত খচিত স্বর্ণালংকার। সে দলের মধ্যস্থিত স্ত্রীলোকটি ছিল সর্বাধিক সুন্দরী। তার পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল অধিকতর জাঁকালো। তার অলংকার ছিল মোতি ও জাওহার সুশোভিত, গলায় ছিল দামী ইয়াকূতের হার। হারের চাকচিক্যে তার ললাট ও মুখমণ্ডল চিকচিক করছিল। তার চেহারা ছিল চাঁদের চাইতেও উজ্জ্বল। স্ত্রীলোকটি আমাকে যেতে ইঙ্গিত করে। আমি তার পিছু অনুসরণ করি। কিন্তু আমি মূর্তিটির কাছাকাছি পৌঁছুলেই স্ত্রীলোকটি ও তার সঙ্গীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। এমনি মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

মূসা, স্ক্যাফ, কাউন্ট জুলিয়ান ও উপস্থিত সবাই তন্ময় হয়ে আবদুল আযীযের কথা শুনছিলেন এবং একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বর্ণনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূসা বললেন, তুমি বড় বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছ।

জুলিয়ান–হাঁ, বিস্ময়কর তো বটেই, তবে একটি বিষয় আমার জানার আছে।

আবদুল আযীয–কি বিষয়?

জুলিয়ান–আপনি কি কখনো স্পেনে গিয়েছেন?

আবদুল আযীয–না, কখনো যাইনি।

মূসা–হঠাৎ আপনার এ প্রশ্ন কেন?

জুলিয়ান–কারণ, তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা হুবহু স্পেনেরই দৃশ্যের বর্ণনা।

মূসা–তথাকার মাঠ-ঘাট ও পাহাড়-পর্বত কি খুবই শস্য-শামল?

জুলিয়ান–জী হাঁ, প্রকৃতপক্ষে স্পেন হলো একটি ভূ-স্বর্গ। স্রষ্টা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তার সবই স্পেনে রয়েছে। ফল-ফুলের সমারোহ ও পরিষ্কার-স্বচ্ছ আকাশের দিক দিয়ে তা সিরিয়া, উপযোগী আবহওয়ার বিচারে ইয়ামান বা আরবের মরূদ্যান, প্রচুর ফল উৎপাদনের দিক দিয়ে হিজায, ফুলের সুবাসের বিচারে হিন্দুস্তান, সমুদ্র উপকূলের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের দিক দিয়ে তা এডেনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মূসা–আপনি তো দেখছি প্রশস্তির এক বিরাট ফিরিস্তি তুলে ধরলেন।

জুলিয়ান–দেশটি সত্যিকারভাবেই প্রশংসার দাবীদার; কিন্তু আপনার পুত্র যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাতে তো আমাকেই বিস্মিত করে ফেলেছে।

মূসা–কেন?

জুলিয়ান–কারণ, বাস্তবে তিনি কখনো স্পেন দেখেননি; কিন্তু স্বপ্নে তো ঠিকই স্পেনে পৌঁছে গেছেন। তিনি যে মূর্তিটির কথা বলেছেন, তা মারমাটা নামক স্থানে অবস্থিত। মূর্তিটির নাম গ্যালিশিয়া। বিশ্বে এত বড় মূর্তি দ্বিতীয়টি নেই।

মূসা-সেই স্ত্রীলোকগুলো কারা?

জুলিয়ান–তিনি সবচেয়ে সুন্দরী যে মহিলার কথা বললেন, তিনি হলেন রাজা রডারিকের স্ত্রী নাইলা। তার গলার হারটি সারা দুনিয়ায় নজীরবিহীন। তার সৌন্দর্যও বর্ণনার অনুরূপ। সেই সুন্দরী রমণী সারা স্পেনে হাসীনা বা সুন্দরী নামে পরিচিতা।

মূসা আবদুল আযীযকে লক্ষ্য করে বললেন, হে পুত্র। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তুমি স্বপ্নে স্পেনকে দেখে ফেলেছ।

আবদুল আযীয–আপনি কি আমাকে জাগ্রত অবস্থায় স্পেনে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না ?

মূসা–না, সে অভিযানের জন্য অন্য কাউকে মনোনীত করা হয়েছে।

আবদুল আযীয নিরাশ কণ্ঠে বললেন, তিনি কে?

মূসা–খলীফার অনুমতি এসে পৌঁছলে সবাইকে তা জানানো হবে।

এমনি মুহূর্তে এক খাদেম এসে খবর দিল, দূত দামিশ্‌ক থেকে ফিরে এসেছে। তা শুনে সবাই আনন্দিত হয়ে উঠেন। মূসা বললেন, তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন। একজন ডেকে আনতে চলে গেলেন। সবাই অধীর আগ্রহে দূতের আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

তিন

রওয়ানা

দূত দরবারে আসতে একটু দেরী হলো। সকলের মনে নানা প্রশ্নের উঁকি-ঝুঁকি। জুলিয়ান বললেন, আপনার কি মনে হয় যে, খলীফা স্পেন অভিযানের অনুমতি দিয়েছেন?

মূসা বললেন, আমি সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছি না, কারণ এখন হিন্দুস্তানে একটি সামরিক অভিযান পাঠানো হচ্ছে এবং সে অভিযানটি আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জুলিয়ান–কেন?

মূসা–সিন্ধুর কপট অহংকারী রাজা কিছু সংখ্যক মুসলমানকে বন্দী করেছে, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য সেখানে সৈন্য পাঠানো খুবই প্রয়োজন।

জুলিয়ান–মুসলমানদের মধ্যে তো যথেষ্ট ঐক্য রয়েছে।

মূসা–কেন থাকবে না? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।" সুতরাং এক ভাই কোনরূপ বিপদে আপতিত হলে অথবা কোনরূপ সমস্যায় পড়লে অপর ভাই কি তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না? কোন মুসলমান যদি অপর মুসলমানের সমস্যা বা বিপদে সাহায্য না করে, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এ জন্যে প্রত্যেক মুসলমান অপর কোন মুসলমান ভাইকে সম্ভাব্য সাহায্য করতে বাধ্য। ফলে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ অত্যন্ত প্রবল।

জুলিয়ান–হাঁ, আপনাদের মুসলমানদের মধ্যে যে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে, বিশ্বের অন্য কোন জাতির মধ্যে তা নেই। ইতিমধ্যে একজন দূত এসে ভিতরে প্রবেশ করল এবং সালাম জানাল।

মূসা সালামের জবাব দিয়ে দূতকে বসতে ইঙ্গিত করেন। দূত বসে পড়ে। মূসা বললেন, মহামান্য খলীফা কেমন আছেন?

দূত–আল্লাহর রহমতে ভাল আছেন জনাব।

মূসা–দরবারের অন্য ব্যক্তিরা কেমন আছেন?

দূত–সবাই ভাল আছেন। আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। কিন্তু খলীফা ও অন্য সবাই সিন্ধুর রাজা দাহির কর্তৃক আটককৃত মুসলমানদের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। সবার দৃষ্টি এখন সিন্ধু অভিযানের দিকে।

মূসা–আমার আবেদনের কোন জবাব পাওয়া গেছে কি?

দূত–জী হাঁ, খলীফা একখানা পত্র দিয়েছেন। দূত পত্রখানা মূসার হাতে অর্পণ করে। মূসা পত্রখানা হাতে নিয়ে চুম্বন করে খুলে পাঠ করতে লাগলেন:

প্রেরক: খলীফা ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক।

প্রাপক: মূসা ইবন নূসায়র, খলীফার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রতিনিধি।

আসসালামু আলায়কুম, আল্লাহ ও রাসূলের হাম্‌দ ও সানার পর সমাচার এই যে দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার, পাপাচার ও অসত্যকে দূর করার জন্য পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদের আবির্ভাব হয়েছে। এই মুহূর্তে সিন্ধু অভিযানটি আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা মজলুমকে সাহায্য করার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রাখতে পারি না। জুলিয়ান মজলুম; মজলুমের সাহায্য করা আমাদের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। আমি তোমার উপর উক্ত অভিযানের দায়িত্ব ন্যস্ত করলাম। তুমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সে অভিযানের আয়োজন শুরু করো। সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকে স্পেন অভিযানে পাঠাবে। একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত অভিযানের সেনাপতি নির্বাচিত করবে। প্রথমেই বেশী সংখ্যক সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন নেই। অল্প কিছু সৈন্য পাঠাবে। পরে প্রয়োজন হলে আরো কিছু সৈন্য পাঠাবে।

ইতি
স্বাক্ষর
দামিশ্‌ক

পত্রখানা পাঠ করে মূসা খুবই অনন্দিত হলেন। সর্বাধিক খুশী হয়েছেন স্ক্যাফ ও কাউন্ট জুলিয়ান। স্ক্যাফ বললেন, এখন তো খলীফার অনুমতি পাওয়া গেল। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে জনাব?

মূসা–আমি তো কেবল এরই অপেক্ষায় ছিলাম। খলীফা আপনাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এখন আর কোন বাধা নেই। আগামী পরশু শুক্রবার। সেদিন জুম'আর নামাযের পর আল্লাহ চাহে তো আমাদের সৈন্য স্পেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে।

স্ক্যাফ এবং কাউন্ট জুলিয়ান মূসাকে অভিবাদন জানিয়ে সেদিনের মতো দরবার ত্যাগ করেন। মূসা সেদিনই সাত হাজার বিচক্ষণ ও সাহসী যুবককে নির্বাচিত করে তাদেরকে স্পেন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন।

স্পেন অভিযানে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার লোক প্রস্তুত ছিল। সকলেরই ধারণা ছিল, এই অভিযানে কমপক্ষে পনের-বিশ হাজার সৈন্য পাঠানো হবে, কিন্তু

দেখা গেল, মাত্র সাত হাজার সৈন্য নির্বাচন করা হয়েছে। **তাতে সবাই সীমাহীন** বিস্মিত হলো। যাদেরকে নির্বাচিত করা হলো, তারা অত্যন্ত আনন্দের **সঙ্গে প্রস্তুত** হতে লাগল, অন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। আর মাত্র একদিন বাকী। সবাই সেই ঐতিহাসিক দিনটির অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক সময় সেই দিনটিও উপস্থিত হলো। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মসজিদটি ভরে গেল। যথাসময়ে আযান হলো এবং নামায সম্পন্ন হলো। মূসা নামায সেরে মিম্বারে এসে বসলেন। সকলেই নীরব। মূসা সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

হে মুসলমান ভাইগণ, সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এই জগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি কখনো নিদ্রা যান না এবং কখনো তন্দ্রা অনুভব করেন না। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। যখন কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন; যখন এই বিশ্বজাহান ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনো তিনি থাকবেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। আল্লাহর হাজার শোকর যে, আমরা তাঁরই 'ইবাদত করি। মনে রেখো, বিশ্বে কেবল মুসলমানরাই তাওহীদের ধারক-বাহক এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা কেবল মুসলমানদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে।

পৃথিবীতে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই কুরআন, এই আইন এবং এর ধর্মই বিদ্যমান থাকবে। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ বিকৃত হয়ে পড়েছে। এর অনুসারীরা একে অনেক রদবদল করে ফেলেছে; কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আল-কুরআনের একটি বর্ণেরও কোনরূপ রদবদল হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,"আমি নিজেই তোমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণের যিম্মাদার।"

আল্লাহর চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী আর কে হ'তে পারেন? এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আজ পর্যন্ত একটি ফোটারও পরিবর্তন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দার, যিনি শত-সহস্র কষ্ট ভোগ করেও আল্লাহর বাণী প্রচারে পিছপা হননি। গর্বিত যে, আমরা এমন এক রাসূলের উম্মত, যিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ফিরিশতাদের বন্ধু এবং জগতবাসীর নয়নমনি। তাঁর উপর শত-সহস্র সালাম বর্ষিত হোক।

কাউন্ট জুলিয়ান ফরিয়াদীরূপে মুসলমানদের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। মহামান্য খলীফা তাঁর ফরিয়াদ শ্রবণ করে তাঁকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। আজ স্পেনে সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। তারা সেখানকার অন্যায়-অত্যাচার, ভোগ বিলাস ও ব্যক্তি-পূজার অবসান ঘটাবে। তোমরা সবাই দু'আ করো। আল্লাহ্ যেন মুসলিম মুজাহিদদের বিজয় দান করেন। সবাই হাত তুলে অত্যন্ত একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন।

অতঃপর মূসা বললেন, কাকে এই অভিযানের সেনাপতি মনোনীত করা হবে, তোমরা সবাই হয়ত তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। আমার কাছে সহস্রাধিক ব্যক্তির লিখিত ও মৌখিক আবেদন এসেছে। তারা সকলেই এই অভিযানের নেতৃত্বলাভের প্রত্যাশী। আমার পুত্র আবদুল আযীযও তাদের একজন; কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তিকে সেনাপতি মনোনীত করেছি, যিনি সকল দিক দিয়েই উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন একজন বারবার গোলাম। আমি তাকে আযাদ করেছি। তার নাম তারিক। তিনি বারবারের অধিবাসী ছিলেন। মুসলিম মুজাহিদদের বারবার আক্রমণের সময় তারিক স্বদেশ রক্ষায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধরত অবস্থায়ই তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন।

যুদ্ধবন্দীরা তখন গোলামে পরিণত হতো। সে হিসেবে তারিকও মুসলমানদের গোলামে পরিণত হন। তিনি মূসার নিকট থাকতেন। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

মূসা সে সময়ই তারিককে আযাদ করে দেন এবং মরক্কোর গভর্নর নিযুক্ত করেন। যিনি ছিলেন একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দী ও গোলাম, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হলেন একজন গভর্নর। বিশ্বে সাম্য ও উদারতার এর চাইতে চড় নজীর আর কি হতে পারে।

হিন্দুস্তানের নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা কোন মন্দির বা উপাসনালয়ে গমন করলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের পাশে বসতে পারে না। এমন কি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে পথ দিয়ে গমন করে, নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা সে পথ দিয়েও যেতে পারে না। মনু সংহিতা হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ। তাতে এ কথাও লেখা হয়েছে যে, কোন অস্পৃশ্যের কানে বেদ মন্ত্র শোনানো যাবে না। ভুলক্রমে যদি কেউ শুনে ফেলে, তবে তার কানে সীসা গলিয়ে ঢেলে দাও। খ্রিস্টানদের মধ্যেও একই রীতি বর্তমান। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সমাজে যেতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, শুদ্র ও অস্পৃশ্যদের দেবতা উচ্চ শ্রেণীর দেবতাদের চাইতে স্বতন্ত্র। কীরূপ উদ্ভট কল্পনা।

কেবলমাত্র ইসলামেই উঁচু-নীচুর কোন ভেদাভেদ নেই, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গের প্রশ্ন নেই। যে কোন দেশ বা যে কোন বর্ণের লোকই হোক না কেন, ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন মুসলমানের ন্যায় যে কোন মসজিদ, উপাসনালয় বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করে। তাই সাম্য যদি থেকে থাকে, তবে ইসলামেই রয়েছে। যেখানে তাওহীদের বাণী প্রচারিত হয়েছে, সেখানে ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর আদর্শও প্রসারিত হয়েছে।

মুসলমানরা যখন তারিকের নাম শুনতে পেলো, তখন সবাই অত্যন্ত খুশী হলো। শুধু এজন্য যে, একজন নও-মুসলিম এই সম্মানের অধিকারী হলেন। মুগীছ আর-রূমীর ন্যায় একজন প্রবীণ ব্যক্তিও তারিকের অধীনে গমন করবেন। সারা দুনিয়ার মানুষ

জানতে পারলো যে, মুসলমানরা একজন নও-মুসলিমকেও একজন প্রবীণ মুসলমানের মতই মনে করে।

মুসলমানরা মুগীছ আর-রূমীর মনোনয়নেও অত্যন্ত খুশী হলো। তাঁদেরকে আগেই জানানো হয়েছিল। তাঁরা উভয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এবার মূসা সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, কায়রোর মুসলিম ভাইসব! তোমরা আজ মুজাহিদদেরকে আনন্দের সঙ্গে বিদায় দাও। উপস্থিত মুসলমানরা সমস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মুজাহিদরা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। যে পথ দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন, নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ তাদের উপর পুষ্প-বৃষ্টি বর্ষণ করছিল। প্রায় সকল কায়রোবাসী তাদেরকে বিদায় জানাতে সমবেত হলো। এক আনন্দঘন পরিবেশে মুজাহিদদেরকে বিদায় জানানো হলো।

চার

সুসংবাদ

সমুদ্র উপকূল ছিল কায়রো শহর থেকে বেশ দূরে। তাই সকল কায়রোবাসী মুজাহিদদের বিদায় জানাতে উপকূল পর্যন্ত আসতে পারেনি; তা সত্ত্বেও প্রায় পনের-বিশ হাজার লোক উপকূলে উপস্থিত হয়েছিল। মুজাহিদরা ছিলেন পাগড়ী পরিহিত। লম্বা পাগড়ীর শুভ্র আঁচল এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। স্পেন অভিযানে গমনকারী মুসলিম মুজাহিদরা ছিল পদাতিক। ঘোড়া নেয়ার প্রয়োজনীয় জাহাজের ব্যবস্থা করতে না পারায় তাদের পদাতিকই পাঠাতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা ছিল অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন কোন প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছেন। অথচ তাঁরা এমন এক দেশে গমন করছেন, যেখানকার প্রতিটি মানুষ তাদের রক্তপিয়াসী। এমন এক জাতির মুকাবিলা করতে যাচ্ছেন যাদের রয়েছে অঢেল অস্ত্র ও জনবল। তদুপরি তারা ছিল সে দেশেরই অধিবাসী। সে দেশের আকাশ-বাতাস তাদের পরিচিত। তারা যা চাবে তা-ই পাবে। যে পরিমাণ সরঞ্জামের প্রয়োজন তার চাইতেও বেশী তারা সরবরাহ লাভ করতে পারবে।

কিন্তু মুসলমানদের দেশ ছিল সেখান থেকে অনেক দূরে। মাঝখানে ছিল সাগর। অতিরিক্ত কোন প্রকার সাহায্যেরই আশা ছিল না। তাদের না ছিল জনবল, না ছিল অস্ত্রবল। তাদের অনেকের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র, এমনকি বর্মও ছিল না। তাদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার; কিন্তু সেদিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

তাদের বড় বল, তারা মুসলমান। আল্লাহ্‌র উপর তাদের পূর্ণ ভরসা রয়েছে। তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দান করবেন। জিহাদে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাওয়াটাই ছিল তাদের বড় আনন্দ। এই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে তারা পথ চলছিল। তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন তারিক।

তারিক ছিলেন বয়সে তরুণ; কিন্তু তাঁর সাহস ছিল, ছিল জিহাদী প্রেরণা। অপরদিকে ছিলেন মুগীছ আর-রূমী, তিনি ছিলেন মধ্যবয়সী; কিন্তু আবেগ ও প্রেরণায় তিনি ছিলেন যুবকসম। তাঁদের পিছনে ছিল বিদায় সংবর্ধনাদানকারী অসংখ্য কায়রোবাসী। তাদের

কাছে ছিল নানা ধরনের ফলমূল, তরিতরকারি, খাদ্যসামগ্রী। তারা তাদের এসব দ্রব্যসামগ্রী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করছিল। সবাই চাইত তার উপহারটি মুজাহিদগণ গ্রহণ করুক, তাতে তিনিও জিহাদের সওয়াবের অংশীদার হবেন। মুজাহিদগণও তাদের সামনে যা পেতেন, অকপটে সেসব গ্রহণ করতেন। একজন সওদাগর তার চাকরের মাথায় এবং খচ্চরের পিঠে করে এতসব ফলমূল নিয়ে এসেছিল যে, সারা রাস্তায় বন্টনের পরও তা শেষ হলো না; মুজাহিদরা সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেলে সে সওদাগর মূসার কাছে আবেদন জানান, তিনি যেন মুজাহিদদের একটু থামিয়ে দেন। তাতে তিনি তাঁর সব উপহারসামগ্রী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করতে পারবেন। মূসা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। সওদাগর তাঁর সকল খাদ্যসামগ্রী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করতে সক্ষম হন।

স্ক্যাফ, কাউন্ট জুলিয়ান ও তার অন্য সঙ্গীরা মুসলমানদের বদান্যতার এ নমুনা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন। স্ক্যাফ জুলিয়ানকে বলেন, আপনি কি মুসলমানদের অবস্থা লক্ষ্য করেছেন; তারা এক মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করছে, আমাদের মধ্যে প্রিয়জনরাও একে অপরের প্রতি অনুরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করে না।

মূসা তাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে পেলেন। তিনি বলেন, যাঁরা জিহাদে যাচ্ছে তাঁরা আমাদেরই ভাই। তাদের মধ্যে কে আসবে, কে শহীদ হবে, আমরা বলতে পারছি না। এজন্য আমরা আমাদের উত্তম জিনিসগুলো আমাদের হৃদয়ের মণি মুজাহিদদেরকে দিয়ে দিতে চাই। যেমন করে একজন স্নেহময়ী মা তার সন্তানকে সফরে পাঠানোর সময় নিজের প্রিয় জিনিসপত্র দিয়ে থাকেন।

জুলিয়ান–এটা সত্য যে, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা রয়েছে, অন্য কোন জাতির মধ্যে তা নেই। দেখুন না, মুজাহিদদের বিদায় বেলায় তারা হৃদয়ের কি আকুতিই না প্রকাশ করেছে। আমার তো হিংসা হয়, আমাদের জাতি যদি অনুরূপ হতো।

মূসা–যেসব মুজাহিদ আপনার সাথে স্পেনে যাচ্ছেন, তাঁরা কোন পার্থিব সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশী নয়। তাঁরা লোভাতুর হয়েও মুসলমানদের উপহার গ্রহণ করছে না। তাঁদের মধ্যে অনেক সম্পদশালী ব্যক্তিও রয়েছেন; উপহার গ্রহণের কারণ এই যে, দান গ্রহণ না করলে আগত মুসলমানরা মনে হয়ত কষ্ট পাবে; কেবল তাদের মন রক্ষার্থেই তাঁরা উপহারসামগ্রী গ্রহণ করছেন। তাছাড়া উপহার প্রদানকারীদেরও সওয়াবের অংশীদার করা যাবে।

স্ক্যাফ–হাঁ, এটাই সত্যি কথা।

ইতিমধ্যে মুজাহিদরা উপকূলে পৌঁছে গেছেন। সামনে অপেক্ষমাণ ৪টি জাহাজ। প্রত্যেকটি জাহাজের সঙ্গে ছোট ছোট নৌকা রয়েছে। একদিকে জুলিয়ানের একটি ছোট জাহাজ দাঁড়ানো রয়েছে।

মুজাহিদদের জাহাজগুলো ছিল অনেক বড়ো। তাই সেগুলোকে তীরে ভিড়ানো সম্ভব ছিল না; ছোট নৌকাগুলো দিয়ে মালামাল জাহাজে উঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। মালামাল উঠানো শেষ হলে মুজাহিদরা কায়রো থেকে আগত মুসলমানদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নৌকার সাহায্যে জাহাজে উঠতে আরম্ভ করেন।

তীরে অপেক্ষমাণ মুসলমানরা আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতে লাগলেন; কিছুক্ষণের মধ্যেই সকল মুজাহিদ জাহাজে উঠে পড়লেন। সবশেষে তারিক ও মুগীছ আর-রূমী জাহাজে উঠে এলেন; জাহাজগুলোতে ইসলামী পতাকা উড়ানো হলো; নোঙ্গর উঠিয়ে পাল তুলে দেয়া হলো; সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে পানির বুক চিরে জাহাজগুলো সামনে এগিয়ে চলল।

মুসলিম মুজাহিদরা হাত নেড়ে তীরে অপেক্ষমাণ মুসলমানদের সালাম জানান; মুসলমানরাও সমভাবে সালামের জবাব দেন। সে কি আবেগঘন পরিবেশ; সবার চোখ অশ্রুসিক্ত; মুসলমানরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র কাছে মুজাহিদদের জন্য মুনাজাত করেন।

যতক্ষণ জাহাজগুলো দেখা গেলো মুসলমানরা সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় ধীরে ধীরে জাহাজগুলো চোখের আড়াল হয়ে গেলো। মুসলমানরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কায়রোয় ফিরে গেলেন।

জাহাজে উঠতে উঠতে আসরের সময় হয়ে এসেছিল। জাহাজে উঠেই তাঁরা আসরের নামায আদায় করেন। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায আদায় করেন। জাহাজ এগিয়ে চলেছে; আকাশে তারার মেলা; রাতের আঁধারে সমুদ্রের পানি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। বিদায় জানাতে আগত মুসলমানরা এত বেশী পরিমাণে তাঁদেরকে খাইয়েছিল যে, রাতে আর খাবারের প্রয়োজন হলো না; তাই এশার নামায পড়ে তাঁরা সকলেই শুয়ে পড়েন। শেষ রাতে তারিকের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে বসে পড়েন এবং দরূদ পড়তে থাকেন। মুগীছ আর-রূমী তাঁর পাশেই ঘুমিয়েছিলেন। তিনিও জেগে উঠেন; কলেমা পাঠ করে উঠে বসলেন। অতঃপর তারিককে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভাত হয়েছে নাকি?

তারিক বললেন– না, এখনো হয়নি, আরো দেরি আছে।

মুগীছ আর-রূমী–আপনি যে উঠে পড়েছেন এবং দরূদ পাঠ করছেন।

তারিক–আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেছি।

মুগীছ–এ যে ভারী সৌভাগ্যের ব্যাপার।

তারিক–হ্যাঁ, আমি নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করছি।

মুগীছ–স্বপ্নে যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র দীদার লাভ করেছেন, তার চাইতে সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে।

তারিক–ঘুমন্ত অবস্থায় আমি একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দেখতে পেলাম; আমি হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম; দেখতে পেলাম যে, আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা জাহাজ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবির্ভূত হলেন। তিনি হাসছিলেন। আমি মনের অজ্ঞাতেই দাঁড়িয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম জানালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তোমার অভিযান শুভ হোক তারিক। আল্লাহ্ তোমাকে বিজয় দান করবেন।

এ সংবাদ শুনেই আমার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠলো। তৎক্ষণাৎই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল; আমি আফসোস করতে লাগলাম আমার স্বপ্ন যদি আরো দীর্ঘতর হতো; আমি যদি আরো দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পারতাম।

মুগীছ–আপনার ভাগ্যে যতদূর ছিল, ততদূর সাক্ষাত পেয়েছেন। আল্লাহ্‌র হাজার শোকর যে, তিনি প্রিয় হাবীবকে সুসংবাদ দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

তারিক– প্রকৃতপক্ষে আমি আমার ভাগ্যের জন্য যতই গর্ব করি না কেন যথার্থতার তুলনায় তা একান্তই নগণ্য।

মুগীছ– নিশ্চয়ই।

ভোর হলে আযান দেয়া হলো। সকলেই ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাযের জন্য জমায়েত হলেন। তারিক ও মুগীছ উভয়েই নামাযের জন্য চলে যান।

পাঁচ

অপর এক মজলুম

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সাত হাজার মুসলিম মুজাহিদ ৪টি জাহাজে করে রওয়ানা দিয়েছেন। প্রত্যেক জাহাজে পৃথক পৃথক জামাতে নামায আদায় করা হলো। নামায শেষ করে মুজাহিদরা জাহাজের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সামুদ্রিক দৃশ্য উপভোগ করতে থাকেন। তাঁদের জাহাজ যে প্রণালী দিয়ে যাচ্ছিল, তার প্রশস্ততা ছিল মাত্র চৌদ্দ মাইল। প্রকৃতপক্ষে স্পেন আফ্রিকা মহাদেশের সাথে মিশে ইউরোপকে এশিয়ার সঙ্গে মিলাতে চাচ্ছিলো। এর একদিকে ভূমধ্যসাগর এবং অপরদিকে আটলান্টিক মহাসাগর। এশিয়া ও ইউরোপের মাঝখানে রয়েছে একটি প্রণালী। মুসলিম মুজাহিদরা জাহাজে করে যে প্রণালী অতিক্রম করছিলেন, প্রণালীটি প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। সামনে সবুজ দ্বীপ। দূর থেকে দ্বীপের পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। সমগ্র দ্বীপটিই ছিল সবুজের এক সমারোহ। মুজাহিদরা সে দৃশ্য দেখে আনন্দমুখর হয়ে উঠেন। এমনি মুহূর্তে কাউন্ট জুলিয়ান তারিকের পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি তারিককে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা স্পেনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্বীপের নিকটবর্তী হচ্ছেন। তারিক জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোন্ স্থানের কথা বলছেন ?

জুলিয়ান–এটা হচ্ছে সবুজ দ্বীপ, স্পেনের একটি বিখ্যাত স্থান।

তারিক–সামনে যে ছোট ছোট পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, এর নিকটবর্তী অঞ্চল-গুলোকে কি বলা হয় ?

জুলিয়ান–এর নাম লনজেরাক, একে ব্যাঘ্রের শৃঙ্গ নামেও অভিহিত করা হয়।

তারিক–কেন, এখানে কি অনেক ব্যাঘ্র থাকে ?

জুলিয়ান–স্থানটি সুন্দর বিধায় এখানে মানুষ যেমন বাস করতে পসন্দ করে, তেমনি জীব-জন্তুরাও স্থানটিকে পসন্দ করে। তাছাড়া এখানে অনেক ব্যাঘ্রও রয়েছে।

জাহাজটি ধীরে ধীরে লনজেরাকের দিকে ঘুরে গেল। ক্রমে সবুজ দ্বীপও নিকটবর্তী হয়ে আসছে। সূর্যও তখন ঊর্ধ্ব গগনে উঠে এসেছে। সমুদ্রের নীল পানিতে ভর-দুপুরের সূর্যালোক এক অনুপম দৃশ্যের অবতারণা করেছে। তারিক, মুগীছ আর-রূমী ও সকল মুজাহিদ নিবিষ্টচিত্তে এই মোহনীয় দৃশ্য উপভোগ করছেন।

জুলিয়ান–স্পেনের সকল স্থানই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাছাড়া রৌপ্যের খনিসহ অন্যান্য খনিজ দ্রব্যও রয়েছে।

তারিক–আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, আমরা নিরাপদে স্পেনের উপকূলে এসে পৌঁছতে পেরেছি।

অতঃপর জাহাজগুলো নোঙ্গর করা হলো। ছোট নৌকাগুলো দিয়ে প্রথমে সাজ-সরঞ্জাম নামানো শুরু হলো।

জুলিয়ান–পথ দেখানোর জন্য এতক্ষণ তো আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। এখন আমি বিদায় গ্রহণ করতে চাই।

তারিক–আপনি কোথায় যাবেন ?

জুলিয়ান–সিউটা যাব।

তারিক–আমার একটি কথা ছিল।

জুলিয়ান–আচ্ছা বলুন।

তারিক–আমরা তো এখানকার পথঘাট সম্পর্কে অবগত নই। স্থানীয় একজন পথপ্রদর্শক দিলে ভাল হতো।

জুলিয়ান–আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমার সঙ্গে এমন কোন লোক নেই, যে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

তারিক–ঠিক আছে, আল্লাহ্‌ই আমাদের সহায়।

জুলিয়ান–এই ছোট ছোট পাহাড়গুলো পার হয়ে আপনারা একটি মাঠ দেখতে পাবেন। সেই মাঠ দিয়ে সোজা এগুলেই স্পেনের রাজধানী টলেডোয় পৌঁছে যাবেন। আর কাউকেই জিজ্ঞেস করতে হবে না।

জুলিয়ান আরো বললেন, সেই মাঠ দিয়ে যে পথটি স্পেনে গেছে এর শেষ প্রান্তে রাজা রডারিকের একজন বিখ্যাত সেনাপতি তাদমীর কিছু সৈন্য নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

তারিক–সে কি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত ?

জুলিয়ান–জী হাঁ।

তারিক–তার সঙ্গে কি পরিমাণ সৈন্য রয়েছে ?

জুলিয়ান–তাদের সঠিক সংখ্যা আমি বলতে পারব না।

তারিক–ঠিক আছে, সেসব আমাদের জানারও প্রয়োজন নেই। আমরা যখন এদেশে আসতে পেরেছি, তখন যে পরিমাণ সৈন্যই আসুক না কেন, আমরা তাদের মুকাবিলা করবই। হয়ত বিজয় নয়ত মৃত্যু–এ দু'য়ের যে কোন একটিই আমাদের কাম্য।

জুলিয়ান–আল্লাহ্‌ অবশ্যই আপনাদেরকে বিজয়দান করবেন। আমার হৃদয়ে অবিরত যে আগুন জ্বলছে, আপনাদের বিজয় ও রডারিকের সমুচিত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তা নির্বাপিত হবে না।

তারিক–সবর করুন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জালিমকেই সমুচিত শাস্তি দিয়ে থাকেন।

জুলিয়ান–আমারও বিশ্বাস, জালিম একদিন না একদিন শাস্তি পাবেই। তবে আমার কন্যা তার অসম্মানের কথা ভেবে দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

তারিক–তাকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করবেন।

জুলিয়ান–আপনাদের আগমনের কথা শুনে সে হয়ত মনে মনে শান্তি পাবে। যাহোক, আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

তারিক–আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।

জুলিয়ান–তাদমীর অত্যন্ত সুচতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তার সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাদের সাহায্য করবেন। অতঃপর জুলিয়ান নিজ জাহাজে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যেই সকল সরঞ্জাম জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলা হলো। মুজাহিদরাও ক্রমে ক্রমে উঠে এলেন। তারিখ ও মুগীছ সবশেষে জাহাজ থেকে নেমে আসেন। তারিক সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা, আল্লাহর হাজারো শুকরিয়া যে, আমরা নিরাপদে স্পেনের উপকূলে এসে পৌঁছতে পেরেছি। আপনারা জানেন যে, আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করেন। আল্লাহ চাহে তো, আমরা স্পেন জয়ে সক্ষম হবো। আমি আজ রাতে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছি। তিনি আমাকে স্পেন জয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। আপনারা অবশ্যই ভেবেছেন যে, এই অভিযানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের আনাচে-কানাচে আমাদের শত্রু বিরাজিত। এদেশের পথ-ঘাট আমাদের অজ্ঞাত, আমরা নিরস্ত্র ও সরঞ্জামবিহীন। সংখ্যায়ও আমরা অতি নগণ্য। তদুপরি আমরা পায়ে হেঁটে যাত্রা করেছি। অতএব আমাদেরকে অনেক কষ্ট পোহাতে হবে। যারা এসব কষ্টের জন্য প্রস্তুত নন, তারা দেশে ফিরে যেতে পারেন। আমি তাদেরকে সানন্দে বিদায় দিচ্ছি।

সকল মুজাহিদ নিশ্চুপ-নির্বাক। কেউ কোন কথা বলছে না। তারিক আবার বললেন, আপনাদের কেউ কি ফিরে যেতে চান না? সকলেই একবাক্যে আওয়াজ তুললেন, না-না, আমরা কেউই ফিরে যাব না। তারিক বললেন, আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন, এখনো সময় আছে। সবাই বললেন, আমরা অনেক ভেবেছি। আমরা মুসলমান, শাহাদাৎ আমাদের কাম্য। এর চাইতে বড় কৃতিত্ব আর কি হতে পারে?

তারিক–যদি তাই হয়, আমরা কেউই যখন ফিরে যেতে চাই না, তাহলে এসব জাহাজের কি প্রয়োজন?

একজন বললেন–না, এসবের কোন প্রয়োজন নেই।

তারিক–তাহলে এই নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমরা কেন ধরে রাখব?

অপর একজন বললেন–জাহাজগুলো ফেরত পাঠানো হোক।

তারিক–না, তা বোধ হয় ঠিক হবে না।

মুগীছ–আপনার কি অভিমত?

তারিক–আমি জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চাই।

সকলেই বললেন, পুড়িয়ে ফেলা হোক, সে-ই ভাল।

তারিক–তাহলে তাই করা হোক।

কয়েকজন মুজাহিদ এগিয়ে গেলেন। তাঁরা নৌকাগুলো জাহাজে তুলে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। সকল মুজাহিদ তীরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করেন।

কেউ ভাবতে পারেন যে, জাহাজগুলো পুড়িয়ে দিয়ে তারিক হয়ত ভুল করেছিলেন। কারণ এগুলো দিয়ে তারা আবার দেশে ফিরে যেতে পারবেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন, এর দ্বারা মুজাহিদদের মনোবল সুদৃঢ় করতে। আর হয়েছিলও তাই। মুজাহিদরা দৃপ্ত শপথ নিয়েছিল যে, হয়ত তাঁরা যুদ্ধে জয়ী হবেন, নতুবা শাহাদাৎ বরণ করবেন। এই দৃঢ়তাই পরবর্তী অভিযানগুলোতে তাঁদেরকে বিজয় এনে দিয়েছিল।

মুসলিম মুজাহিদরা ৯২ হিজরী সালের ৫ই রজব রোজ সোমবার স্পেন উপকূলে অবতরণ করেছিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজগুলো পুড়ে গিয়ে সমুদ্রের অথৈ পানিতে তলিয়ে গেল। তারিক সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন আমাদের ফিরে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই। আমাদের সামনে এখন কেবল দু'টি পথই খোলা আছে, হয় বিজয় নতুবা মৃত্যু।

সবাই বললেন, আমরা সে দু'টির যে কোন একটির প্রত্যাশী।

তারিক–মানুষ যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন কিছু করার ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেন। আমরাও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি। আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

সকলেই বললেন–নিশ্চয়ই।

তারিক–তাহলে আল্লাহ্র নাম নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন।

সকলে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। এই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র উপকূলে; আকাশে-বাতাসে তা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে সময় থেকে সে পাহাড়টির নামকরণ করা হয় জাবালে তারিক (জিব্রালটার)। আজো স্থানটি সে নামেই পরিচিত। মুসলিম মুজাহিদরা সামনে এগুলেন। সারা পাহাড়-জুড়েছিল সবুজের সমারোহ, নানা ফল-ফুল ও সবুজ ঘাসে সুশোভিত। তাঁরা ধীরে ধীরে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে

এলেন। অনেক দূর এসে হলুদ রঙের রেশমী পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তির দেখা পেলেন। লোকটিকে খুবই চিন্তিত ও অস্থির মনে হচ্ছিল। তারিক লোকটিকে দেখে মুগীছকে বললেন, তাকে তো খ্রিস্টান বলে মনে হচ্ছে না।

মুগীছ–আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তারিক–তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না, সে কে, কিজন্য এখানে ঘুরাঘুরি করছে

অতঃপর মুগীছ একজন সিপাহীকে লোকটিকে ডেকে আনতে পাঠান।

সিপাহী তাকে ডেকে নিয়ে আসল। লোকটি এসেই তারিককে সালাম জানাল। তারিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একা এখানে কি করছ ?

লোকটি উত্তর দিল–আমি আপনাদের তালাশ করছিলাম।

তারিক বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাদেরকে ?

লোকটি উত্তর দিল–জী হাঁ।

তারিক–তুমি কি আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়েছিলে ?

লোকটি–আমাকে বলা হয়েছিল।

তারিক–কে বলেছিল ?

লোকটি–আমি সবকিছুই আপনাকে বলব। আমি একজন মজলুম। খ্রিস্টানরা আমাকে বহু অত্যাচার করেছে; আপনি আমার কাহিনী শোনবেন কি?

তারিক–নিশ্চয়ই শুনব। আমরা নিপীড়তদের সাহায্য করি।

লোকটি–একমাত্র আপনারাই আমার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

তারিক–তুমি তোমার কাহিনী শোনাও।

লোকটি–ধন্যবাদ, আমি বলছি।

তারিক, মুগীছ ও সকল মুজাহিদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটিকে দেখতে লাগলেন।

লোকটি ছিল মধ্যবয়সী। পরনে ছিল সুন্দর বর্ণের দামী রেশমী পোশাক। গলায় হীরার মালা। সে খেকিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমি একজন দুর্ভাগা ইহুদী, নাম আমামন। আমি কর্ডোভার বাসিন্দা; হীরার ব্যবসা ছিল আমার। কয়েক যুগ ধরে আমি এখানে বসবাস করছি। সারা দেশে আমার সুখ্যাতি রয়েছে। আল্লাহ্ আমাকে অগাধ ধন-সম্পত্তি দিয়েছেন; কিন্তু এদেশের নিয়মনীতি অত্যন্ত অমানবিক, আইন-কানুনের কোন বালাই নেই। শাসকরা সম্পদশালীদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

লোকটির কথায় ছেদ টেনে তারিক বললেন, বোধ হয় তোমারও ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে।

আমামন–জী না; তা নিলে এত দুঃখিত হতাম না।

তারিক–তোমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে?

আমামন–জী না, এক যুগ আগে আমার স্ত্রীর বিয়োগ ঘটেছে।

তারিক–তাহলে কি তোমার কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়েছে?

আমামন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জী হাঁ। আমার মৃত স্ত্রীর একমাত্র স্মৃতি আমার নয়নের আলো হৃদয়ের টুকরো একমাত্র কন্যাকে সেই জালিমরা ছিনিয়ে নিয়েছে।

একথা বলতে বলতে আমামনের হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। মুখ লাল হয়ে যায়। তারিক, মুগীছ ও অন্য সকল মুজাহিদও তাঁর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে উঠেন। তারিক তাকে বললেন, দুঃখ করো না। আল্লাহ্ চাহে তো আমরা তোমার কন্যাকে উদ্ধারের চেষ্টা করব।

আমামন-আপনার কাছে আমার এটাই প্রত্যাশা।

তারিক–তোমার কন্যাকে কে নিয়েছে?

আমামন-রাজা রডারিক অত্যন্ত লম্পট। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে রানীর সান্নিধ্যে রাজপ্রাসাদে আগত মেয়েদের সে সতীত্ব হরণ করে। তার ক্ষমতালাভের পর থেকে জনগণের জান-মাল ও মান-ইজ্জতের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। সে জোরপূর্বক কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিণ্ডার সতীত্ব হরণ করে।

তারিক–আমরা তা জানি।

আমামন–সে সারাদেশে কিছু পুরুষ ও মহিলা ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা সুন্দরী নারী ও বালিকাদেরকে ফুসলিয়ে, লোভ দেখিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে নিয়ে আসে।

তারিক–রডারিকের বয়স কত?

আমামন–সে বৃদ্ধ হুযুর। এ বয়সেও তার লাম্পট্যের নেশা কাটেনি।

তারিক–লোকেরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে না কেন?

আমামন-কে বোঝাবে হুযুর। সকলেই তো রিপুর দাসে পরিণত হয়ে ভোগ-বিলাসময় জীবনের অপবিত্র গর্তে ডুবে আছে।

তারিক–তাহলে তো দেখছি সবার অবস্থাই দুঃখজনক।

আমামন–হুযুর, আমরা ইহুদীদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে এবং আমাদের কন্যাদের ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে।

তারিক–তারা তো দেখছি ধ্বংসের সাথে খেলা করছে।

আমামন–হুযুর, আল্লাহ্ কি তাদের পতন ঘটাবে না?

তারিক–নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র বিচার খুবই কঠিন, তিনি সকল পাপীর পতন ঘটান।

আমামন–আমরা ইহুদীদের বিশ্বাসও তাই।

তারিক–তোমার কন্যাকে কে নিয়েছে, তা-তো বললে না?

আমামন–রডারিকের এক অনুচর, তার নাম আমার জানা নেই।

তারিক–তোমার কন্যাকে কি প্রলুব্ধ করে নেয়া হয়েছে?

আমামন–জী না হুযুর, আমার সামনেই তারা আমার কন্যাকে জোর করে নিয়ে গেছে। তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

তার নিষ্পাপ দৃষ্টি বলছিল, আমি যেন তাকে সাহায্য করি এবং এই জানোয়ারদের হাত থেকে তাকে মুক্ত করি।

একথা বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। তার চোখে অশ্রু দেখা দিল তারিক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করো না। মানুষ যখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়, তখন তার আর কোন কিছু করার শক্তি থাকে না। তুমি ধৈর্য ধারণ করো, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও। আল্লাহ্ তোমায় সাহায্য করবেন।

আমামন-নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেব। আমি সে মুহূর্তেরই অপেক্ষায় রয়েছি।

তারিক–তোমার কন্যার বেদনাবিধুর কাহিনী শোনার কথা বলে আমি তোমাকে আরো ব্যথিত করে তুললাম, এজন্য আমি দুঃখিত।

আমামন–কাহিনী বর্ণনায় আমি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেও এর দ্বারা হৃদয়ের ব্যথা অনেকটা লাঘব হলো। আমি নিজেই আমার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম, যদ্বারা আপনি আমাদের সঠিক অবস্থা বুঝতে পারেন।

তারিক–তোমার কাহিনী শুনে আমার শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

আমামন–যার মধ্যে মনুষ্যত্ব রয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। জানোয়ারেরা যখন তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে ছাড়ানোর জন্য আমি এগিয়ে যাই। তাদের দু'জন নরঘাতক আমার মাথায় সজোরে আঘাত করে। আমি একটি শক্ত পাথরের উপর পড়ে যাই এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।

তারিক দাঁতে দাঁত কটমটিয়ে বললেন, এ-তো দেখছি হৃদয়হীন মানুষ।

আমামন–তারা নির্দয় নরপিশাচ, মনুষ্যত্বের কলঙ্ক।

তারিক–আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এর প্রতিফল দেখাবেন।

আমামন–হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষ হাত তুলে তাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে।

তারিক–সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তুমি কি করলে?

আমামন-আমি দেখি, ওরা আমার কন্যাকে নিয়ে চলে গেছে। আমার সব ধন-সম্পদও লুণ্ঠিত হয়েছে। সম্পদের প্রতি আমার কোন প্রকার আকর্ষণ ছিল না; কিন্তু কন্যার অনুপস্থিতি আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমি এক কামরা থেকে অপর কামরায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ আমার এ অবস্থা থাকে। রাতের অমানিশা নেমে আসে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাই।

আমি ক্রমান্বয়ের দুর্বল হয়ে পড়ি। কখন যেন তন্দ্রায় চোখ বুজে আসে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমি সাদাপোশাক পরিহিত একজন বুজুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পাই। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলছেন, কোন চিন্তা করো না। তোমার কন্যা নিরাপদেই রয়েছে। তাকে উদ্ধারকারী দলও ইতিমধ্যে এসে গেছে। তুমি সবুজ দ্বীপে যাও। সেখানে গিয়ে সে দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আমি শুধালাম, তাঁদেরকে কিভাবে চিনবো? জবাব দিলেন, সাদা পোশাক দেখেই তাঁদেরকে চিনতে পারবে। তদুপরি

তাঁদের মাথায় রয়েছে লম্বা পাগড়ী। জাতিতে তাঁরা মুসলমান। এমনি মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ি। তখন ভোর হয়ে আসছিল। আমি আমার ঘর বন্ধ করে আপনাদের তালাশে বেরিয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌র হাজার শুকরিয়া যে, আপনাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

আমামনের বর্ণনা শুনে মুসলমানরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন। তারিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ দিনের ঘটনা?

আমামন–তা প্রায় এক মাস আগের ঘটনা।

তারিক–তোমার কন্যার নাম কি?

আমামন–তার নাম বিলকীস।

তারিক–ইহুদীদের মধ্যে তো সাধারণত এরূপ নাম রাখা হয় না।

আমামন–হযরত সুলায়মানের এক কন্যার নাম ছিল বিলকীস। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন। আমার কন্যাও পরমা সুন্দরী। তাই তার নাম রেখেছি বিলকীস।

তারিক–বিলকীসকে কোথায় নেয়া হয়েছে, তা কি তোমার জানা আছে?

আমামন–লুণ্ঠনকারী সে দলের একজন আরোহীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে জানাল যে, বিলকীস তাদমীরের দলের সঙ্গে রয়েছে।

তারিক–তাদমীরের সৈন্য দলের অবস্থান এখান থেকে কতদূর?

আমামন–খুব বেশী দূরে নয়। এখান থেকে ৪/৫ মাইল হতে পারে।

তারিক–তাহলে এর মধ্যে আমরা আর বসছি না। ভোর হলেই আমরা তাদমীরের উপর হামলা চালাব।

আমামন–তা-ই হোক হুযুর! সে নরপিশাচদের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমিও শান্তি পাচ্ছি না।

মুগীছ ও অন্য মুজাহিদরা পরামর্শ দেন যে, আজ এখানেই রাত যাপন করা হোক। তদনুযায়ী এখানেই অবস্থান করা হলো। তাদের কাছে কোন তাঁবু ছিল না। এ জন্য খোলা আকাশের নিচে তাঁরা অবস্থান গ্রহণ করেন।

রাতে মুজাহিদরা মিলে খাবার তৈরী করলেন। আমামনকেও খেতে দেয়া হলো। অতঃপর এশার নামায পড়ে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে অযু সেরে সকলেই ফজরের নামাযে শরীক হন। মুসলমানরা নামায পড়ছিলেন। আমামন এক দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়েছিল। মুসলমানদের ইবাদত পদ্ধতি তার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

একরাত মুসলমানদের সঙ্গে কাটিয়েই আমামনের মনে গভীর ভাবোদয় হলো। সে বুঝতে পারল যে, মুসলমানদের আচার-আচরণ সকল প্রকার কৃত্রিমতার ঊর্ধ্বে। তাঁদের সকল প্রয়াস একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। আমামন যেন এমনটি আর কখনো দেখেনি।

নামায শেষ করেই মুজাহিদরা নিজ নিজ জিনিসপত্র নিজেদের কোমরে বেঁধে নিলেন। মুসলমানদের এরূপ সহমর্মিতা দেখে আমামন অভিভূত হয়ে পড়ে।

মুজাহিদরা জানতে পেরেছিল যে, সবুজ দ্বীপের শেষ প্রান্তে তাদমীরের অবস্থান। অতএব সেখানেই শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাদের মুকাবিলা হবে। তাঁরা এই জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সামনে এগুচ্ছিলেন।

দুপুর হওয়ার আগেই মুজাহিদরা সবুজ দ্বীপের বাইরে চলে এলেন। কিছুদূর এগিয়ে খ্রিস্টানদের তাঁবু দেখতে পেলেন। খ্রিস্টানরা তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আরো নিকটে গিয়ে মুজাহিদরা জোরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুললেন। এ আওয়াজ শুনে খ্রিস্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল এবং তাঁবু থেকে বেরিয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে মুসলমানদেরকে দেখতে লাগল।

সাত

যুদ্ধ

এটা ছিল তাদমীরের সৈন্যদল। বহু দূর পর্যন্ত শুধু তাঁবুর সারি আর সারি। কোন কোন তাঁবুর সামনে পর্দা ঝোলানো ছিল। তাঁবুর পেছন দিকে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। খ্রিস্টানরা বিস্মিত চোখে মুসলমানদের দিকে তাকিয়েছিল। তাদমীর ছিল বয়সে তরুণ। তা সত্ত্বেও সে ছিল খুবই চতুর, বিচক্ষণ এবং সাহসী। তাদমীর তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। স্পেনের খ্রিস্টানরা ইতিপূর্বে আর কখনো মুসলমানদেরকে দেখেনি। তারা হতবাক হয়ে ভাবছিল এবং দেখছিল এরা কারা, কোত্থেকে এসেছে? তাদমীর সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়েই তাঁরা শিবিরে চলে গেল এবং দ্রুত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের ময়দানে এসে জমায়েত হতে লাগলো।

তারিক মুজাহিদদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম মুজাহিদরা ছিল পদাতিক। তাঁদের কারো অশ্ব ছিল না; এমনকি তাঁদের সবার নিকট প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। কারো ছিল তলোয়ার, কারো বর্শা, আবার কারো ছিল তীর-ধনুক। অনেকে কেবল লাঠিকেই অস্ত্ররূপে নিয়ে এসেছিল; আর বর্মের তো প্রশ্নই উঠে না।

তারিক সামনের সারিতে বর্শা ও তলোয়ারধারী চারজন করে মুজাহিদকে দাঁড় করান এবং একজন ধনুকধারীকে তাদের মাঝখানে দাঁড় করান। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সারিতে তলোয়ার ও বর্শাধারীদের দাঁড় করান। পঞ্চম সারিতে তীরন্দাজ এবং সবশেষে লাঠিয়ালদের সারিবদ্ধ করেন।

মুসলমানদের সারিবদ্ধ করার সময় তাদমীর ও তার সৈন্যদলকে বিন্যস্ত করেন। খ্রিস্টান সৈন্যরা সকলেই লৌহবর্ম পরিহিত ও সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তাছাড়া তারা সবাই ছিল অশ্বারোহী। তাদের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন মুসলমানদেরক এক নিমিষেই ধূলিসাৎ করে ফেলবে।

তাদমীর সারি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলেন এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, হে লোকেরা, বলতে পারো, তোমরা কে, কোত্থেকে এসেছ?

তাদমীর তাদের ভাষায় কথা বলায় মুসলমানরা তার কথা বুঝতে পারলো না। তারিক আমামনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

ইনি কে, তাকে কি আপনি চিনেন?

আমামন–হাঁ তাকে চিনি। তার নাম তাদমীর, খ্রিস্টান সৈন্যদলের সেনাপতি।

তারিক–তাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি বলতে চাচ্ছেন।

আমামন সারির পেছন থেকে এগিয়ে গেলেন। তাকে দেখা মাত্রই তাদমীর ক্ষেপে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে দুষ্ট ইহুদী, তুমিই কি তাদের ডেকে এনেছ? তোমার সমস্ত জাতির উপর এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেব। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, তোমরা ইহুদীরা তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ।

আমামন অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, আমরা ডেকে আনিনি। তোমার স্বজাতিই তাদেরকে ডেকে এনেছে।

তাদমীর রাগে কটমট করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, কে সেই বিশ্বাসঘাতক?

আমামন–সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান। তার কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে-ই তাদেরকে নিয়ে এসেছে।

আমামনের কথা শুনে তাদমীর কিছুটা স্তম্ভিত হলেন। তিনি কি যেন ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, তুমি আমাকে প্রতারিত করছ। সৈন্যদলের সঙ্গে রয়েছ তুমি। অথচ জুলিয়ানের কথা বলছ। তুমিই তাদেরকে ডেকে এনেছ। এতদিন তোমরা ইহুদীরা এদেশে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই বসবাস করছিলে, তোমরা হয়েছিলে অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী; কিন্তু এখন থেকে কোন ইহুদীকে আর স্পেনে জীবিত থাকতে দেয়া হবে না। তোমাদেরকে সমূলে উৎখাত করা হবে।

আমামন কিছুটা রাগত কণ্ঠে বললেন, হে শয়তান, সুযোগ পেলে তো তা নিশ্চয়ই করবে। আমরাও এ জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ মজলুমদের সাথে রয়েছেন। তিনিই মজলুমদের সাহায্যার্থে এসব ধর্মপ্রাণ লোককে পাঠিয়েছেন।

তাদমীর কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আমামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনই তুমি তোমার সাহায্যকারীদের করুণ পরিণতি দেখতে পাবে।

আমামন কিছুটা চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। আমার কন্যাকে কোথায় রেখেছ? তাদমীর বললেন, সে আমার বিশেষ তাঁবুতে অবস্থান করছে। এখন পর্যন্ত আমরা তার কোনরূপ অসম্মান করিনি; বরং তাকে আরামেই রেখেছিলাম; কিন্তু তাকে চরমভাবে অসম্মান করা হবে।

আমামন–হাঁ, তুমি জীবিত থাকলে তা তো করবেই?

তাদমীর তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন। আমামনের কথার কোন উত্তর দিলেন না। তারিক তাদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি তা জানার

জন্য আরো আগ্রহী হয়ে উঠেন। আমামন ফিরে এলে তারিক তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে?

আমামন সমস্ত বিষয় তারিককে অবহিত করেন। তারিক বললেন, তাদমীর তার সৈন্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য গর্ববোধ করছে। কিন্তু সে জানে না যে, মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহ্ রয়েছেন। তিনি অহংকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ চাহে তো সে তার নিজের পরিণতি নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

আমামন–সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, বিলকীস তাদমীরের সঙ্গেই রয়েছে। সম্ভবত আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দেবেন।

তারিক–আল্লাহ্র কাছে দু'আ করো। তিনিই সকল শক্তির উৎস।

এমন সময় খ্রিস্টান সৈন্যদের মধ্যে রণবাদ্য বেজে উঠল। তারিক বুঝতে পারলেন যে, খ্রিস্টান সৈন্যরা এখনই হামলা চালাবে। তিনি মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বলেন, হে মুসলিমগণ, শত্রুরা আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রয়াসী। আমাদের জন্য স্পেনে এটাই প্রথম আক্রমণ। তোমরা যদি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে এ আক্রমণে সফলতা লাভ করতে পার, তবে সারা স্পেনেই তোমাদের জয়জয়কার পড়ে যাবে। তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের সামনে রয়েছে বিরাট সৈন্যদল,পশ্চাতে সমুদ্র। পালিয়ে জীবন রক্ষা করার কোন উপায় নেই। যুদ্ধ করো। জীবনপণ যুদ্ধ করো। নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুদ্ধ করো। শত্রু বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলো। তাদের মৃতদেহ দ্বারা সমগ্র রণাঙ্গন একাকার করে ফেলো।

সেনাপতির এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ শোনার পর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রবল ক্ষোভ ও প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। তাঁরা মরা ও মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে খ্রিস্টান বাহিনী অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাদের ধারণা ছিল, তারা ঘোড়ার খুরের সাহায্যে মুসলমানদের দলিত-মথিত করে ফেলবে। খ্রিস্টান বাহিনীর এগিয়ে আসার ধরন দেখে মুসলমানরাও তাই মনে করছিল। কিন্তু তাতে মুসলমানদের মধ্যে এতটুকু ভয়ের সঞ্চার হয়নি। তারা অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টানদের এগিয়ে আসা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা বেশ নিকটে এসে পড়ে। তারিক থেমে থেমে তিনবার তাকবীর ধ্বনি করেন। তৃতীয়বারের পর মুসলমানরা সমবেত কণ্ঠে সজোরে আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করেন। এই তাকবীরের ভয়ংকর ধ্বনিতে পুরো রণাঙ্গন কেঁপে উঠে।

খ্রিস্টানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু থামেনি, সামনে এগুতে থাকে। মুসলমানদের নিকট পৌঁছে আক্রমণ করে বসে। তারা নিজেদের সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মুসলমানরাও আলেকজাণ্ডারের প্রাচীরের ন্যায় এক জায়গায় অবিচল থেকে খ্রিস্টান বাহিনীর মুকাবিলা করে।

খ্রিস্টানরা তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। তাদের শ্বেত-শুভ্র তরবারিগুলো প্রখর রোদের আলোয় ঝলমল করছিলো। মুসলমানরা বর্শার সাহায্যে প্রতি-আক্রমণ করে। তাদের বর্শার অগ্রভাগও চিকচিক করছিলো। উভয় পক্ষ ক্রুদ্ধ ও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে পরস্পরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছিলো।

রণাঙ্গনে খ্রিস্টান বাহিনী শোরগোল শুরু করে। তাদের হৈ-হাঙ্গামায় সারা যুদ্ধক্ষেত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা নীরবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। তাঁরা ক্রোধ ও উদ্যমের সাথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছিলো। প্রতিটি মুসলমান অগ্নিশর্মা হয়ে সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে বর্শা নিক্ষেপ করছিলো। তাঁরা বেশীর ভাগ শত্রুপক্ষের ঘোড়াগুলো বর্শার লক্ষ্যে পরিণত করেছিল। বর্শার আঘাত বিদ্ধ প্রতিটি ঘোড়া লাফিয়ে উঠতো এবং পিঠের আরোহীকে মাটিতে ফেলে দিত। যে সৈন্যটি একবার মাটিতে পড়ে যেতো তার আর উঠার সৌভাগ্য হতো না। প্রথমে ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে সে পিষে যেতো। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'একজন দাঁড়াতে সক্ষম হলেও মুজাহিদদের বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যেতো। মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদের প্রথম সারি প্রায় শেষ করে ফেলে। তারা দ্বিতীয় সারি লণ্ডভণ্ড করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। খ্রিস্টানরাও মুজাহিদদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তারাও ক্রুদ্ধ হয়ে হামলা করছিল। কিন্তু তাদের আক্রমণ কার্যকর হচ্ছিল না। আঘাত হানতে গিয়ে নিজেরাই নিহত হচ্ছিল। মুসলমানরা তাদের হত্যা করছিল। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে উভয় পক্ষ এলোমেলো হয়ে পড়ে। মুসলমানরা খ্রিস্টানদের ভিতর এবং খ্রিস্টানরা মুসলিম বাহিনীতে ঢুকে পড়ে। যেখানে যে ঢুকেছে সেখানেই সে যুদ্ধ করতে থাকে। এ সময় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুসলমানরা অত্যন্ত উদ্যম নিয়ে হামলা শুরু করে। তাঁদের রক্তমাখা তরবারি বহু দূর পর্যন্ত সঞ্চালিত হতে থাকে।

রণাঙ্গনে রক্তের স্রোত বয়ে চলে। মানুষের দেহ, হাত, পা, মাথা কেটে মাটিতে পড়তে থাকে। আহতদের আর্ত চিৎকার, ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি ও খ্রিস্টান সৈন্যদের হৈ-হাঙ্গামায় সারা রণাঙ্গন তোলপাড় হচ্ছিলো। কানের কাছে কথা বললেও শোনা যাচ্ছিল না। যুদ্ধের দাবানল প্রচণ্ডভাবে প্রজ্বলিত হচ্ছিলো। আর মানুষ এই অনলে জ্বলে-পুড়ে মরছিল। খ্রিস্টানরা মুসলিম বীরদের শেষ করে দিতে চাচ্ছিল। এই সংকল্প নিয়ে তারা সবাই শিবির ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সবাই এক সাথে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের শিবির একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়।

আমামন এরূপ একটি সুযোগের সন্ধানে ছিল। সে খ্রিস্টানদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাদের শিবিরের দিকে এগিয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য, কন্যা বিলকীসকে খ্রিস্টান শিবির থেকে বের করে নিয়ে আসা। রণাঙ্গনের শেষ প্রান্তে একজন মুসলির্ম মুজাহিদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি দাঁড়িয়ে কাপড় নিঙড়াচ্ছিলেন। তাঁর নাম ইসমাঈল। তিনি অনেক খ্রিস্টান সৈন্য হত্যা করেন। তাঁর কাপড় রক্তে ভিজে গিয়েছিল। ইসমাঈল ছিলেন একজন

যুবক ও সিংহ-হৃদয় বীর সৈনিক। আমামন তাঁর নিকট গিয়ে বললো, বীর যুবক। তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পার? ইসমাঈল বললেন, অবশ্যই। তবে এখন যুদ্ধ চলছে। একটু দাঁড়াও। আমি অমানুষগুলোকে শেষ করে দেই।

আমামন–কিন্তু আমাকে সাহায্য করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

ইসমাঈল–তুমি কি সাহায্য চাও?

আমামন–আমার কন্যা তাদমীরের শিবিরে রয়েছে। তাকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি তাকে মুক্ত করতে চাই।

ইসমাঈল–এখন একটু ধৈর্য ধারণ কর। যুদ্ধ শেষ করতে দাও।

আমামন অত্যন্ত মিনতি স্বরে বললো, এটাই সুবর্ণ সময়। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য কর। তোমার সন্তান নেই। তাই তুমি পিতৃস্নেহ কি বুঝবে না।

এ কথার পর আমামনের প্রতি ইসমাঈলের দয়া হলো। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে চলো।' তাঁরা উভয়ে দ্রুতপদে খ্রিস্টান শিবিরে গিয়ে পৌঁছল। সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শিবিরটিতে তাঁরা ঢুকে পড়ল। তাঁরা দেখলো, রেশমের মজবুত রশি দ্বারা বাঁধা অবস্থায় বিলকীস শিবিরের এক কোণায় পড়ে আছে। তাকে দেখেই আমামন তার নিকট দৌড়ে গেল। সে বললো, হায় আমার নয়নের পুতুল! তোমার এ অবস্থা। বিলকীস উঠার চেষ্টা করলো কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিলো। উঠতে পারলো না।

আমামন বিলকীসের নিকট গিয়েই তার উপর ঝুঁকে পড়লো। পিতৃস্নেহে আত্মহারা হয়ে তাকে চুমো খেতে লাগলো। বিলকিস সত্যি সুন্দরী ছিল। অপরূপা সুন্দরী। তার চেহারা থেকে সৌন্দর্যের শিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ডাগর ডাগর চোখ। লাবণ্যময় গোলগাল চেহারা। গণ্ডদেশ ছিল গুলাবের পাপড়ির মতো লাল ও সাদা। সে ছিল সৌন্দর্যের এক বিরল প্রতিচ্ছবি। ইসমাঈল তাকে দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েন। বিলকীস বললো আমার বাঁধন খুলে দাও। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমামনের নিকট বাঁধন কাটার মতো কোন হাতিয়ার ছিল না। সে ইসমাঈলের দিকে তাকালো। এদিকে ইসমাঈল পরীতুল্য বিলকীসের রূপলাবণ্যে বিভোর হয়ে পড়ছিলেন। আমামন তাঁকে বললেন, দয়ালু যুবক। তার বাঁধনগুলো খুলে দাও।

আমামনের কথায় ইসমাঈল চমকে উঠলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন। তরবারি দ্বারা বাঁধনগুলো কেটে দিলেন। বিলকীস এ পর্যন্ত ইসমাঈলকে দেখেনি। তাঁর উপর চোখ পড়তেই কিছুটা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল। বাঁধন খুলে দেয়ার পর বিলকীস উঠে দাঁড়ালো। সে সকৃতজ্ঞতায় আকর্ষণীয় দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া প্রকাশ করলো।

বিলকীসের এই মনোহর ভঙ্গিও ইসমাঈলের অন্তরে রেখাপাত করলো। এমনকি তিনি বিলকীসের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জবাব পর্যন্ত দিতে পারলেন না।

আমামন বললো, এখন এখানে বিলম্ব করা বিপদ হতে পারে। চলুন, আমরা এখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি বিলকীস বললো, চলুন আব্বাজান।

তাঁরা শিবিরের বাইরে পা রাখতেই তাদমীরসহ ৫০/৬০ জন খ্রিস্টান সৈন্যের সাথে দেখা হয়ে গেল। তাদমীর তাদের দেখেই বলল, 'ও তোমরা সুন্দরীকে নিয়ে যেতে চাচ্ছো।'

তারা এতগুলো খ্রিস্টানকে দেখেই থমকে গেল। নির্বাক হয়ে তাদের দিকে তাকাতে লাগলো।

আট

পরাজয়

আমামন ও ইসমাঈল যখন খ্রিস্টানদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল। চারদিকে তলোয়ারের দ্রুত উঠা-নামার দৃশ্য। সমস্ত রাণাঙ্গণে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফুটবলের ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটকে পড়ছিল। উভয় পক্ষই যেন তাদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল। সমস্ত ময়দানে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছিল। খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল তারা সহজেই মুসলমানদের পরাস্ত করবে অথবা পিছু হটতে বাধ্য করবে। কারণ তারা ইতিপূর্বে আর কখনো মুসলমানদের মুকাবিলা করেনি। তাই মুসলমানদের শক্তি-সাহস সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। খ্রিস্টানরা যখন লক্ষ্য করল যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানরা পিছপা হচ্ছে না; বরং তারা নিজেরাই ক্রমাগত নিহত হচ্ছে, তখন তারা হতভম্ব হয়ে পড়ল। তারা দেখতে পেলো যতই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা মুসলমানদের উপর হামলা চালাচ্ছে, ততই তারা মুসলমানদের হাতে নিহত হচ্ছে।

মুসলমানরা এক অদম্য উৎসাহ নিয়ে যুদ্ধ করছিল। তাঁরা খ্রিস্টানদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এমন ক্ষিপ্রগতিতে পাল্টা আক্রমণ চালাতো যে, আক্রমণকারীকে হত্যা না করা পর্যন্ত ফিরে আসতো না। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রকে তলোয়ারের কৌশল প্রদর্শনের এক রঙ্গমঞ্চ মনে হচ্ছিল। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে; কিন্তু কোন পক্ষেরই উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি। মুসলমানরা চাচ্ছিলেন, দুপুরের মধ্যেই যুদ্ধের শেষ ফয়সালা করে ফেলবেন; কিন্তু খ্রিস্টানরাও এমন নাছোড়বান্দা ছিল যে, ক্রমাগত মৃত্যুবরণেও তারা পিছপা হলো না; বরং মরণপণ যুদ্ধ করছিল। মুগীছ আর-রূমী ছিলেন ডান দিকের দলের অধিনায়ক। তিনি এত উদ্যম ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন যে, শত্রুপক্ষের যে-ই তার তলোয়ারের নাগালে আসত তাকেই তাঁর রক্তপিয়াসী তলোয়ার সংহার করে ছাড়তো।

তাঁর এক হাতে ছিল ঢাল অপর হাতে তলোয়ার। ঢাল দ্বারা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গেই তলোয়ার দ্বারা এমন পাল্টা আঘাত হানতেন যে, শত্রুরা কোনভাবেই তা প্রতিরোধ করতে পারত না। খ্রিস্টানরা তাঁর সম্পর্কে এত ভীত হয়ে

পড়েছিল যে, কেউ তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস করতো না; বরং পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। তারিক মুসলিম বাহিনীর মধ্যস্থলে থেকে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় শত্রু-সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যেদিকেই অগ্রসর হতেন, একাধিক সৈন্য হত্যা করে ফিরে আসতেন।

তখনও খ্রিস্টানদের মধ্যে যথেষ্ট মনোবল বিদ্যমান ছিল। তাদমীরও তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদমীরের উপস্থিতিই তাদেরকে উৎসাহিত করছিল। অপর পক্ষে মুসলিম মুজাহিদরা ছিল সম্পূর্ণ বেপরোয়া। সেনাপতি তারিক এত গভীরভাবে যুদ্ধে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর অস্তিত্বের কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে আরো সৈন্য রয়েছে এ সম্পর্কে যেন তাঁর কোন ভ্রুপেক্ষই ছিল না। তাই দেখা যায়, তিনি একাই কোন শত্রুসৈন্যের সারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং বিশজন শত্রুসৈন্যকে হত্যা করেছেন ও দশটি অশ্বকে আহত করেছেন। খ্রিস্টানরা তাঁর সাহসিকতা দেখে অবাক হয়ে পড়েছিল। তারা জানতো না যে, মুসলমানরা কি জাতি এবং তাদের শক্তি ও দৃঢ়তা কতটুকু। তারিক যার উপর তলোয়ারের আঘাত হানতেন তার ঢাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে তলোয়ার মস্তক ভেদ করে গলদেশে গিয়ে পৌঁছতো।

একবার তিনি অপর একটি খ্রিস্টান দলের উপর আক্রমণ চালান। সে দলের সৈন্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ-ষাটের মতো। প্রথম আক্রমণেই তিনি দু'জন খ্রিস্টানকে হত্যা করেন, দ্বিতীয় আক্রমণে আরো একজন নিহত হয়। একজন মুসলমানকে একাকী এভাবে খ্রিস্টানদেরকে হত্যা করতে দেখে খ্রিস্টানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা তারিককে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বৃষ্টির ন্যায় তলোয়ারের আঘাত হানতে থাকে; কিন্তু তাতে তারিক একটুও ঘাবড়াননি। তিনি লৌহপ্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন

তারিক যার উপরই আঘাত হানতেন, তারই করুণ পরিণতি ঘটতো। এভাবে অল্প সময়ে দশ/পনের জন খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো। তা দেখে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল এবং কোন মতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলো। কিন্তু তারিকের তলোয়ার তখন এতই উদ্যত হয়ে পড়েছিল যে, খ্রিস্টানরা কোন মতেই তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পেলো না। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, অর্ধেক খ্রিস্টান নিহত হলো, বাকীরা কোন মতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। তারিক এই যুদ্ধে এত পরিশ্রম করেছিলেন যে, তিনি ঘর্মস্নাত হয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর মুখমণ্ডল থেকে এমনভাবে ঘর্ম বেরুচ্ছিল যে, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন অযু করে এসেছেন, কিন্তু মুখ মুছেন নি। এতক্ষণে তিনি দাঁড়িয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন; তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন, সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে। জোহরের সময় প্রায় শেষ দিকে; কিন্তু

মুসলমানরা খ্রিস্টান সৈন্যদলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় তাদের পক্ষে নামায আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

তারিক অনুতাপ করে বললেন, হায়! আজকে হয়ত মাগরিবের নামাযও আমাদের কাযা হয়ে যাবে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, যুদ্ধের ব্যস্ততার জন্য তোমার বান্দারা আজ জোহরের নামায আদায় করতে পারছে না। তুমি তাদের ক্ষমা করো।

কয়েক মুহূর্ত স্বস্তির পর তিনি আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নেন। তিনি মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুসলিম মুজাহিদগণ, কেন যুদ্ধ এত দীর্ঘতর হচ্ছে, আমরা কেন এখনো খ্রিস্টানদেরকে পরাস্ত করতে পারছি না, এ কিসের ভীরুতা? কথা শেষ করেই তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা নব উদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন; খ্রিস্টানরা তখন পর্যন্ত একই গতিতে যুদ্ধ করছিল; কিন্তু মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে তাদের উদ্যম অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

মুসলমানরা এবার এত তীব্র আক্রমণ রচনা করেছিলেন যে, খ্রিস্টানরা তাঁদের সামনেই আসতে পারছিল না। একের পর এক শত্রুসৈন্যকে হত্যা করে তাঁরা সামনে এগুচ্ছিলেন। তারিক লক্ষ্য করছিলেন, তাদমীর দূর থেকে তার সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করছে। এবার তিনি তাদমীরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তাতে তাদমীর বাধ্য হয়ে তাঁর মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন।

তাদমীর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ চালান; কিন্তু তারিক তার আক্রমণ প্রতিহত করে এমন জোরে পাল্টা আক্রমণ চালান যে, তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদমীরের ঢাল দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়। তাদমীর ঘাবড়ে যান এবং তারিকের মস্তক লক্ষ্য করে ঢালটি ছুড়ে মারেন। তারিক তা প্রতিহত করে দ্বিতীয়বার আক্রমণ রচনা করেন।

তাদমীর বুঝতে পারেন, আর একটু বিলম্ব করলেই তার মৃত্যু অবধারিত। অতএব তিনি সহসা ঘোড়ায় চড়ে বসেন এবং দ্রুত পালিয়ে যান। তারিক কিছুদূর তার পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু তিনি পদাতিক হওয়ায় তাদমীরকে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বাধ্য হয়ে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধরত অন্য খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু খ্রিস্টান সৈন্যরা তাদমীরকে পালিয়ে যেতে দেখে তারাও হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করে।

মুসলিম মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং যাকে যেখানে পান, সেখানেই হত্যা করেন। খ্রিস্টানদেরকে দূরে চলে যেতে দেখে তারিক মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিম ভাইসব, দ্রুত ফিরে এসো। আমাদের জোহরের নামায পড়া হয়নি। এখনো সময় আছে, চলো আমরা নামায সেরে নেই। তাঁর আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা সবাই ফিরে আসেন এবং এক জায়গায় জড়ো হন। অতঃপর অযু করে জোহরের নামায আদায় করেন।

নয়

বন্দীকরণ

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে তাদমীর নিজ ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছেন। আমামন ও ইসমাঈল বিলকীসকে নিয়ে তাদমীরের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তাদেরকে দেখে তাদমীর বিস্মিত হন। তিনি আমামনকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কি বিলকীসকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ?

আমামন, ইসমাঈল ও বিকলীস ঠিক এ মুহূর্তে তাদমীরকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে কিছুটা থমকে যান। তারা একদৃষ্টিতে তাদমীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারা নির্বাক নিশ্চুপ। তাদমীর আবার বললেন, আমামন তুমি কি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে চাও?

আমামন–হাঁ, আমার আদরের ধন নয়নের মণি কন্যাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে চাই।

তাদমীর–তুমি কি জান না যে, তাকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আমামন–পিতার স্নেহ সন্তানের প্রতি কতটুকু, তা কি তুমি জান না ?

তাদমীর–সন্তানের প্রতি যদি তোমার স্নেহ থেকে থাকে, তবে তোমারও তার মঙ্গলের কথা ভেবে তাকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে দাও। তাহলে তোমার কন্যা রাজার কৃপা দৃষ্টি লাভ করবে। তাতে তারও মঙ্গল হবে। তুমিও বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবে।

আমামন–না, আমার কাছে থাকাতেই তার ও আমার প্রশান্তি।

তাদমীর–তুমি তো জান, স্পেনে থাকতে হলে তুমি তোমার কন্যাকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

আমামন–হাঁ, আমি তা জানি।

তাদমীর–এরপরও এরূপ নির্বুদ্ধিতা কেন?

আমামন–আমি মিনতি করছি, তুমি আমার ও আমার কন্যার উপর দয়া করো।

তাদমীর–ইহুদী কুকুর। এটা কি তোমার প্রতি আমাদের দয়া নয় যে, এখনো তোমাকে জীবিত রেখেছি? অন্যথায় তুমি যখন সরকারী বাহিনীকে তোমার কন্যাকে আনার সময় বাধা দিয়েছিলে, তখনই তোমাকে হত্যা করা হতো।

আমামন–এ অপমান থেকে মৃত্যুই আমার জন্য শ্রেয় ছিল।

তাদমীর–তাহলে তুমি কি মরতে প্রস্তুত ?

আমামন–হাঁ, আমার কন্যাকে নিয়ে যাবার আগে আমাকেই হত্যা কর।

আমামনের কথা শুনে তাদমীর তার সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এ কুকুরটার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দাও।

ইসমাঈল তাদের কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি নিঃশব্দে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে একজন খ্রিস্টান সৈন্য তলোয়ার উঁচিয়ে আমামনের দিকে এগিয়ে এলো। তা দেখে বিলকীস এসে তাকে বাধা দান করে এবং বিনয়ের সুরে বলতে থাকে, তোমরা আমার বাবার প্রতি সদয় হও, তাঁকে দয়া করো।

এসব হাবভাব দেখে ইসমাঈল বুঝতে পারেন, খ্রিস্টানরা আমামনকে মেরে ফেলতে চায়। তাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হন। ইতিমধ্যে তাদমীর এসে বিলকীসের হাত ধরে টানাটানি করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, নির্বোধ মেয়ে, তার কাছ থেকে সরে দাঁড়াও।

তাদমীরের ধাক্কা সামলাতে না পেরে বিলকীস পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সে করুণ দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইসমাঈল বুঝতে পারেন বিলকীস তাঁর সাহায্য চাচ্ছে। তিনি দ্রুত তলোয়ার বের করে তাদমীরকে লক্ষ্য করে বললেন, রে দুর্ভাগা, ভাল চাও তো সরে দাঁড়াও। কিন্তু কোন খ্রিস্টান আরবী বুঝতো না বলে তাঁর কথা তাদের হৃদয়ঙ্গম হলো না। তবে ইসমাঈলের উদ্ধত ভাব দেখে তারা বুঝতে পারলো যে তিনি তাদের মুকাবিলা করতে প্রস্তুত।

ক্রমে তাদমীরের মনে মুসলমানদের প্রতি রাগের সঞ্চার হচ্ছিল। কারণ তাঁরা তার বহু সৈন্যকে হত্যা করেছে, তাকে পালাতে বাধ্য করেছে। এর পরও একজন মুসলমানের এরূপ উদ্ধত ভাব দেখে তিনি আরো ক্ষিপ্ত হন। এ সময় তার সঙ্গী সৈন্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ-ষাটের মতো। তিনি একাকী সেই মুসলমানটিকে সমুচিত জবাব দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

তাদমীর তার সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে খ্রিস্টানগণ! তোমরা এ ব্যক্তির স্পর্ধা দেখেছ ? তার উপর আক্রমণ চালাও এবং তাকে হত্যা করো। সকল খ্রিস্টান সৈন্য তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে এলো। ইসমাঈল বুঝতে পারলেন। হয়ত এক্ষুণই খ্রিস্টানরা তাঁর উপর আক্রমণ চালাবে। তিনি একটুও ঘাবড়াননি। তাঁর এক হাতে ছিল ঢাল, অপর হাতে তলোয়ার। রাগত দৃষ্টিতে একবার তিনি চারদিকে তাকান। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যেদিক থেকেই আক্রমণ চালানো হবে, তিনি সেদিকেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এ অবস্থা দেখে বিলকীসের মনে আশংকা হলো যে, ইসমাঈল সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় যুদ্ধ হলে ইসমাঈলের মৃত্যু অবধারিত। বিলকীস তাদমীরের দিকে এগিয়ে যান এবং তাকে বলেন, সম্মানিত নেতা, রক্তপাত কি উচিত হবে?

তাদমীর তার দিকে ফিরে তাকান এবং বলেন, তুমি কি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত?

বিলকীস–হাঁ, শর্তসাপেক্ষে আমি যেতে প্রস্তুত।

তাদমীর–কী সেই শর্ত?

বিলকীস–যুবকটিকে (ইসমাঈলের দিকে ইঙ্গিত করে) ছেড়ে দিতে হবে।

তাদমীর–তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো, সে যদি কোনরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেয়, তবে তাকে ছেড়ে দেবো।

এখন বিলকীস ইসমাঈলের কাছে গিয়ে বলল, হে সাহসী যুবক! আপনি আপনার তলোয়ারটিকে খাপে পুরে রাখুন। ইসমাঈল তাকে তাঁর খুব কাছে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন এবং একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, কেন, খ্রিস্টানরা কি যুদ্ধ করবে না?

বিলকীস বলেন, না, তারা আর এখন লড়তে প্রস্তুত নয়।

ইসমাঈল–তাহলে তাদেরকে বলো, তারা যেন এখান থেকে চলে যায়।

বিলকীস–না ওরা যাবে না, বরং আপনিই এখান থেকে চলে যান।

ইসমাঈল–তুমি ও তোমার পিতা?

বিলকীস–আমার পিতাও চলে যাবেন; কিন্তু আমি......

ইসমাঈল–কেন, তুমি কি যাবে না?

বিলকীস–খ্রিস্টানরা আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

ইসমাঈল–তুমি কি সানন্দেই যেতে চাও ?

বিলকীস– না।

ইসমাঈল–তাহলে?

বিলকীস–আমি তাদের সঙ্গে না গেলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না।

তা শুনে ইসমাঈল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি বললেন, ওরা কি চায় যে, আমি তাদের হাতে বন্দী হয়ে থাকবো?

বিলকীস-আপনি তো একা; কিন্তু তারা তো সংখ্যায় অধিক।

ইসমাঈল-এ ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ চাহে তো আমি একাই তাদের জন্যে যথেষ্ট।

বিলকীস-আমার যে ভয় হচ্ছে।

ইসমাঈল–সুন্দরী যুবতী, আমার জন্য কি তুমি তোমার উপর বিপদ ডেকে আনবে?

বিলকীস–অনেকটা আনমনাভাবে বললেন, হাঁ।

ইসমাঈল–তোমার এ উদারতার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু....

বিলকীস–একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। সে বলল, কিন্তু কিসের ?

ইসমাঈল–আমি আমার জীবন থাকতে তোমাকে তাদের সঙ্গে যেতে দেবো না।

বিলকীস–কিন্তু ওরা যে সংখ্যায় অনেক!

ইসমাঈল–এ ব্যাপারে চিন্তা নাই। সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে ওদের অহংকার রয়েছে; কিন্তু আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি।

তাদমীর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, মুসলমানরা সমবেত হয়ে নামায পড়ছে। তার মনে আশংকা ছিল, হয়ত নামায শেষ করে আবার তাদের পিছু ধাওয়া করবে। এ জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তারা সে স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা করছিল। ইসমাঈল ও বিলকীসের কথাবার্তা বিলম্বিত দেখে তাদমীর বিলকীসের কাছে এসে বলল, যুবকটি কি বলছে?

বিলকীস জানালো, আমাকে রেখে সে ফিরে যেতে রাজী নয়।

তাদমীর–তাহলে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আর দেরী করছি না। তুমি একদিকে সরে দাঁড়াও, এখন আমরা তাকে খতম করে ফেলব। তাদমীর বিলকীসকে হাত ধরে এক পাশে সরিয়ে দেয়। তাদমীরের এ কাজটি ইসমাঈলকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি তাদমীরকে বললেন, রে পাপিষ্ঠ! কুমারীর গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না কিন্তু!

খ্রিস্টানরা তাঁর কথার কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে যুবকটির উদ্ধত ভাব দেখে তাদমীর তার সৈন্যদেরকে বললেন, তোমরা এ যুবককে এক্ষুণই শেষ করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানরা তাঁর উপর হামলা চালাল। ইসমাঈলও আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দ্রুত পাশ কেটে পাল্টা আক্রমণ চালান। প্রথম আক্রমণেই তিনি একজন খ্রিস্টানকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় আক্রমণে আরেকজন নিহত হয়। এভাবে ক্রমাগত আক্রমণে একের পর এক খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হতে থাকে। তিনি এত তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছিলেন যে, তা দেখে খ্রিস্টানরা হতবাক হয়ে পড়ে। বিলকীস অবাক বিস্ময়ে তাঁর যুদ্ধ দেখছিলেন এবং মনে মনে তাঁর নিরাপত্তা কামনা করছিলেন। আমামন বুঝতে পেরেছিলেন, ইসমাঈল একাকী এত সংখ্যক খ্রিস্টানের মুকাবিলা করতে পারবেন না। তাই তিনি খ্রিস্টানদের পাশ কেটে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সংবাদ দেয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে যান। তাদমীর মনে করেছিলেন, খ্রিস্টানরা সহজেই ইসমাঈলকে হত্যা করতে সক্ষম হবে; কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হন। বিরক্ত হয়ে বলতে থাকেন, ঈশ্বরই জানেন, সে কে এবং কোত্থেকে এসেছে। কি দিয়েই বা তাকে তৈরী করা হয়েছে। মরতে তো জানেই না বরং সে একাই আমাদের পঞ্চাশ-ষাটজনকে হয়রান করে ফেলেছে। খ্রিস্টানরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, অথচ তাকে কাবু করতে পারছে না।

ইসমাঈল যার উপরই আক্রমণ চালাতেন, তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হতো। তিনি এমনভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, একবার আক্রমণের পর আবার পরিণতির দিকে তাকাবার তাঁর অবকাশ ছিল না; বরং আরেক জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে, কখনো সামনে কখনো পেছনে; এভাবে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন এবং প্রত্যেক আক্রমণে কমপক্ষে একজন খ্রিস্টান নিহত হচ্ছিল।

এভাবে তিনি প্রায় সতের/আঠারজন খ্রিস্টানকে হত্যা করেন। কিন্তু তখনো তিনি কিঞ্চিত শ্রান্ত হননি। তাদমীর পাশে দাঁড়িয়ে রাগে দাঁত কটমট করছিলেন। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, তিনি ইসমাঈলকে টুকরা টুকরা করে ফেলবেন; কিন্তু তাঁর সামনে যাওয়ার মত সাহস ছিল না। বিলকীস দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের তামাশা দেখছিলেন, তার চোখে ছিল বিস্ময়ের চমক, মুখে আনন্দের রক্তিম আভা। ইতিমধ্যে আরো তিনজন খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো। এমন সময় তাদমীর কি ভেবে হঠাৎ বিলকীসকে ঝাপটে ধরল। বিলকীস চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন জালেম নিষ্ঠুর! দূরে সরে যা।

ইসমাঈল বিলকীসের শব্দ শুনে তার দিকে ফিরে তাকান এবং তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি সামনের খ্রিস্টানদের হত্যা করে তাদমীরের দিকে এগুতে থাকেন। কিন্তু কয়েক পা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানদের অসংখ্য তলোয়ার এসে তাঁর উপর আঘাত হানে। তিনি পাল্টা আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন; এবং আরো একজন খ্রিস্টান সৈন্যকে হত্যা করেন। তা দেখে তাদমীর বিলকীসকে এক পার্শ্বে ঠেলে দেন এবং ইসমাঈলের উপর আক্রমণ চালান। তা প্রতিহত করতে গিয়ে ইসমাঈলের তলোয়ারটি হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। ফলে তিনি অস্ত্রহীন হয়ে পড়েন। বিলকীস দাঁড়িয়ে তাদের যুদ্ধ দেখছিলেন। ইসমাঈলের এ অবস্থা দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং তাঁর দিকে এগিয়ে যান। খ্রিস্টানরা এ অবস্থার সুযোগে একযোগে ইসমাঈলের উপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়, কিন্তু তাদমীর তাদের বাধা দেন এবং তাঁকে বন্দী করতে নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য, রাজা রডারিকের কাছে তাঁকে হাযির করা হবে। তাদমীরের নির্দেশে সকলে মিলে ইসমাঈলকে ধরে ফেলে এবং রেশমী দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। এরপর তারা বিলকীসকেও বেঁধে ফেলে এবং ঘোড়ার উপর তাদেরকে তুলে দিয়ে তাদমীর নিজেও ঘোড়ায় চড়ে বসেন। অতঃপর সকল সৈন্য নিয়ে তাদমীর তাঁবু ছেড়ে যাত্রা করে।

দশ

পশ্চাদ্ধাবন

নামায শেষ করে তারিক সকল মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বললেন, খ্রিস্টানদের যে সকল অশ্ব আরোহীহীন অবস্থায় মাঠে ছুটাছুটি করছে, তোমরা সেগুলো ধরে ফেল। তিনি আরো বলেন, যে অশ্বটি যার হাতে ধরা পড়বে, সেটি তার কাছেই থাকবে। তবে কেউ একাধিক অশ্ব ধরতে সক্ষম হলে বাড়তিটি অপর মুজাহিদ ভাইকে দিয়ে দিতে হবে। অতএব তাঁর নির্দেশে প্রায় আড়াইশ' মুজাহিদ মাঠে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর কিছু সংখ্যক মুজাহিদকে শহীদ মুজাহিদদের একত্রিত করতে এবং কতক জনকে মৃত খ্রিস্টানদেরকে একত্রিত করতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আবার কিছু সংখ্যককে খ্রিস্টানদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে নিয়োজিত করা হলো। ইসমাঈল যে আমামনের সঙ্গে খ্রিস্টানদের তাঁবুতে চলে গেছেন এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তা তারিক বা কোন মুজাহিদেরই জানা ছিল না। তদুপরি তাঁবুর আড়ালে যুদ্ধ হওয়ায় মুজাহিদরা ইসমাঈল বা কোন খ্রিস্টানের গতিবিধিও দেখতে পাননি।

তারিক যখন মুজাহিদদের বিভিন্ন কাজকর্ম দেখছিলেন এমন সময় আমামন এসে সেখানে উপস্থিত হলো। তারিক তাকে দেখে বললেন, চলুন আমরা আপনার কন্যাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। হয়ত সে এখনো তাঁবুতেই রয়েছে। আমামন কম্পিত স্বরে বললেন, দ্রুত সেখানে চলুন।

তারিক তার দিকে তাকিয়ে অনেকটা বিস্ময়ের সুরে বললেন, দ্রুত যাব কেন, তাদমীর কি তাঁবুতে চলে গেছে?

আমামন–জী হাঁ।

তারিক–আপনার কন্যাকে কি তারা সঙ্গে নিয়ে গেছে?

আমামন–আমি তাদের তাঁবু থেকেই এসেছি।

তারিক–আপনার কন্যা কি নিরাপদে রয়েছে?

আমামন–আমি আসা পর্যন্ত নিরাপদেই ছিল।

তারিক–চিন্তা করবেন না, নিয়ে যাওয়ার মত সাহস তাদের নেই।

আমামন–কিন্তু.....

তারিক–কিন্তু কিসের, কি হয়েছে?

আমামন–সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে।

তারিক–বিস্মিত হয়ে বললেন, কার সঙ্গে?

আমামন–আপনাদের একজন সঙ্গীর সাথে।

তারিক–কোন মুসলমান কি সেখানে গিয়েছিল?

আমামন–জী হাঁ, একজন গিয়েছিল।

তারিক–কিভাবে সেখানে গেল?

আমামন–আমি নিয়ে গিয়েছিলাম।

তারিক–কেন!

আমামন–আমার কন্যাকে ছাড়ানোর জন্য।

তারিক–আপনি তো তাকে ছাড়াতে পারবেন না।

আমামন–ছাড়িয়ে তো নিয়েই এসেছিলাম; কিন্তু এমনি মুহূর্তে পঞ্চাশ/ষাটজন সৈন্যসহ তাদমীর সেখানে উপস্থিত হয় এবং আমার সঙ্গী মুসলমানটির সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

তা শুনে তারিক চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন আহা! একজন মুসলমান পঞ্চাশ/ষাটজন শত্রুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আল্লাহ্ তাঁর হেফাযত করুন। তিনি আশপাশের মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাইসব, তোমরা কে কোথায় আছ, শীঘ্র চলো, তোমাদের এক ভাইকে সাহায্য করো। কথা শেষ করেই তিনি খ্রিস্টানদের তাঁবুর দিকে ছুটে চললেন। আমামনও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ালেন; কিন্তু তিনি বয়সের ভারে দ্রুত দৌড়াতে পারছিলেন না, কিছুটা পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে চার/পাঁচশ' মুসলিম মুজাহিদও খ্রিস্টানদের তাঁবুতে গিয়ে প্রবেশ করেন।

তারিক সকলকে সমস্ত তাঁবুটি ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেন। তাঁর কথামত তাই করা হলো এবং একের পর এক তাঁবুগুলোতে তল্লাশী চললো। কিন্তু কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে আমামনও এসে তাঁবুতে পৌঁছলেন এবং তারিককে সঙ্গে করে তাদমীরের তাঁবুতে গেলেন; সে সময় তাঁবুটি ছিল জনশূন্য। তাঁবুর পাশে খ্রিস্টানদের অনেক মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, কিন্তু কোথাও কোন মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া গেল না।

তারিক প্রত্যেকটি মৃতদেহ খতিয়ে দেখেছেন। তিনি বললেন, বীর মুসলিম যুবকটি একুশজন খ্রিস্টানকে নরকে পাঠিয়েছেন। সম্ভবত সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এমনি মুহূর্তে খ্রিস্টানরা তাকে বন্দী করে ফেলেছে।

তারিক আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে করুণাময় আল্লাহ, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমরা তোমার সে সৈনিকটির খবর নিতে পারিনি। হয়ত সে শত্রুদের দ্বারা আটকা পড়েছে। কিয়ামতের দিন তাঁর কথা জিজ্ঞেস করে আমাকে লজ্জা দিয়ো

না। আমি মানুষ, তাই হয়ত আমার দ্বারা এরূপ ভুল সাধিত হয়েছে। তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে। অতঃপর তিনি দু'জন মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বললেন, শীঘ্র ময়দানে চল এবং ২০/৩০ জন অশ্বারোহী মুজাহিদকে ডেকে নিয়ে এসো। তাঁর কথা শোনামাত্রই মুজাহিদ দু'জন দ্রুত দৌড়ে গেলেন

এদিকে তাঁবু অবরোধকারী অন্য মুজাহিদরাও সেখানে এসে সমবেত হলো। সকলেই বলতে লাগল, কোন তাঁবুতেই লোকজন নেই। তারিক তাঁদের কয়েকজনকে খ্রিস্টানদের মৃতদেহগুলো ময়দানে রেখে আসার নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ দু'জন দু'জন করে একেক খ্রিস্টান মৃতদেহ ময়দানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাদের বর্শা ও বর্ম খুলে রাখা হলো।

ইতিমধ্যে ২৫/৩০ জন অশ্বারোহী মুজাহিদ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারিক তাদের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তাদমীর একজন মুসলমানকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমরা আমামনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া কর। কিন্তু বেশীদূর এগুবে না। তাদের সন্ধান পাওয়া যাক বা না যাক রাতের আগেই ফিরে আসবে।

অতঃপর তাঁর নির্দেশ মুতাবিক ২৫ জন মুজাহিদের একটি সৈন্যদল খ্রিস্টানদের পিছু ধাওয়া করল। আমামন একটি ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

তাঁদের বিদায় দিয়ে তারিক অন্য মুজাহিদদের নিয়ে রণাঙ্গনে ফিরে গেলেন। তিনি দেখতে পান খ্রিস্টানদের প্রায় সব ঘোড়াই মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে। মুসলিম মুজাহিদরা মুসলিম শহীদদের ও খ্রিস্টানদের মৃতদেহগুলো একত্রিত করেছে। শহীদ মুজাহিদের সংখ্যা ১৯ এবং খ্রিস্টান মৃতের সংখ্যা ১১০০। জানাযা পড়ে শহীদদের দাফন করা হলো। তারপর সকল মুজাহিদ নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলো। আহত মুজাহিদদের সেবায় ব্যাপৃত হলো।

রাতে সবাই মিলে খাবার তৈরী করলেন এবং এশার নামায সেরে সকলে আহার করলেন। সে সময়ই জানা গেল, শত্রুদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা শুনে তারিক ও মুজাহিদরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু রাতের বেলায় কিছু করা সম্ভব নয়। তাই অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে ভোরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এগার

পলাতকগণ

খ্রিস্টানরা মুসলিম মুজাহিদদের মুকাবিলা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অনেকেই মারা গেল। যারা বেঁচে ছিল, তারা হতোদ্যম হয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে গেল। অথচ খ্রিস্টানরা ছিল অশ্বারোহী এবং মুসলিম মুজাহিদরা ছিলেন পদাতিক।

দু'চার জন ছাড়া মুসলমানদের কারো কাছেই বর্ম ছিল না। এমনকি অনেকের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্রও ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টানরা ছিল সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের বীরত্বের কাছে তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো। এমন কি পদাতিক মুজাহিদরা বহুদূর পর্যন্ত অশ্বারোহী খ্রিস্টানদের পিছু ধাওয়া করেছিল। এ জন্যে খ্রিস্টানদের মনে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা পিছনে তাকাবার সাহস করল না। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল মুসলমানরা অবশ্যই তাদের পিছু ধাওয়া করছে। ফলে তারা তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটালো এবং রাতের অর্ধভাগ পর্যন্ত এভাবে ছুটে চললো।

দীর্ঘপথ চলার ফলে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তাদমীরের সঙ্গী সৈন্যরাও শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা এক স্থানে নেমে পড়ল; কিন্তু সেখানে খাবার মত কিছু না পাওয়ায় ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই শুয়ে পড়ল।

ইসমাঈলও তাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আরব। তাই মাটিতে শোয়া তাঁর অভ্যাস ছিল, ফলে তাতে তাঁর কোন অসুবিধে হলো না; কিন্তু খ্রিস্টানরা নরম বিছানায় শুইতে অভ্যস্ত ছিল। তাই মাটিতে শুতে তাদের খুবই কষ্টানুভব হলো। সর্বাধিক কষ্টানুভব করলেন বিলকীস। শোয়ার ইচ্ছে তো তার ছিলই না; এমন কি তিনি বসতেও রাজী ছিলেন না। তাই তিনি বারবার এপাশ-ওপাশ করছিলেন। ইসমাঈল তার পাশেই ছিলেন। তিনি বিলকীসের অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন এবং তা দেখে নিজেও মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল, তিনি বিলকীসের জন্য কিছু করবেন; কিন্তু নিজে শৃঙ্খলিত। কিছু করতে পারছিলেন না।

চাঁদনী রাত। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় চতুর্দিক ঝলমল করছে. যেন প্রকৃতি এক অপরূপ রূপধারণ করেছে।

বিলকীসের উপরেও চাঁদের আলো পড়েছে। চাঁদ যেন তার আলোর সমস্ত উজ্জ্বলতা বিলকীসের চেহারায় ঢেলে দিয়েছে। ফলে তার চেহারা এত দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল যে, চোখ তুলে তার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না।

বিলকীস বারবার এপাশ-ওপাশ করছিলেন এবং কষ্ট লাঘবের জন্য কখনো কখনো দাঁত কামড়ে ধরছিলেন। তা দেখে ইসমাঈল আস্তে আস্তে বললেন,

আহা! তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

বিলকীস–না, তেমন কষ্ট তো হচ্ছে না। তবে........

ইসমাঈল–তবে, কিসের?

বিলকীস–আপনি কি আমার কষ্ট অনুভব করছেন?

ইসমাঈল–হাঁ, তা তো করছি।

বিলকীস মুচকি হাসলেন; বললেন, আপনি কি করে বুঝলেন?

ইসমাঈল–অত্যন্ত সহজভাবেই বললেন আমি নিজেই তো অত্যন্ত অস্থির।

বিলকীস–আপনার নাম কি?

ইসমাঈল–আমার নাম ইসমাঈল।

বিলকীস–আপনি তো একজন সামরিক অফিসার।

ইসমাঈল–হাঁ, আমার অধীনে পাঁচশ' সৈন্য রয়েছে।

বিলকীস–আমাকে মুক্ত করতে এসেছিলেন কেন?

ইসমাঈল–আমি কি জবাব দেব ?

বিলকিস–হয়ত হঠাৎ এসে পড়েছিলেন, তাই না?

ইসমাঈল–সম্ভবত তা সঠিক করে এখন বলা যাবে না।

বিলকীস–তাছাড়া আর কি হতে পারে?

ইসমাঈল–কোন অজ্ঞাত শক্তি হয়ত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

বিলকীস–সে অজ্ঞাত শক্তিটি কি হতে পারে?

ইসমাঈল–এতটুকু বলা যায় যে............

বিলকীস–আপনি থামলেন কেন ?

ইসমাঈল–আপনি যদি তা শুনে বিরক্তি বোধ করেন।

বিলকীস–আমার বিরক্ত হওয়ার কি আছে ?

ইসমাঈল–সত্যি কথা বলতে কি, তোমার প্রতি আমার এক অজানা আকর্ষণই আমাকে টেনে এনেছে।

বিলকীসের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আপনি না একজন মুসলমান ?

ইসমাঈল–হাঁ, আমি একজন মুসলমান।

বিলকীস–কিন্তু আমি যে একজন ইহুদী কন্যা।

ইসমাঈল–আমি তোমার পিতাকে দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। আচ্ছা তোমার নামটা কি?

বিলকীস–মুচকি হেসে বললেন, আমার নাম বিলকীস।

ইসমাঈল–সম্ভবত তুমি সুন্দরী বলে এরূপ নামা রাখা হয়েছে

বিলকীস–আপনার যা ইচ্ছা তাই ভাবতে পারেন।

ইসমাঈল–এ খ্রিস্টানরা বড়ই নির্মম।

বিলকীস–কেন ?

ইসমাঈল–ওরা তোমার আরামের কোন ব্যবস্থাই করল না।

বিলকীস–তাদের মধ্যে কোন মনুষ্যত্ব নেই।

ইসমাঈল–তুমি ঠিকই বলেছ। ওরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে বন্দী করেছে। অন্যথায় ওদের কাউকেই আমি জীবিত রাখতাম না।

বিলকীস–আপনার সাহসিকতা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে।

ইসমাঈল মায়াবী দৃষ্টিতে বিলকীসের দিকে তাকিয়ে বললেন। এটা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, আমি তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি।

একজন খ্রিস্টান সৈন্য রাগতঃ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা আলাপ বন্ধ করো। তোমরা নিজেরা তো ঘুমাচ্ছই না, আমাদেরকেও ঘুমাতে দিচ্ছ না।

তা শুনে ইসমাঈল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি শৃঙ্খলিত। সুতরাং নিশ্চুপ থাকা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না। তথাপি তিনি উচ্চারণ করলেন অসভ্য, বর্বর।

বিলকীস অনুরোধের সুরে তাঁকে বললেন, দয়া করে চুপ করুন। ওরা যা বর্বর চুপ না করলে হয়ত নতুন কোন বিবাদ বাধিয়ে দিতে পারে।

ইসমাঈল চুপ হয়ে পড়েন। বিলকীসও নীরব, নিশ্চুপ। ওরা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। এক সময় তাঁদের চোখ বন্ধ হয়ে এলো। উভয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে দেখেন, পূর্বগগনে সূর্য বেরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে অন্য সকল খ্রিস্টানও জেগে উঠে এবং নিজ নিজ কাজ সেরে আবার যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে।

ইসমাঈল অযু করে নামায পড়েন। তাদমীর এবং সকল খ্রিস্টান বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁর নামায দেখছিল। তাদমীর তার সঙ্গীদেরকে বললেন মনে হয় সে একজন আরব মুসলমান।

জনৈক খ্রিস্টান সৈন্য বললেন, তা-ইতো মনে হয় হুযুর।

তাদমীর–তাহলে তার সঙ্গীরাও বোধ হয় আরব মুসলমান।

জনৈক খ্রিস্টান–তা-ই বোঝা যায় হুযুর।

তাদমীর–তাহলে তো খুবই ভয়ের ব্যাপার। কারণ ওরা তো যে দেশই আক্রমণ করেছে, সে দেশই পরাভূত না করে ছাড়েনি।

অপর এক খ্রিস্টান বলল, মুসলমানরা তো বিনা কারণে কোন দেশ আক্রমণ করে না।

তাদমীর–তুমি ঠিক বলেছ। সম্ভবত ওরা কোন বিশেষ ঘটনা জানতে পেরেছে। আমি সম্রাট রডারিককে এ ব্যাপারে অবহিত করব।

অপর এক খ্রিস্টান–অবশ্যই অবহিত করতে হবে। যদি তাদের বাধা দেয়া না হয় এবং তারা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে তবে তাদেরকে বের করা খুবই কঠিন হবে।

তাদমীর–তা তো ঠিক; কিন্তু লিখব কি দিয়ে। এখানে তো কাগজ কলম কিছুই নেই।

জনৈক খ্রিস্টান–এখানে এমন অনেক তৃণলতা রয়েছে, যার রস কালির কাজে আসবে এবং কোন গাছের ডাল দিয়ে কলমের কাজ করা যাবে আর চামড়ার কোন টুকরার উপর লেখা যেতে পারে।

তাদমীর–তাহলে তোমরা এসব যোগাড় করো।

কয়েকজন খ্রিস্টান দ্রুত দৌড়ে গেল এবং এসব সাজসরঞ্জাম নিয়ে এলো। অতঃপর তাদমীর সম্রাট রডারিকের কাছে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি লেখা শেষ হলে তাদমীর বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল বন্দীকে রডারিকের দরবারে প্রেরণ করব; কিন্তু একজন করে কি পাঠাব। সম্রাট যদি আমাদের জন্য সৈন্য পাঠান, তাহলে সবাইকেই বন্দী করে নিয়ে যাব।

জনৈক খ্রিস্টান–তাই তো উচিত ছিল হুযুর।

তাদমীর একজন খ্রিস্টান অশ্বারোহীকে চিঠিখানা দিয়ে বললেন, তুমি দ্রুত যাবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সম্রাটের কাছে পৌঁছাবে। অশ্বারোহী এগিয়ে এসে চিঠিখানা হাতে নিলেন এবং দ্রুত যাত্রা করলেন। অশ্বারোহী চলে গেলে অন্যরাও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং সেডোনার দিকে যাত্রা করেন।

বার

সম্রাট রডারিক

তাদমীরের প্রেরিত দূত দ্রুত রাজধানী টলেডো যাচ্ছিল। টলেডোর সমস্ত পথ-ঘাট তাদের জানা ছিল। তাই বড় পথে না গিয়ে ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত পাহাড়ী পথ ধরে যেতে লাগল।

তাকে দ্রুত সম্রাট রডারিকের কাছে পৌঁছার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই পথিমধ্যে খুব সামান্য বিশ্রাম নিয়ে দিনরাত পথ চলে টলেডো পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছল এবং সেখান থেকে টেক্স নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে টলেডোর আকাশচুম্বী প্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল। টলেডোয় ছিল একটি প্রশস্ত দুর্গ। দীর্ঘ পর্বত চূড়া কেটে দুর্গটি নির্মাণ করা হয়েছিল। দুর্গের চারপাশ দিয়ে টেক্স নদী প্রবাহিত হতো। নদীর উপর উঁচু সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। সেতুটি খুবই মজবুত ও আকর্ষণীয় ছিল। স্পেনবাসীরা তাদের নির্মাণ কৌশল উজাড় করে সেতুটি নির্মাণ করেছিল।

তাদমীরের প্রেরিত দূত সেতু অতিক্রম করে দুর্গ প্রাচীরের নিকটে গিয়ে পৌঁছল। দুর্গের চারিপার্শ্বে ছিল চারটি বৃহৎ দ্বার, সামনে উন্মুক্ত বিরাট প্রান্তর। দ্বারগুলো ছিল খুবই উঁচু ও শিল্পমণ্ডিত এবং প্রত্যেকটিতে অনেক দ্বাররক্ষী নিয়োজিত ছিল। আগত দূত সে দ্বার অতিক্রম করে দুর্গের ভেতরে গিয়ে পৌঁছল।

দুর্গটির অভ্যন্তর ভাগও ছিল খুবই সুন্দর। ভেতরে আকাশচুম্বী অনেক সুন্দর ইমারত নির্মাণ করা হয়েছিল। সে দেখতে পেলো সব ক'টি গৃহই বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত। একজনকে জিজ্ঞেস করল, এসব সাজসজ্জা কেন?

তাকে জানানো হল আজ নববর্ষ। তাই রাজার নির্দেশে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। চতুর্দিকে আনন্দ ধ্বনি। কোথাও কোথাও নৃত্য উৎসব চলছিল। লোকেরা নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে হাসি-তামাশা করে ফিরছিল। দূত সরাসরি রাজদরবারে গিয়ে উপনীত হলো। সভাগৃহটিকেও অত্যন্ত সুন্দররূপে সাজানো হয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন নব সাজে সজ্জিত বধূ বরের আগমন অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছে।

তখন দরবার চলছিল। পারিষদবর্গের সকলেই নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। সম্রাট রডারিক রৌপ্য নির্মিত একটি উঁচু সিংহাসনে বসেছিলেন। পেছনে কয়েকজন সুন্দরী

রমণী দাঁড়িয়ে আনন্দ দিচ্ছে; কয়েকজন সুন্দরী নর্তকী সম্রাটের সামনে নেচে নেচে গান গাইছে। তারা ছিল যেমন সুন্দরী তেমনি অপরূপ সাজে সজ্জিত। নাচেও ছিল তারা অত্যন্ত পটু। তাদের উপস্থিতি গোটা পরিবেশকে মোহনীয় করে তুলেছিল।

সভাসদসহ সম্রাট অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নাচ দেখছিলেন। আগত দূত একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে নাচ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিল। সে ভাবছিল, সময় বুঝে তাদমীরের চিঠিখানা সম্রাটের সামনে পেশ করবে। কিন্তু নাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গান শুরু হয়ে গেল। আরম্ভ হলো হৃদয়স্পর্শী বাদ্যের সুর। গায়িকাদের সুরেলা কণ্ঠে সমস্ত সভাসদ মুগ্ধ হয়ে গেল। সম্রাট নিজেও তন্ময় হয়ে গেলেন। এক সময় গান শেষ হলো। সুন্দরী গায়িকারা দু'টো সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের পরনে ছিল নানা বর্ণের বাহারী পোশাক। সকলের দৃষ্টি তখন তাদের পোশাকের দিকে। দূত এক সময় সময় সুযোগ বুঝে সুন্দরীদের ভিতর দিয়ে সম্রাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সম্রাট অনেকটা বিরক্তির ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালেন এবং রাগতঃ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কে হে দুর্ভাগা ?

দূত কিছুটা ঘাবড়ে গেল। তার মনে ভয় হলো, সম্রাট যদি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে হত্যা করে। রডারিক ছিল অত্যন্ত বদমেজাজী। তাই সকলেই তাকে ভয় করতো। দূতটি তৎক্ষণাৎ প্রণাম জানিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উত্তর দিল, আমি দূত হুযুর।

রডারিক বিস্ময়ের স্বরে উচ্চারণ করলেন, দূত!

দূত–জী হাঁ।

রডারিক–কোথাকার দূত ?

দূত–তাদমীরের।

রডারিকের রাগ ধীরে ধীরে কমতে লাগল। তার চেহারায় কিছুটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, তাদমীর কি বিলকীসকে গ্রেফতার করতে পেরেছে ?

দূত–জী হাঁ হুযুর।

রডারিক–তুমি কি বিলকীসকে দেখেছ ?

দূত–দেখেছি হুযুর।

রডারিক–সে কি খুবই সুন্দরী ?

দূত–জী হাঁ, চতুর্দশী চাঁদের চেয়েও সুন্দরী হুযুর।

রডারিক–সে এখন কোথায় ?

দূত–তাদমীরের হেফাযতে রয়েছে হুযুর।

রডারিক কিছুটা রেগে গেলেন। বললেন, তাদমীর এমন নির্বোধের ন্যায় কাজ করল কেন ?

দূত সম্রাটের কথার কোন মর্ম বুঝতে পারলো না। সে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রডারিক আরো রেগে গেলেন। অনেকটা ধমকের সুরে বললেন, আরে নির্বোধ, তাদমীর বিলকীসকে নিজের কাছে ধরে রাখল কেন ?

দূত–তাকে পাঠানোর সুযোগ হলো না হুযুর।

রডারিক–কেন ?

দূত–হঠাৎ কোত্থেকে যেন বিস্ময়কর কিছু লোক এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

রডারিক–তোদের সঙ্গে তাদের কোথায় দেখা হলো ?

দূত–যেখানে প্রধান সেনাপতির সৈন্য অবস্থান করছিল।

রডারিক–তারা এসে কি বল্‌ল ?

দূত–তারা এসেই যুদ্ধ শুরু করে দিল।

রডারিক অনেকটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, যুদ্ধ ?

দূত–জী হাঁ। অতঃপর দূত একের পর এক সব ঘটনা সম্রাটকে জানালো এবং সকলেই অবাক হয়ে তার কথা শুনলো।

রডারিক জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কে এবং কোত্থেকে এসেছে ?

দূত–হুযুর তা কেউ বলতে পারে না। তাদের পরনে ছিল লম্বা জুব্বা, মুখে ছিল লম্বা দাঁড়ি, উজ্জ্বল চেহারা। তাদেরকে দেখে ফেরেশতার মত মনে হচ্ছিল; কিন্তু ওরা জ্বীনের ন্যায় যুদ্ধ করছিল।

রডারিক–এ সব তো ভারী বিস্ময়ের ব্যাপার!

দূত এগিয়ে গিয়ে তাদমীরের চিঠিখানা রডারিকের হাতে দিল। রডারিক চিঠিটি উযীরের হাতে দিলেন। উযীর চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন। চিঠিটির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ

মহামান্য সম্রাট,

এক আশ্চর্যজনক জাতি আমাদের স্পেনের উপর আক্রমণ করেছে। তাদের পরনে রয়েছে আদিম পোশাক। আমার জীবনে আমি আর কখনো এরূপ পোশাক দেখিনি। পায়ের গাঁট পর্যন্ত লম্বা জুব্বা। চওড়া হাতা। লম্বা কাপড় দিয়ে তাদের শির বাঁধা (পাগড়ীকে বোঝান হয়েছে) এর উপরে লম্বা রুমাল ঢাকা রয়েছে, যা কান বরাবর এসে লটকে পড়েছে। তাদের চেহারা উজ্জ্বল ধবধবে, মুখে লম্বা দাড়ি। কিন্তু যখন আক্রমণ চালায় তখন রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় মনে হয়। তারা এমন তীব্র আক্রমণ চালায় যে, কেউই তাদের সামনে টিকতে পারে না।

তারা মাটির নীচ থেকে উঠে এসেছে, না আকাশ থেকে নেমে এসেছে আমরা তা বুঝতেই পারছি না। আমরা যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি এবং যারপরনাই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি; কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হয়েছে। মনে হয় মৃত্যু কি জিনিস ওরা তা জানেই না, বরং তারা শুধু মারতেই এগিয়ে আসে। তারা পিছপা হতেও জানে না; বরং মরিয়া হয়ে সামনে এগিয়ে আসে। তাদের মুকাবিলা করা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাদেরকে যদি প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে সমস্ত স্পেনকে ওরা ধ্বংস করে ফেলবে।

দেশের এই দুর্যোগকে রোধ করার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার নিজের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। তা না হলে দেশ ও জাতি এক চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাদের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছি এবং বিলকীস আমার হেফাযতেই রয়েছে।

ইতি
আপনার একান্ত বাধ্যগত
সেনাপতি
তাদমীর।

চিঠিখানা পড়ে রডারিক ও সভাসদ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা কিছুই বুঝতে পারলেন না, কি হতে যাচ্ছে। তারা চোখ তুলে দেখতে পেলেন যে, দু'জন বৃদ্ধ পাদরীর ন্যায় পোশাক পরে রূপার যষ্টি হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। রাজা ও সভাসদ সকলেই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তের

দুই বৃদ্ধ রক্ষী

উভয় বৃদ্ধের মুখে ছিল পাকা দাড়ি। উভয়ের পরনে সাদা জুব্বা। কোমরে ছিলো কোমর বন্ধনী। কোমর বন্ধনীর অগ্রভাগ হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। কোমরবন্ধনীর উপরে দ্বাদশ মণ্ডলের বৃত্ত অংকিত ছিল। কোমরে চাবির অনেক গোছা লটকানো ছিল। এগুলোতে বহু চাবি ঝুলানো ছিল। উভয়ের গড়ন ছিল লম্বা আকৃতির। রূপার যষ্টির উপর ভর করে তারা হাঁটছিলেন। তাদেরকে দেখে রাজা নিজেও বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

উভয় বৃদ্ধই সরাসরি রাজার আসনের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। তারা অবনত মস্তকে রাজাকে প্রণাম জানালো। তারপর রাজার গুণকীর্তন করলো। রাজা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা ?

এক বৃদ্ধ উত্তর দিল–আমরা যাদুঘর নামে পরিচিত গম্বুজের রক্ষক।

এটা সবার জানা ছিল যে, টলেডোর পাহাড়ের উপর একটি গম্বুজ রয়েছে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস এই গম্বুজটি নির্মাণ করেন। অনেক বছর যাবত গম্বুজটি তালাবদ্ধ রয়েছে। হিরাক্লিয়াস সমুদ্রের তীরে একটি মিনার নির্মাণ করেছিলেন এবং তার নামানুসারে মিনারটির নামকরণ করা হয়েছিল হিরাক্লিয়াসের মিনার। এই মিনারটি আজো বিদ্যমান। এটি নির্মাণের সময় নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় একটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছিল। এই গম্বুজটিই যাদুঘর নামে খ্যাত। নির্মাণের সময় থেকেই এটি বন্ধ ছিল। এর ভেতরে কি রয়েছে, কারোরই জানা ছিল না। রডারিক বিস্ময়ের সাথে বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্বিতীয়বার তোমাদের আসার কি কারণ ?

এক বৃদ্ধ বলল, স্পেনে রীতি রয়েছে যে, যিনিই স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করবেন, তিনি নববর্ষের দিনে নিজের নামাঙ্কিত তালা গম্বুজের ফটকে আটকে রাখবেন।

রডারিক তাদের কথায় ছেদ টেনে বললেন, তোমরা কি শুধু এজন্যই আমার কাছে এসেছ যে, আমার নামাঙ্কিত তালা গম্বুজের ফটকে ঝুলাবো?

এক বৃদ্ধ–জী হাঁ।

রডারিক–এতে কি উপকার হবে?

অপর বৃদ্ধ—এতে প্রয়াত রাজাদের উপদেশ পূর্ণ হবে।

রডারিক—এর ভেতরে কি রয়েছে, তা কি তোমরা জান?

প্রথম বৃদ্ধ—জী না হুযুর। গম্বুজটি নির্মাণের পর থেকেই এটি বন্ধ রয়েছে। ফলে এর ভেতর কি রয়েছে তা আমাদের জানার কথা নয়।

রডারিক—তোমরা কতদিন থেকে তা দেখাশোনা করছ?

২য় বৃদ্ধ—আমরা দু'ভাই হুযুর। আমাদের পূর্বপুরুষরাও এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আমাদের বুঝ-জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এর দেখাশোনা করে আসছি।

রডারিক—তোমরা কিভাবে এর সংরক্ষণ করো।

১ম ব্যক্তি—আমরা বহিরঙের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি।

রডারিক—ভেতরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা?

১ম ব্যক্তি—কেউ করে না।

রডারিক—কেন?

২য় ব্যক্তি—তা খোলার হুকুম নেই হুযুর।

রডারিক—কার হুকুম নেই।

২য় ব্যক্তি—গম্বুজটির প্রতিষ্ঠাতার।

রডারিক—সম্রাট হিরাক্লিয়াসের?

১ম বৃদ্ধ—জী হাঁ।

রডারিক—কেন নেই।

২য় ব্যক্তি—কারণ এ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে যে, গম্বুজটি খোলা হলে দেশে বিপর্যয় নেমে আসবে।

রডারিক—আরো কিছু?

২য় বৃদ্ধ—যে রাজা তা খুলবে সে মারা যাবে।

রডারিক—অদ্ভুত ভবিষ্যৎ বাণী তো।

১ম বৃদ্ধ—জী হাঁ।

রডারিক—কোন রাজা কি তা খোলার সাহস করেছে?

২য় বৃদ্ধ—কয়েকজন রাজা তা করেছিলো।

রডারিক—তারপর কি হয়েছে?

২য় বৃদ্ধ—হয়ত তাদের মৃত্যু হয়েছে নতুবা কোন বিপদে পড়েছেন।

রডারিক—তোমাদের সামনেও কি কোন রাজা তা খোলার চেষ্টা করেছিল?

২য় বৃদ্ধ—জী না হুযুর, আমরা কাউকে দেখিনি।

রডারিক—তোমরা জান না এর ভেতর কি রয়েছে?

১ম বৃদ্ধ—শুধু আমরা কেন হুযুর; হয়ত বর্তমান বিশ্বের কেউই তা জানে না।

রডারিক–তোমাদের কি ধারণা?

২য় বৃদ্ধ–আমরা কখনো এ ব্যাপারে চিন্তাই করিনি।

রডারিক–আমি কি আমার ধারণার কথা বলবো?

১ম বৃদ্ধ–বলুন হুযুর।

রডারিক–এর ভেতর অনেক মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।

২য় বৃদ্ধ–তাহলে সেসব সংরক্ষণের জন্য এরূপ ভবিষ্যৎ বাণীর কি প্রয়োজন ছিল?

রডারিক–সম্ভবত ধারণা করা হয়েছিল, তাহলে কোন রাজা তা খুলতে আর সাহস করবে না।

১ম বৃদ্ধ–সম্পদ লুকিয়ে রাখার কি মানে আছে হুযুর?

রডারিক–সম্পদ গোপনকারীরা হয়ত ভেবেছিল, তারা নিজে এ সম্পদ ভোগ করতে পারেনি। সুতরাং আর কেউ যেন তা ভোগ করতে না পারে। সেজন্যই তারা এরূপ ভীতিকর ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছে।

২য় বৃদ্ধ–কিন্তু এ গম্বুজটি তো সম্রাট হিরাক্লিয়াস নির্মাণ করেছিলেন।

রডারিক–হাঁ, তিনিই হয়ত এরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।

১ম বৃদ্ধ–যাই হোক হুযুর। আপনিও আপনার নামাঙ্কিত তালাটা লাগিয়ে দিন।

রডারিক–আমিও কি সেই নির্বোধদের ন্যায় ফটকে তালা আটকে দেব? না, তা কখনওই দেব না। আমি গম্বুজটি খুলবো।

উভয় বৃদ্ধই ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে গেলো। সভাসদরা রাজার কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, আপনি কি গম্বুজটি খুলবেন হুযুর?

রডারিক–দৃঢ়ভাবে বললেন, নিশ্চয়ই খুলব।

প্রধানমন্ত্রী–কিন্তু হুযুর......

রডারিক–কিন্তু কি?

প্রধানমন্ত্রী–প্রাচীন কাহিনীতে রয়েছে, এ গম্বুজের রহস্য কেউই জানতে পারবে না। তবে এক ব্যক্তি তা জানতে পারবে। সে হবে বংশের সর্বশেষ রাজা। তার পক্ষেও তখনই জানা সম্ভব হবে যখন সে সিংহাসনচ্যুত হবে।

রডারিক–হাঁ, এসব লেখা না থাকলে হয়ত এতদিনে কোন না কোন রাজা তা বের করে নিয়ে যেতো।

প্রধানমন্ত্রী–তাতে যে কোন সম্পদই নেই হুযুর।

রডারিক–আপনি কি দেখেছেন?

প্রধানমন্ত্রী–দেখিনি, তবে পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি।

রডারিক রেগে গেলেন। তিনি বললেন, পূর্বপুরুষরা নির্বোধ ছিল। একজন সামরিক কর্মকর্তা বললেন,–মহামান্য রাজা, এ সম্পর্কে আরো একটি ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে।

রডারিক–সে কি?

সামরিক কর্মকর্তা–যেদিন গম্বুজটি খোলা হবে, সেদিনই দেশে গযব নেমে আসবে।

রডারিক–হেসে বললেন, ভবিষ্যৎ বাণী শুধু ভয় দেখানোর জন্য। আমি ভয় করি না। আমি গম্বুজটি খুলবোই এর ভেতর কি আছে আমি তা দেখবো। একজন পাদ্রী বললেন, আমার তো মনে হয় মহামান্য রাজার সে ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত। যদি তাতে কোন সম্পদ থেকেও থাকে, তবে এখন তো আপনার কোন অর্থ-কড়ির প্রয়োজন নেই। বরং ভবিষ্যতের কোন জরুরী প্রয়োজনের জন্য তা রেখে দেয়া উচিত।

রডারিক–আমি মুখে যা বলি, তা না করে ছাড়ি না। অতএব আমাকে বারণ করা বাতুলতা মাত্র।

পাদ্রী–আপনার ইচ্ছা হুযুর।

রডারিক–বৃদ্ধদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ফিরে যাও এবং চাবিগুলো পরিষ্কার করে রেখো। আমি আগমী কাল গম্বুজে গিয়ে তা খুলব।

বৃদ্ধদ্বয় অবনত মস্তকে রাজাকে প্রণাম জানালেন। রডারিক সামরিক কর্মকর্তাকে বললেন, এখন কি পরিমাণ সৈন্য প্রেরণ করা যেতে পারে?

সামরিক কর্মকর্তা–আনুমানিক এক লাখ হুযুর।

রডারিক–তুমি সকলকে আমার নির্দেশ জানিয়ে দাও। তারা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

সামরিক কর্মকর্তা–আচ্ছা হুযুর।

অতঃপর রাজা উঠে দাঁড়ালেন। অন্য সভাসদরাও উঠে দাঁড়ালো এবং অবনত মস্তকে রাজাকে অভিবাদন জানালো। উপস্থিত নর্তকারীও বুকে হাত রেখে রাজাকে প্রণাম জানাল।

রাজা একবার সকলের দিকে তাকালেন। এরপর সিংহাসন থেকে নেমে দরবারগৃহ ত্যাগ করেন। তার পশ্চাতে দাঁড়ানো সুন্দরী যুবতীরা রাজার চৌগাটিকে ধারণ করে রাজার পেছনে পেছনে চলে গেল। রাজার প্রস্থানের পর অন্য সভাসদরাও দরবারগৃহ ছেড়ে চলে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরবারগৃহটি খালি হয়ে গেল।

চৌদ্দ

ভয়

রডারিক দরবার থেকে বেরিয়ে সরাসরি হেরেমে চলে গেলেন। বৃদ্ধদের আগমন, তাদের কথা ও গম্বুজ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণী শুনে রডারিক কিছুটা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী মানুষ। এই জেদের বশবর্তী হয়েই দরবারে তিনি গম্বুজটি খোলার দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করেছিলেন; কিন্তু এখন তার মনে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। খোলার সিদ্ধান্ত পরিহার করলেও এখন তার জন্য বিপদ। কারণ জনসাধারণ তাকে কাপুরুষ ভাববে।

প্রাসাদে পৌঁছে তিনি তার রাজকীয় পোশাক বদলে ফেলেন এবং আহার গ্রহণ করে বিছানায় গা এলিয়ে দেন; পরক্ষণেই তার মনে আবার গম্বুজের চিন্তা উদয় হলো। তার মনে অজানা ভয়ের সঞ্চার হলো। এ অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে বলতে লাগল গম্বুজটি খোলা হলে তা তোমার জন্য অমঙ্গলের কারণ হবে।

দূতের দেয়া সংবাদ ও তাদমীরের চিঠির বিষয়েও তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। যদিও আগমনকারীদের পরিচয় সম্পর্কে তার কিছুই জানা ছিল না, তথাপি তার মনে এক অজানা আশংকা পীড়া দিচ্ছিল। না জানি তারা কে এবং কোত্থেকে এসেছে। কে সেই জাতি যারা বিনা কারণেই হামলা চালিয়েছে।

এ চিন্তা তাকে এতই অস্থির করে তুলেছিল যে, কয়েক ঘন্টা তার এ ভাবেই কেটে গেল। তিনি যতই ভাবছিলেন, তার অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিকতার কথাও ভুলে যান। পরিচারিকারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর এ তন্ময়তা দেখে উৎসুক হয়ে কাশির শব্দ করে। তাদের এ শব্দে রাজা তাঁর সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে ছিলে?

জনৈক তরুণী–হাঁ আমরা এখানেই ছিলাম।

রডারিক–কখন থেকে?

তরুণী–অনেকক্ষণ থেকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি কি যেন চিন্তা করছিলেন।

রডারিক–হাঁ, আমি আজ কিছুটা চিন্তায় আছি।

জনৈক মুখরা তরুণী মুচকি হেসে বলল.

আপনি কি ফ্লোরিন্ডার কথা ভাবছেন হুযুর?

পাঠকদের হয়ত মনে আছে, সম্রাট রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানের যুবতী কন্যা ফ্লোরিন্ডার সতীত্ব হরণ করেছিল, যাকে তার পিতা জুলিয়ান তার মাতার অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

রডারিক নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসলেন। তিনি বললেন, তোমরা তো ভাল কথাই মনে করেছ। পিতা যে তাকে নিয়ে গেল আর তো নিয়ে এলো না। না জানি তার মা কেমন আছে।

তরুণী–আমি তো শুনেছি পুরো ব্যাপারটাই নাকি একটি অজুহাত।

রডারিক বিস্ময়ের স্বরে বললেন, অজুহাত! তুমি কি করে জানলে?

তরুণী–ফ্লোরিন্ডা তার ধাত্রী রাহীলের কাছে তা বলেছিল।

রডারিক–রাহীল কে?

তরুণী–সে তরুণী আজ ক'দিন থেকে নিখোঁজ।

রডারিক–রাহীল এ কথা কার কাছে বলেছিল?

তরুণী–নিখোঁজ হওয়ার দিন রাহীল আমাকে কথাটি বলেছিল। আমি ভেবেছিলাম যে রাহীলকে পাওয়া গেলে তাকে আপনার কাছে হাযির করে কথাটি বলব; কিন্তু সেই যে নিখোঁজ হলো আর পাওয়া গেল না। তাই আমি নিজেই কথাটি হুযুরকে জানালাম।

রডারিক–কিন্তু সে এ অজুহাত দেখাল কেন?

তরুণী–রাহীল বলেছে যে, ফ্লোরিন্ডা তার সব ঘটনা পিতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। সে প্রেক্ষিতে একটি অজুহাত দেখিয়ে তার পিতা তাকে নিয়ে যায়।

রডারিক তা শুনে কিছুটা বিস্মিত হলেন। তিনি কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন, এমনি মুহূর্তে একজন পরিচারিকা এসে গৃহে প্রবেশ করলো এবং প্রণাম জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। রডারিক তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি চাই?

পরিচারিকাটি একটি চিঠি বের করে বলল, প্রাসাদ রক্ষীদের কমাণ্ডার এ চিঠিখানা আমার কাছে দিয়েছে হুযুর।

চিঠিটি রাজার হাতে রাখা হলো। রাজা চিঠিটি খুলেই নিচে জুলিয়ানের নাম দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তোমাদের সকল ধারণা মিথ্যা। দেখ, জুলিয়ান চিঠি লিখেছে। হয়ত ফ্লোরিন্ডার মা এখনো ভাল হয়ে উঠেনি। তাই চিঠি দিয়েছে।

একথা বলেই রডারিক চিঠিখানা পড়তে লাগলেন।

পাপিষ্ঠ রাজা রডারিক,

তুমি আমার কন্যার সতীত্ব নষ্ট করে গথ রাজবংশকে অপমানিত করেছ। জেনে রাখ আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবো না। যতদিন পর্যন্ত তোমার রাজপ্রাসাদ ধূলিসাৎ না হবে এবং তুমি সিংহাসনচ্যুত না হও ততদিন আমি নিশ্চিন্ত হবো না। ফ্লোরিন্ডাকে নিয়ে আসার সময় তুমি আমার সঙ্গে পথ চলতে চলতে তোমার জন্য বিশেষ শিকারী বাজপাখী পাঠানোর অনুরোধ করেছিলে।[১] এখন আমি এমন এক ধরনের বাজপাখী নিয়ে এসেছি–যারা তোমার প্রজা ও রাজত্ব একসঙ্গে খেয়ে ফেলবে।

বলব কি, সে শিকারী বাজপাখী কারা? তারা হচ্ছে মুসলিম মুজাহিদ। তাঁরা এমন এক জাতি, যাঁরা যেখানেই পদার্পণ করেছে সেখানেই তাঁদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছে। তাঁরা এখন তোমার খুব কাছাকছি এসে পড়েছে, এমন কি তাদমীরকে পরাজিত ও পলায়নে বাধ্য করেছে। অপেক্ষা কর, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অত্যাসন্ন।

ইতি
কাউন্ট জুলিয়ান

রডারিক চিঠিটি পড়ছিলেন আর রাগে তার চেহারা রক্তিম হয়ে উঠছিল। পড়া শেষ করে চিঠির বাহক পরিচারিকাকে প্রাসাদ রক্ষীদলের অধিনায়ককে ডেকে আনার নির্দেশ দেন।

তরুণীটি চলে গেলে সম্রাট রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। সম্রাটের এ অবস্থা দেখে সকল পরিচারিকা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নীরব, নিথর। কিছুক্ষণ পর সামরিক পোশাকধারী এক জওয়ান এসে উপস্থিত হলো। সে নতজানু হয়ে রাজাকে অভিবাদন জানালো। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন এ পত্রখানা কার, তুমি কি তা জান?

কমান্ডার–জী না হুযুর।

রডারিক–কে নিয়ে এসেছিল?

কমান্ডার–একজন অশ্বারোহী দূত।

রডারিক–কতক্ষণ আগে চিঠিখানা দিয়ে গেছে?

কমান্ডার–তা অনেক আগে।

রডারিক–তুমি তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা পৌঁছালে না কেন?

কমান্ডার–আমাকে জানানো হয়েছিল যে, আপনি বিশ্রামে রয়েছেন।

---

১. সম্রাট রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানদের কাছে এক ধরনের শিকারী বাজপাখী পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন (তারীখে আন্দালুস)–লেখক।

রডারিক–দূত আর কিছু বলেনি?

কমান্ডার–কিছু বলেনি হুযুর। চিঠিখানা দিয়েই চলে গেছে।

রডারিক–শয়তানটা বেঁচে গেল ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।

কমান্ডার চলে গেল রডারিক এবার নতুন সমস্যায় পড়লেন। চিন্তায় তার মাথা ঘুরতে লাগল। এমন সময় কয়েকজন পরিচারিকা এসে ভেতরে ঢুকল। রডারিক তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই?

তারা জানাল যে, রানী আসছেন।

রানীর আগমন বার্তা শুনে রাজা আরো ঘাবড়ে গেলো। রানী যাতে চিঠিখানা দেখতে না পায়, সেজন্য অস্থিরভাবে তা খুঁজতে লাগলেন; কিন্তু চিঠিটি তখন আর খুঁজে পেলো না।

ইতিমধ্যে রানী এসে গেলেন। রাজা দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানান। রানী ছিলেন যুবতী। বয়স বড়জোর বিশ কি বাইশ। খুবই সুন্দরী ছিলেন। গোলগাল চেহারা, প্রশস্ত ললাট, ডাগর কালো চোখ, উঁচু নাক, আপেলের মত গণ্ডদেশ, যেন সৌন্দর্যের প্রতিমা। পরনে দামী রেশমী পোশাক; শরীরে হীরা মুক্তোর অলংকার আর মোতির হার তাকে আরো সুন্দর করে তুলেছিল। রানীর নাম ছিল নাঈলা। সারা দেশে তার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। রানী মুচকি হাসছিলেন। তিনি একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। রাজাকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনেছি আপনি নাকি বিস্ময়কর গম্বুজটি খুলতে যাচ্ছেন।

রডারিক–হাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ।

নাঈলা–কিন্তু সেটি না খুললে কি হয় না?

রডারিক–আমি এ জন্যই সেটি খুলতে চাই যে, গম্বুজটি সম্পর্কে অনেক কাহিনী ও ভীতি রয়েছে।

নাঈলা–গম্বুজটি সম্পর্কে যে অনেক ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে।

রডারিক–সেগুলো এ জন্যেই যে, যাতে কেউ তা খুলতে সাহসী না হয় এবং এতে লুক্কায়িত সম্পদ আহরণ করতে না পারে।

নাঈলা–তবে কি এতে সম্পদ রয়েছে?

রডারিক–নিশ্চয়ই, এর ভেতরে সম্পদ রয়েছে।

নাঈলা–আমার তো ধারণা যে, এটা কল্পনা মাত্র।

রডারিক–তুমি দেখে নিও, নিশ্চয়ই এতে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।

নাঈলা–আমার মন বলছে যে, গম্বুজটি না খুললেই হয়ত ভাল হবে।

রডারিক–হাঁ, আমি তোমার কথাই মেনে নিতাম; কিন্তু যেহেতু দরবারে ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে এবং সবাই তা জেনে ফেলেছে, এমতাবস্থায় খোলা না হলে মানুষে হয়ত আমাকে কাপুরুষ মনে করবে। আর তা তোমারও কাম্য নয়।

নাঈলা–ঠিক আছে, তুমি যা ভাল মনে কর, তাই করো।

এই বলে তিনি বিছানার দিকে তাকান। কাউন্ট জুলিয়ানের চিঠিটি বালিশের কাছে পড়ে ছিল। রডারিক যেটা খুঁজে পেলেন না। নাঈলা সে দিকে তাকিয়ে রহস্যের ভঙ্গিতে বললেন, এ চিঠিটি কার।

তা শোনা মাত্রই রডারিকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চিঠিখানা হাতে নিতে উদ্যত হন।

ইতিমধ্যে নাঈলা চিঠিটি নিজ হাতে নিয়ে ফেলেছেন। তাতে রডারিক আরো ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বললেন, চিঠিটি আমায় দিয়ে দাও। এটি তোমার দেখার মত নয়।

নাঈলা এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন, আমি অবশ্য চিঠিখানা দেখব।

রডারিকের চেহারা লজ্জা ও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি একদৃষ্টিতে নাঈলার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পনের

সামরিক চুক্তি

নাঈলা চিঠিটি খুলে ফেলেন; কিন্তু এখনো পড়েননি। রডারিক অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে বললেন, প্রেয়সী আমার, তুমি পত্রটি পড়ো না। কিন্তু মানুষের স্বভাব হলো, যা নিষেধ করা হয় তার প্রতিই অধিক আগ্রহ জন্মে। রডারিক নাঈলাকে পত্রটি পড়তে যতই নিষেধ করছিলেন, নাঈলার আগ্রহ ততই বেড়ে যাচ্ছিল। নাঈলা শুনেছিলেন যে, রডারিক একজন দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি; কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি এর কোন প্রমাণ পাননি। পত্রটিকে ঘিরে তার মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হলো।

রডারিক নাঈলাকে এ জন্য ভয় করতেন যে, স্পেনের পাদ্রীদল সে সময় নাঈলার খুবই অনুগত ছিল। সে যুগে স্পেনে পাদ্রীদের বহুল তৎপরতা ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে তাদের বিপুল প্রভাব ছিল। এমন কি শাসকদের উত্থান-পতনে পাদ্রীদলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাই রাজার আইন-কানুন পাদ্রীদের রীতি-নীতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারতো না।

রডারিকের আগে স্পেনের রাজা ছিলেন গথ বংশোদ্ভূত ডনরা। এই গথিকরা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাতি। তারা রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল। মূলত তারা ছিল এশিয়ান। গথিকরা দু'টি শাখায় বিভক্ত ছিল। একটি প্রাচ্য গথরূপে পরিচিত ছিল। তারা স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ডনরা ছিলেন পাশ্চাত্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।

রাজা ডনরা ছিলেন একজন অতিশয় দয়ালু ব্যক্তি। তিনি সকল প্রজাকে সমান চোখে দেখতেন। তার কাছে ইহুদী-খ্রিস্টানে কোন পার্থক্য ছিল না; কিন্তু পাদ্রীদের কাছে তা পছন্দ হতো না। তারা ইহুদীদের অত্যন্ত হীন চোখে দেখতো এবং তার উপর নানা প্রকার অসম্মান–অবিচার চালাতো। এই নিয়ে পাদ্রীদের সঙ্গে ডনরা'র বিবাদ বাধে এবং পাদ্রীরা ডনরাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। পাদ্রীরা অভিযোগ তুলে যে, রাজা ডনরা ইহুদীদের পক্ষপাতপুষ্ট। অতএব স্পেনের শাসনক্ষমতায় তার অধিষ্ঠিত থাকার কোন অধিকার নেই। এই বলে তারা ডনরাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাদের সহায়তায় রডারিক দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেন। এ ব্যাপারে পাদ্রীদেরকে

সংঘটিত ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রডারিকের স্ত্রী নাঈলা। তাই নাঈলা ছিলেন পাদ্রীদের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। এ কারণে রডারিকের মনে ভয় ছিল নাঈলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে পাদ্রীদের সহায়তায় তিনি যে কোন সময় রডারিককে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন।

রডারিকের নিষেধের উত্তরে নাঈলা রাগতঃ কণ্ঠে বললেন, পড়ব, আমি নিশ্চয়ই পড়ব।

রডারিক–কিন্তু তাতে তুমি যে কষ্ট পাবে।

নাঈলা–তা তো আমি জানি।

রডারিক–তাহলে জেনে-শুনে দুঃখ বাড়ানো কি ঠিক হবে?

নাঈলা–কিন্তু আমি বাধ্য।

রডারিক–এতে তোমার বাধ্য হওয়ার কি আছে?

নাঈলা–আচ্ছা বল তো চিঠিটি কার?

রডারিক–কাউন্ট জুলিয়ান লিখেছে।

নাঈলা–কি লিখেছে?

রডারিক–তা যদি বলা যেতো তবে তোমাকে তা পড়তে নিষেধ করতাম না।

নাঈলা–শোন, ফ্লোরিন্ডা যখন থেকে প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে তখন থেকেই আমি অত্যন্ত অস্থিরতায় কাটাচ্ছি।

রডারিক–কারণ তাকে ভুলতে পারছ না। তাই খারাপ লাগছে।

নাঈলা–সে সুন্দরী সাধ্বী, তাকে ভুলার নয়। তবে আমার অস্থিরতা, অন্য কারণে।

রডারিক–কী সে কারণ?

নাঈলা–আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি তার চরিত্র হননের চেষ্টা করেছিলে। তাই সে এখান থেকে চলে গেছে।

রডারিক কি বলবে ভেবে পাচ্ছেন না। তার অপকর্মের প্রমাণ তখন নাঈলার হাতে। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে চিঠিটি পড়ে নাঈলা আসল ঘটনা জেনে ফেলবে। আর সত্য কথাও নিজ মুখ দিয়ে বলতে পারছেন না।

নাঈলা বললেন–চুপ করে রইলে যে। আমার সন্দেহ কি মিথ্যে?

রডারিক–সেসব কথা এখন থাক। চিঠিটি যদি আমাকে দিয়ে দাও। তবে আমি অঙ্গীকার করছি, বিস্ময়কর গম্বুজটি আমি আর খুলবো না।

নাঈলা হেসে ফেললেন, বললেন, গম্বুজটি খোলা হলে আমার ক্ষতি কিসের। আর না খুললেই বা আমার কি লাভ?

রডারিক–চিঠিটি পড়লেও তোমার কোন লাভ হবে না।

নাঈলা–চিঠিটি পড়তে যেভাবে নিষেধ করা হচ্ছে, তাতে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যাচ্ছে। চিঠিটি সম্পর্কে প্রথম আমি যখন জানতে চেয়েছিলাম তখন খোলাখুলি উত্তর দিয়ে ফেললে হয়ত আমি পড়ার কথা চিন্তাও করতাম না।

রডারিক–আমারই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা কর।

নাঈলা–তাহলে ভুলের মাশুলের জন্য অপেক্ষা কর।

এ কথা বলেই নাঈলা চিঠিটি পাঠ করতে লাগলেন। রডারিক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি আবার বললেন, বেগম সাহেবা, চিঠিটি তুমি পড়ো না।

নাঈলা রাগতঃ স্বরে বললেন, তুমি চুপ কর। আমি যা সংকল্প করেছি তা করবই। রডারিক আর কিছু বলতে সাহস করেননি। তিনি নাঈলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নাঈলা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে চিঠিটি পড়ছিলেন

নাঈলা চিঠিটি যতই পড়ছিলেন, তার চেহারা ক্রমে ততই রক্তবর্ণ ধারণ করছিল। তার চোখ থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছিল। অপর দিকে রডারিকের চেহারা লজ্জা ও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর নাঈলার চিঠি পাঠ সমাপ্ত হলো।

নাঈলা তার রাগ অনেকটা সংবরণ করে পরিচারিকাদেরকে কক্ষ ত্যাগ করে যেতে ইঙ্গিত করেন। তারা অবনত মস্তকে সেখান থেকে চলে গেল। এখন সে কক্ষে কেবল নাঈলা আর রডারিক। নাঈলা কর্কশ সুরে রডারিককে বললেন, তোমার অপকর্মের প্রমাণের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয়?

রডারিক সাহস হারালেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাকে অবশ্যই এক কঠিন সত্যের মুকাবিলা করতে হবে। তিনি চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে বললেন, এ জন্যই তো চিঠিটি পড়তে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। কারণ জুলিয়ান এতই চতুর লোক যে, আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছে। এটা নিছক ষড়যন্ত্র মাত্র।

নাঈলা–তাতে কি তার সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে না?

রডারিক–তা তো নিশ্চয়ই, তবে জুলিয়ান সুনামের চাইতে স্বার্থটাকেই বড় করে দেখেছে।

নাঈলা–তাতে তার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

রডারিক–তুমি কি ভুলে গেছ যে, পদচ্যুত রাজা ডন্‌রা জুলিয়ানের শ্বশুর। সে ষড়যন্ত্র করে আবার ডন্‌রাকে ক্ষমতাসীন করতে চাচ্ছে। অবশ্য তার চালটা এতই গভীর যে, তাকে বুঝতে হলে একটু ভাবতে হবে।

নাঈলা–কিন্তু কিছু একটা না হলে নিজ মেয়ের নামে কেউই এমন বলতে পারে না।

রডারিক–শত্রুতাই যার উদ্দেশ্য, তার কাছে অন্য সব কিছুই গৌণ।

নাঈলা কিছুটা দমে গেলেন। রডারিক বুঝতে পারলেন, তার চালাকিটা হয়ত অনেকটা কাজে এসেছে। রডারিক আবার অনুনয়ের সুরে বললেন, আমায় বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, আমি সত্য কথা বলছি। এ জন্যেই আমি চিঠিটি পড়তে বারণ

করেছিলাম। কারণ আমার মনে ভয় হচ্ছিল, তুমি হয়ত জুলিয়ানের চালটি নাও বুঝতে পার। আর মেয়েরা তো স্বভাবতই সন্দেহপ্রবণ।

নাঈলা–আমি ফ্লোরিন্ডাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

রডারিক–ঠিক আছে। তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করো। এটা অবশ্য ভাবনার বিষয় যে, যদি এমন কিছু হয়েই থাকতো তবে ফ্লোরিন্ডা এখান থেকে যেতে পারতো না এবং আমার অনুমতি পেতো না।

নাঈলা–আমি এখন আর কিছুই বলছি না। আমি অবশ্যই এর সত্যতা যাচাই করব।

রডারিক–আমার অভিমতও তাই। বিষয়টির যাচাই হওয়া উচিত। তবে অবশ্যই তা গোপনে হতে হবে। অন্যথায় আমার অসম্মানের কারণ হবে।

নাঈলা–আমি সবই বুঝি।

রডারিক–তবে তোমার মনে রাখা উচিত, জুলিয়ান আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদেরকে ডেকে নিয়ে এসেছে। সে হয়ত মুসলমানদের সঙ্গে কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

নাঈলা–হাঁ, এ সম্ভাবনা রয়েছে।

রডারিক–আমি মুসলমানদেরকে প্রতিহত করে জুলিয়ানকে উচিত শিক্ষা দেব।

নাঈলা–এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।

রডারিক–তবে তোমাকে একটি অঙ্গীকার করতে হবে।

নাঈলা–কী সেটা?

রডারিক–যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে।

নাঈলা–এক শর্তে আমি তাতে রাজি আছি।

রডারিক–শর্তটি কী?

নাঈলা–তোমাকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, তুমি আর কখনো কোন মেয়েকে উত্যক্ত করবে না।

রডারিক–আমি অঙ্গীকার করছি, আর কখনো এমনটি হবে না।

নাঈলা–তাহলে আমিও নীরব থাকব।

রডারিক–আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, বিষয়টির নিষ্পত্তি হলো।

নাঈলা–এখনো কৃতজ্ঞতার সময় আসেনি।

রডারিক–কেন?

নাঈলা–আমি বিষয়টির যাচাই করব, যদি সত্য হয়, তবে-------

রডারিক নাঈলার চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে তখনও রাগের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। নাঈলার কথা শেষ হতে না হতেই রডারিক বললেন–তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে?

নাঈলা–নিশ্চয়ই করব।

রডারিক–আমি এর জন্য প্রস্তুত।

নাঈলা–ঠিক আছে, চুক্তি আপাতত এ পর্যন্তই রইল।

এ কথা বলেই নাঈলা চলে গেলেন। রডারিক আর কিছু বলার মত সাহস পেলেন না। শুধু তার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর রডারিক কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

ষোল

রহস্যময় গম্বুজ

রডারিক সারা রাত খুবই অস্থিরতায় কাটান রাতে তিনি কোন কিছু খাননি, ভাল ঘুমও হয়নি। তিনি ভাবতে লাগলেন, গম্বুজটি খোলার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকেই তার উপর যেন নানা প্রকার বিপদাপদ আসা শুরু হয়েছে। কিন্তু জেদের বশবর্তী হয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা থেকে বিরত থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং তিনি গম্বুজটির খোলার সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন। পরদিন সকালেই তিনি তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদ ও কয়েকজন সৈনিককে ডেকে পাঠান।

সমগ্র দেশজুড়ে সাড়া পড়ে গেল রাজা গম্বুজটি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্মাণের পর থেকে এ পর্যন্ত গম্বুজটি কখনো খোলা হয়নি। এমন কি রোমান সম্রাট কায়সারও তা খোলার সাহস করেননি। ইতিপূর্বে যারাই গম্বুজটি খোলার চেষ্টা করেছে, তারাই হয়ত মৃত্যুবরণ করেছে, নয়ত অন্য কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং রডারিক কর্তৃক গম্বুজটি খোলার সিদ্ধান্তে দেশবাসীর মধ্যে এক প্রকার আতঙ্ক দেখা দিল। সকলেই ভাবতে লাগল, এই বুঝি দেশে কোন মহা-বিপদ নেমে আসছে।

এদিকে যে সৈনিক তাদমীরের চিঠি নিয়ে রাজার দরবারে এসেছিল, সে শহরের দু'চার জনের কাছে মুসলমানদের আগমন ও খ্রিস্টানদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা প্রকাশ করেছিল। পরবর্তী সময় তারা অন্যদের কাছেও এ ঘটনা বর্ণনা করে। ফলে শহরবাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সকলের মনেই এ ধারণার উদয় হলো যে, গম্বুজ খোলার সিদ্ধান্তের ফলেই এ সব নতুন নতুন সমস্যা আপতিত হচ্ছে এবং স্পেনবাসীদের উপর নানা প্রকার বিপদ নেমে আসছে।

রডারিক যাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তারা সবাই এসে হাযির হলো। রাজা শাহী পোশাক পরিধান করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে গম্বুজের দিকে এগুতে লাগলেন। যারা তার সঙ্গে যাচ্ছিল, তারা সবাই ছিল অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন, মৃত্যু গহবরের দিকে তাদেরকে টেনে নেয়া হচ্ছে। সকলেই নীরব, নিথর। কারো মুখে টু শব্দটিও নেই। সকলেরই কামনা

ছিল, রাজা যদি এ কাজটি থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু সবাই জানতো, রাজা একবার যা করতে মনস্থ করেন তা থেকে কখনো বিরত হন না ফলে কেউ তাকে বারণ করার সাহস করেনি, সবাই চুপচাপ রাজার পিছনে হেঁটে গেল।

রাজার সৈন্যদল অত্যন্ত সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল। শহরবাসীরা তাদেরকে দেখে এক অজানা অমঙ্গলের আশংকা করতে লাগল। ধীরে ধীরে সৈন্যদের মিছিল রাজধানী থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল

তাদের পরনে ছিল দামী রেশমী পোশাক। সূর্যালোকের প্রতিফলনে তা চিকমিক করতে লাগল। একসময় গম্বুজটির চূড়া তাদের দৃষ্টিগোচর হলো; কিন্তু সূর্যালোকের প্রতিফলনে সে দিকে ভালভাবে তাকানো যাচ্ছিল না।

গম্বুজটি পাহাড়ের উঁচু টিলায় অবস্থিত ছিল। শাহী মিছিলটি পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। তারা গম্বুজটির যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল, তাদের মন ভয়ে ততই আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর তারা একটি লম্বা সরুপথে প্রবেশ করল। ঘোড়ার খুরের শব্দ সমস্ত পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা সরুপথটি অতিক্রম করে একটি চূড়ায় গিয়ে পৌঁছাল। সেখানেই ছিল সেই রহস্যময় গম্বুজটি।

তারা ধীরে ধীরে গম্বুজটির নিকট উপস্থিত হলো। গম্বুজের চারদিকে রয়েছে ছোট–বড় অনেক টিলা। সর্বোচ্চ টিলায় গম্বুজটি নির্মিত হয়েছিল। ঘোড়া নিয়ে টিলার উপর উঠা সম্ভব নয়, তাই ইতিপূর্বেই তারা ঘোড়া ছেড়ে এসেছিল। সকলকে নিয়ে গম্বুজের কাছে গিয়ে রডারিক দেখতে পান, দেয়াল মর্মর প্রস্তরে নির্মিত, সূর্যালোকে সেগুলো চিকমিক করছে।

তারা গম্বুজের দেয়ালে একটি উপদেশ বাণী দেখতে পান। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও সেটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এবং আগন্তুকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

রডারিক বাণীটি পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিল, যে অন্যদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, সে অবশ্যই কষ্ট ও অশান্তিতে পতিত হয়। বাণীটি পাঠ করে রডারিক অবনত মস্তকে ভাবতে থাকেন। তার মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ পাদ্রীর কথা। তিনি এসে রাজাকে গম্বুজটি খুলতে বারণ করেছিলেন; কিন্তু রডারিক তার কথা শোনেনি। বৃদ্ধ সেখান থেকে চলে যান।

রডারিক আরো এগিয়ে গিয়ে অপর একটি উপদেশ বাণী উৎকীর্ণ দেখতে পান। তাতে লেখা ছিল–জেদ হলো আত্মম্ভরিতা। আর আত্মম্ভরিতা হলো ধ্বংসের মূল।

রডারিক ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মনস্থ করলেন, আর কোন উপদেশ বাণীর দিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন না; কিন্তু প্রকৃতির বিধান যা মানুষ দেখতে চায় না, তাকে বরং তা-ই দেখতে হয়। কোন উপদেশ বাণীর দিকে দৃষ্টি দেয়া তার আদৌ ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু এক অজ্ঞাত শক্তি যেন তাকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে। ফলে আরো একটি উপদেশ

বাণী তার দৃষ্টিগোচর হলো। তাতে লেখা ছিল, যে রাজা তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ শ্রবণ করেন না, সে নিজ হাতে নিজের কবর রচনা করে।

রডারিকের মনে কম্পনের সৃষ্টি হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, যদি ফিরে যাওয়া যেতো। পরক্ষণেই তার খেয়াল হলো এমতাবস্থায় ফিরে গেলে প্রজা সাধারণ তাকে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। অবচেতন মনেই তিনি গম্বুজের দরজার দিকে এগুতে লাগলেন।

রাজার সঙ্গীরাও বাণীগুলো পাঠ করছিল। তারা আশা করছিল, এসব পাঠ করে হয়ত রাজার বোধোদয় হবে। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত মুলতবি ঘোষণা করবেন; কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস করেনি।

পরিশেষে তারা দরজার খুব নিকটে গিয়ে পৌঁছল। তারা দেখতে পেলো, দ্বারটি খুবই উঁচু ও প্রশস্ত। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি বিরাট পাথর কেটে দ্বারটি তৈরী করা হয়েছে এবং নানা নক্সা দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে।

গম্বুজের দ্বারটি ছিল লোহার তৈরী। তাতে অতীতের অনেক রাজা-বাদশাহদের নামে তালা ঝুলানো রয়েছে। তালাগুলোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন বহুকাল যাবত এগুলো খোলা হয়নি। ফলে মরিচা পড়ে গেছে। দ্বারের সামনে দু'জন বৃদ্ধ বুকে হাত বেঁধে নিবিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাজাকে দেখেই বৃদ্ধ দু'জন অবনত মস্তকে তাকে প্রণাম জানাল। তারা সোজা হয়ে দাঁড়ালে রডারিক তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

চাবিগুলো কি পরিষ্কার করা হয়েছে?

একজন বৃদ্ধ উত্তর দিল, জী হাঁ, গতকাল সারা দিন আমরা এ কাজে লিপ্ত ছিলাম। কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে।

রডারিক–তালাগুলো?

একজন বৃদ্ধ–সেগুলো পরিষ্কারের সুযোগ হয়নি হুযুর।

রডারিক–তোমরা খুবই ভুল করেছ। তোমরা পারবে না বলে আমাকে জানালেই পারতে। আমি আরো লোক পাঠিয়ে দিতাম।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ–প্রকৃতপক্ষে আমরা মনে করেছিলাম, আপনি হয়ত আরো ভেবে-চিন্তে আপনার সিদ্ধান্ত মুলতবি ঘোষণা করবেন।

রডারিক–তোমাদের জানা উচিত যে, কোন রাজা কখনই তার সিদ্ধান্ত মুলতবি ঘোষণা করতে পারে না।

প্রথম বৃদ্ধ–মহামান্য সম্রাট, গম্বুজটি খোলা যে খুবই কষ্টকর ও বিপজ্জনক।

রডারিক–এসব বাতুলতা মাত্র। কোন পরোয়া নেই।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ–দেশবাসীর প্রতি সদয় হোন হুযুর।

রডারিক–মোটেই ঘাবড়িও না। ভয়ের কোন কারণ নেই।

প্রথম বৃদ্ধ–আমার বুক কাঁপছে হুযুর।

রডারিক–তোমরা বৃদ্ধ বলে এমন হচ্ছে। তা ছাড়া তোমরা ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অযথা বিশ্বাস করো।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ–অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হয় হুযুর।

রডারিক–আমি তা বিশ্বাস করি না।

উযীর–কিন্তু হুযুর.....

রডারিক–কি বলতে চাও তুমি

উযীর–আমি বলতে চাই–দ্বারটি খোলা না হোক।

রডারিক–ভারী বিস্ময়ের কথা তো! তুমি কি আমার স্বভাব জান না?

উযীর–আপনি কি উপদেশ বাণীগুলো দেখেছেন হুযুর।

রডারিক–দেখেছি। এগুলো এজন্যেই লেখা হয়েছে যাতে খুলতে আগ্রহী কোন ব্যক্তি এসব দেখে তার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে।

এরপর আর কেউ কোন কথা বলতে সাহস করল না।

রডারিক বললেন, রক্ষীদের কাছ থেকে চাবি নাও এবং তালা খোলার ব্যবস্থা কর।

উযীর ভীত স্বরে–ঠিক আছে তা-ই হোক।

রক্ষীদের কাছ থেকে চাবি নিলেন; কিন্তু তিনি নিজে খোলার সাহস পেলেন না। তিনি কয়েকজন সিপাহীকে ডেকে পাঠান এবং তালা খোলার নির্দেশ দেন। সিপাহীরা তালা খুলতে শুরু করে।

তালাগুলোতে মরিচা পড়ায় সহজে তা খোলা যাচ্ছিল না। কিন্তু সিপাহীরা আদেশ পালনে বাধ্য। তাই তারা মরিচা পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে তালাগুলো খুলতে লাগলেন।

একেকটি তালা খুলতে প্রচুর সময় লাগছিল। ফলে কয়েকটি তালা খুলতেই সারা দিন লেগে গেল। রডারিক কাছে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক সময় সন্ধ্যা হয়ে এলো। আর মাত্র একটি তালা বাকী। কয়েকজন সিপাহী মিলে সে তালাটিও খুলে দিলো। রডারিক এগিয়ে গেলেন এবং সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ভেতরে অগ্রসর হলেন।

সতের

গম্বুজের গোপন রহস্য

গম্বুজের দ্বার খুলে দেয়া হলে ভেতর থেকে এক প্রকার বদ্ধ আবহাওয়া বেরুতে লাগল। ফলে রডারিক ও তার সঙ্গী-সাথীরা একটু সরে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর তারা ভেতরের দিকে এগুতে লাগলেন। প্রথমে তারা একটি প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করেন। কামরাটি দীর্ঘকাল যাবত খালি পড়ে থাকায় এতে প্রচুর ধুলো-বালি জমে গিয়েছিল। তারা সামনে এগিয়ে গেলেন এবং ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অপর একটি কামরায় প্রবেশ করেন।

সে কামরায় একটি বিরাটকায় প্রতিমা দাঁড়ানো ছিল। প্রতিমাটির চোখ থেকে যেন আগুন ছিটকে পড়ছে। তার হাতে ছিল একটি ভারী হাতুড়ী। তা দিয়ে সে অবিরত মাটির উপর আঘাত হানছিল।

প্রতিমাটি ছিল এতই উঁচু যে, তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি উঁচু দরজা ছিল এবং এর ভিতর দিয়ে যে কোন বিরাটকায় মানুষ সহজেই আসা-যাওয়া করতে পারতো।

প্রতিমাটির অপর পাশেই ছিল আর একটি দরজা, যার সঙ্গে একটি কামরা ছিল; কিন্তু প্রতিমাটির জন্য সে দিকে এগুনো যাচ্ছিল না। কারণ ভারী হাতুড়ীধারী প্রতিমাটির কাছ দিয়ে যেতে কারো সাহস হচ্ছিল না। তা ছাড়া কোন বিকল্প পথ না থাকায় তারা এগুতে পারলেন না। সে কক্ষটিতে লাল বর্ণে লেখা ছিল "আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি"। রডারিক বাক্যটি পাঠ করে বললেন, হে প্রতিমা আমি শুধু গম্বুজটির রহস্য জানতে এসেছি, এর কোনরূপ অপমান বা ক্ষতি করতে আসিনি; কিন্তু প্রতিমার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। সে যথারীতি স্বীয় কাজেই ব্যাপৃত থাকল।

রডারিক আরেকটু এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ নিম্নস্থ একটি হুকে তার পা পড়ে গেল। অমনি প্রতিমাটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রডারিক একটু পিছিয়ে এলেন; কিন্তু প্রতিমাটির আর কোনরূপ নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না।

প্রতিমাটি সোজা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। দু'হাতে হাতুড়ী ধরা অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন হামলা করতে উদ্যত। অবস্থাটি রডারিক ও তার সঙ্গীদের কাছে খুবই

ভয়ঙ্কর মনে হলো। তাছাড়া প্রতিমাটির চোখ দু'টি ছিল লাল টকটকে, যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে।

রডারিক ও তার সঙ্গীরা ভয়ে ভয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। তাদের মনে আশংকা ছিল, প্রতিমাটি হয়ত হাতুড়ী দিয়ে তাদের উপর আঘাত হানবে কিন্তু প্রতিমাটির কোনরূপ নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না। তারা সকলেই প্রতিমার পায়ের নিচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং অপরদিকের দরজায় প্রবেশ করলেন।

সে দরজা দিয়ে তারা অপর একটি কামরায় প্রবেশ করেন। সে কামরার দেয়াল ছিল মর্মর পাথরে খচিত এবং ছাদ ছিল সাদা গোলাকার। তাছাড়া দেয়ালগুলোতে অনেক মূল্যবান পাথর বসানো ছিল।

কামরার মাঝখানে একটি টেবিল ছিল। এটি খোদ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের তৈরি। এটি ছিল প্রাচীন শিল্পরীতির একটি উত্তম নিদর্শন, খুবই সুন্দর ও মসৃণ। টেবিলের উপর একটি ছোট সিন্দুক বসানো ছিল। তাতে একটি লাইন উৎকীর্ণ ছিল, "এ গম্বুজের সকল রহস্য এ বাক্সে রক্ষিত আছে।"

রডারিক বললেন, এত ছোট সিন্দুকই কি সকল রহস্যের আধার?

উযীর বললেন, এতে তো কিছু আছে বলে মনে হয় না।

রডারিক তার দিকে তাকিয়ে বললেন, এত সহজেই তা কি করে বুঝতে পারলে? আগে আমাকে সিন্দুকটি খুলতে দাও। আমার মনে হয় এতে অনেক কিছুই বন্দী রয়েছে।

একথা বলেই রডারিক আবার সিন্দুকটির দিকে তাকান। উপরের লাইনটির নিচে একটি ছোট লাইনের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। রডারিক সে লিপিটি পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিল, "কেবল একজন রাজাই সিন্দুকটি খোলার সাহস করবে; কিন্তু তাকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে; কারণ এর ভিতর এমন সব ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে, যা কারো মৃত্যুর পূর্বে দৃষ্ট হয়।" বাণীটি পাঠ করে রডারিকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার পাশেই ছিলেন উযীর। তিনিও তা পাঠ করেছিলেন। কম্পিত হৃদয়ে তিনি রাজাকে বললেন, এখানেই ক্ষান্ত হোন হুযুর; সিন্দুকটি হয়ত না খোলাই ভাল।

রডারিক বললেন, এখন কি আর বাকী রইল; গম্বুজও খোলা হলো। এখন তো শুধু এ সিন্দুকটিই বাকী।

উযীর–এর ভেতরেই তো সকল রহস্য বন্দী।

রডারিক–আমি তো সে রহস্যই জানতে চাই।

একথা বলেই তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন। সিন্দুকটির ভেতরে তিনি দেখতে পেলেন, তাতে চামড়ার একটি লম্বা ফিতা রয়েছে। ফিতাটি লোহার হুকের সঙ্গে পেঁচানো এবং ফিতার উভয় পাশে তামার তখতি লাগানো।

সে ফিতায় সৈনিকদের ছবি অংকিত রয়েছে এবং তারা তলোয়ার, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তাদের চেহারা ছিল খুবই উজ্জ্বল ও ধবধবে ফিতার উপরিভাগে লেখা ছিল, "হে দুর্ভাগা রাজা, তাদের দিকে লক্ষ্য কর যারা তোমাকে পদচ্যুত করে তোমার রাজ্য দখল করবে।" রডারিক বাক্যটি পাঠ করে আঁতকে উঠেন এবং উযীরের দিকে তাকান। উযীরও বাক্যটি পাঠ করেছিলেন এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য রাজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। উভয়ের দৃষ্টি একাকার হয়ে গেলে রাজা লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেন। তারা আবার ফিতার দিকে দৃষ্টি দেন। তারা লক্ষ্য করেন, ফিতাটি দ্রুত ঘুরছে। এক সময় ফিতায় একটি মাঠ দেখা গেল এবং বহু লোকের শোরগোল শোনা গেল।

সে সময় আকাশে ঘন মেঘ দেখা দিল এবং সমস্ত মাঠ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার দূরীভূত হলে অশ্বারোহীদের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ্য করা গেল। দেখা গেল, ক্রমেই ময়দানটি একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। একদিকে খ্রিস্টান সৈন্যরা স্পেনের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অপর দিকে ঢিলে-ঢালা পোশাক ও পাগড়ি পরিহিত; তাদের মুখে ছিল লম্বা দাড়ি এবং চোহারা ছিল ধবধবে উজ্জ্বল। কিছু লোকের হাতে রয়েছে বর্শা, কারো হাতে তীর-ধনুক আবার কারো হাতে তলোয়ার। তারা একদিকে রণবাদ্য বাজাচ্ছে; অপরদিকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস নিনাদিত করে তুলছে। এ শব্দ শুনে তারা সকলেই দমে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখতে পেলেন, দু'টি দলের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্শা ও তলোয়ার উঁচিয়ে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে।

তলোয়ারের আঘাতে মানুষের কর্তিত শির মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। চারদিকে কেবল আহাজারির শব্দ। ধীরে ধীরে যুদ্ধ আরো তীব্রতর হলো। খ্রিস্টানরা সংখ্যায় অনেক ছিল; কিন্তু অপর দলটিকে তারা শনাক্ত করতে পারল না। তারা দেখতে পেলো, বহু খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হচ্ছে। এক সময় ক্রুশধারী খ্রিস্টানদের হাত থেকে পতাকাটি পড়ে গেল এবং খ্রিস্টানরা পরাজয় বরণ করল।

পরাজিত খ্রিস্টানরা এদিক-সেদিক পালাতে লাগল। আর জুব্বাধারীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যা করতে লাগল। হতাহতদের আর্তচিৎকারে তখন সমস্ত মাঠ মুখরিত। রডারিক ও তার সঙ্গীরা ভাবতে পারছেন না, কি হতে যাচ্ছে এবং তারা এ কি দেখছেন। তারা আবার ফিতার দিকে তাকালেন। একজন আরোহীর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তার পরনে ছিল দামী রেশমী পোশাক, মাথায় ছিল মণি-মুক্তা খচিত শাহী মুকুট। তার ঘোড়াটি ছিল সাদা বর্ণের। তার পোশাক, মুকুট ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল রডারিকের মতো।

আরোহীটি ছিল একজন খ্রিস্টান। তার চেহারা ছিল ঠিক রডারিকের চেহারার মতো। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, একজন জুব্বাধারী। সে খ্রিস্টান আরোহীর দিকে

এগিয়ে আসছে এবং যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। খ্রিস্টান আরোহীটি বর্শা বিদ্ধ হলো। ফলে তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। এক সময় আরোহীটি ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মৃতদেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

এসব দেখে রডারিক ও তার সঙ্গীরা আরো ঘাবড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, একটি বিস্ময়কর আলো সমস্ত কামরায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমে তা উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এক সময় তা এত প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যে, চোখ এর তেজ সহ্য করতে পারছে না।

এমন সময় সিন্দুকের ভেতর থেকে আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এলো এবং তা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। এতে রডারিক ও তার সঙ্গীরা দ্রুত পালাতে লাগলেন। তখনই তারা একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেলেন, যেন বজ্রপাত হচ্ছে অথবা কোন পাহাড় ফেটে পড়েছে।

এ আওয়াজ শুনে তারা অস্থির হয়ে দৌড়াতে লাগলেন। যে কামরায় প্রতিমা রক্ষিত ছিল, তারা প্রথমে সে কামরায় এলেন। প্রতিমার রক্ষিত স্থানটি গর্তে পরিণত হয়েছিল এবং প্রতিমাটি সে গর্তে পড়ে গিয়েছিল। তারা দেখতে পান, প্রতিমাটি মুখ খুলে এমন এক বিকট আওয়াজ তুলল, যেন এক বিকট বজ্রধ্বনি। সে ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক রক্ষিত কামরাটি ভেঙ্গে পড়ল। এতে আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ততক্ষণে রডারিক ও তার সঙ্গীরা গম্বুজের ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

তাদের বেরোনোর সময় সমস্ত গম্বুজে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং আগুনের লেলিহান শিখা উঁচু হয়ে উঠেছিল। দেয়ালের পাথরগুলো দূর-দূরান্তে ছিটকে পড়তে লাগল। যেখানেই ছিটকে পড়ছিল, সেখানেই আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল।

ইতিমধ্যে রাত হয়ে এলো। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সমস্ত পাহাড় আলোকিত করে তুলল। রডারিক ও তার সঙ্গীরা দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন।[১]

১। উক্ত অধ্যায়ে যে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে, তা তারীখে আন্দালুসের ১৭-১৮ ও ১৯১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে ঘটনাটি একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের লিখিত। আমাদের ধারণা এতে কিছু না কিছু সত্যতা হয়ত রয়েছে। কেননা, বিশ্ব পরিব্রাজকগণ দীর্ঘকাল পরও পাহাড়ের সে গম্বুজটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানকার অধিবাসীরাও প্রায় একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আঠার

প্রস্থান

রডারিক ও তার সঙ্গীরা দ্রুত পালাচ্ছিল এবং পেছন ফিরে গম্বুজের অবস্থা দেখছিল। তারা লক্ষ্য করছিল, দেয়ালের ইট-সুরকি ছিটকে পড়ছে। তাদের মনে আশংকা হলো, পাথরের কোন টুকরা হয়ত তাদের উপরও ছিটকে পড়তে পারে। এই ভয়ে তারা আরো দ্রুত ঘোড়া চালালেন। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। এ জন্য ঘোড়া কখনো কখনো হোচট খাচ্ছিল। ঘোড়া অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। সম্ভবত ঘোড়াগুলোও বিপদ অনুধাবন করেছিল। এইজন্য নিজ থেকেই তারা অত্যন্ত দ্রুত দৌড়াচ্ছিল।

এক সময় তারা পাহাড় অতিক্রম করতে সক্ষম হলো এবং শহর অভিমুখে এগুতে লাগল। তখন দূর আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছিল।

রডারিক–কি ভয়ঙ্কর ঘটনাই না আমরা আজ দেখেছি।

উযীর–যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি বিস্ময়কর হুযুর।

রডারিক–আমার ধারণা ছিল, সেখানে হয়ত কোন গুপ্তধন রয়েছে।

উযীর–আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, সেখানে কোন গুপ্তধন নেই।

রডারিক–আমি যদি গম্বুজটি না খুলতাম, তাহলে?

উযীর–তাহলেও তা–ই থাকতো।

রডারিক–তা হয়ত ঠিক, কিন্তু ফিতায় যাদেরকে দেখা গেল, তাদেরকে তো চেনা গেল না।

উযীর–আমার ধারণা, ওরা হয়ত আরব।

রডারিক–আরব মুসলমান?

উযীর–জী হাঁ।

রডারিক–অনুতাপ করে বল্লেন, স্পেনে মুসলমানদের হামলা?

উযীর–আমার মনে হয়, যারা তাদমীরকে পরাজিত করেছে এরা ওরাই।

রডারিক–হয়ত তা–ই হবে। তাদমীর তার চিঠিতে যেসব লোকের বর্ণনা দিয়েছে, আমরা তাদেরকেই দেখেছি।

উযীর–আমাদের এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানরা যে দেশ আক্রমণ করে, তাতে চূড়ান্ত বিজয়লাভের পূর্বে তারা ক্ষান্ত হয় না।

রডারিক–এমনটি শোনা যায়। জুলিয়ান হয়ত তাদেরকে ডেকে এনেছে।

উযীর–এটা জুলিয়ানের চরম নির্বুদ্ধিতা। তার জানা উচিত, মুসলমানরা স্পেন জয় করতে পারলে সিউটা তার হাতে ছেড়ে দেবে না।

রডারিক–আমার দুঃখ এখানেই, সে খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও নিজ দেশ ও জাতির প্রতি এমন গাদ্দারী করল!

উযীর–জুলিয়ান তো তেমন লোক নন; হয়ত তার কোন বড় রকম ক্ষতি করা হয়েছে।

রডারিক–ক্ষতি তো এটাই যে, তার শ্বশুরকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে।

উযীর–ঠিক বলেছেন হুযুর। হয়ত ডন্‌রাও এতে যুক্ত রয়েছে।

রডারিক–কিন্তু এই নির্বোধরা জানে না, মুসলমানরা স্পেনে ক্ষমতাসীন হলে তাদেরকে কোন ক্ষমতা দেবে না।

উযীর–এটা তাদের একান্তই নির্বুদ্ধিতা।

তারা শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। এখন সবাই নীরব।

রডারিকের ইচ্ছা ছিল, জনসাধারণ যেন এ ঘটনা জানতে না পারে। কারণ তাতে রাজার অসম্মান হবে এবং এ জন্য দেশবাসী তাকে দায়ী করবে। রডারিক এ সব ঘটনার জন্য ডন্‌রা ও জুলিয়ানকে দায়ী করেন। ইতিমধ্যেই তারা প্রাসাদের নিকটে এসে গেলেন। রডারিক ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মহলে ঢুকে পড়েন। সঙ্গী-সাথীরা সবাই নিজ নিজ গৃহে চলে যান। রডারিক তার কামরায় ঢুকে নাঈলাকে বসা অবস্থায় দেখতে পান। গম্বুজের ঘটনাবলী তাকে এত ভীত করে ফেলেছিল যে, তার চেহারায় অস্থিরতার ছাপ বিদ্যমান ছিল।

নাঈলা তাকে দেখেই বললেন, গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেল?

রডারিক বললেন, না কিছুই পাওয়া যায়নি।

নাঈলা–তাহলে তাতে কি ছিল?

রডারিক–কিছুই ছিল না। যা দেখেছি, সবটাই যাদু ও ধোঁকাবাজি।

তারপর গম্বুজে যেসব বিষয় দেখেছেন, নাঈলার কাছে তা বর্ণনা করেন।

নাঈলা অবাক বিস্ময়ে তা শ্রবণ করেন। বলা শেষ হলে নাঈলা বললেন, জেদ করে যে ভুল করেছ, তা এখন বুঝ।

রডারিক–হাঁ, এ ব্যাপারে আমি অনুতপ্ত যে, একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন পুড়ে গেল।

নাঈলা–এটাও অস্বাভাবিক নয় যে, সেখানে তুমি যা দেখেছ, বাস্তবেও তোমাকে এর সম্মুখীন হতে হবে।

রডারিক–আমি তা বিশ্বাস করিনে।

কামরায় প্রচুর আলো ছিল। সে আলোয় নাঈলার সুন্দর চেহারা পূর্ণ চন্দ্রিমার ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

নাঈলা–তাদমীর কি কোন শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়েছে?

রডারিক–হাঁ, তবে বিস্ময়ের ব্যাপার যে, গম্বুজে আমি যাদেরকে দেখেছি ঠিক একই ধরনের লোক তাদমীরকে পরাজিত করেছে। আমি শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।

নাঈলা–তাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা।

রডারিক–তারা মুসলমান, আরব থেকে এসেছে।

নাঈলা–বিস্ময়ের সুরে বললেন, মুসলমান!

রডারিক–হাঁ।

নাঈলা–দেশ ও জাতির সংরক্ষক হয়ে তুমি কেন এ ভুল করতে গেলে!

রডারিক–আমি কি ভুল করলাম?

নাঈলা–তুমি জুলিয়ানকে ক্ষেপালে কেন?

রডারিক–আমি তো বলেছি যে, আমি তাকে ক্ষেপাইনি। সে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে আমাকে দোষারোপ করছে। সে চাচ্ছে.....

রডারিকের কথা শেষ হতে না হতেই নাঈলা বললেন, ঠিক আছে, আমি আর সে প্রসঙ্গ বাড়াতে চাইনে। কি ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছ, আমি শুধু সেটাই জানতে এসেছিলাম। এখন আমি যাচ্ছি।

এই বলে নাঈলা চলে গেলেন। তাকে বাধা দেয়ার মত সাহস রডারিকের ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন নাঈলা ফ্লোরিন্ডার সমস্ত ঘটনাই জেনে ফেলেছে।

আজ সারাদিনই রডারিকের অত্যন্ত অস্থিরতায় কেটেছে। গম্বুজের ঘটনাবলী তাকে এতই অস্থির করে ফেলেছিল যে, রাতে কিছু আহারও গ্রহণ করেননি। সরাসরি শয়নকক্ষে চলে যান এবং নিদ্রা গ্রহণ করেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি সেনাপতিকে ডেকে পাঠান এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশানুসারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হলো এবং ছোট ছোট সৈন্য দল পাঠানো আরম্ভ হলো। কয়েকদিন পর রডারিক তার সব উপদেষ্টা ও বীর যোদ্ধাসহ অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। তাকে প্রজারা জমকালো বিদায় সংবর্ধনা জানায়। রডারিক সর্বমোট ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম বীর বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য কর্ডোভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

উনিশ

নিখোঁজ

রডারিকের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদমীর মেডোনার দিকে যাত্রা করেন। তার মনে আশংকা ছিল যে, মুসলমানরা তার পিছু ধাওয়া করতে পারে। এ ভয়ে তিনি সোজা পথ এড়িয়ে পাহাড়ী পথে এগুতে লাগলেন। তার সৈনিকদের অধিকাংশই নিহত হয়েছিল। যারা বেঁচে ছিল তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য তাদমীরের সঙ্গে ছিল।

তাদমীরের মনে যেমন পরাজয়ের গ্লানি ছিল, তেমনি এই মর্মে প্রশান্তিও ছিল যে, তারা একজন আরবকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে। তাদমীর ভাবছিলেন যে রাজার সামনে বন্দীকে হাযির করে নিজের বীরত্বের পরিচয় দেবেন। এজন্য তিনি দ্রুত মেডোনার দিকে এগুচ্ছিলেন।

পালিয়ে যাওয়া অন্যান্য খ্রিস্টান সৈন্যরাও তাদমীরের সঙ্গে এসে মিলিত হলো। এখন তাদমীরের সঙ্গে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচশ'। তাদমীর যে গ্রামেই যেতেন, সেখানেই মুসলমানদের সাহসিকতার কথা গল্প করতেন। খ্রিস্টানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতেন।

তাদমীর খ্রিস্টানদেরকে বোঝাতেন, মুসলমানরা ক্রশ চিহ্নিত পতাকাকে অসম্মান করেছে। তারা খ্রিস্টানদেরকে মুসলমান বানানোর পক্ষপাতি। সকলে মিলে তাদেরকে প্রতিহত না করতে পারলে তারা সমগ্র স্পেন দখল করে ফেলবে। তারা খ্রিস্টান পুরুষদেরকে হত্যা করবে এবং মেয়েদেরকে দাসীতে পরিণত করবে। গির্জার পতন ঘটাবে এবং খ্রিস্ট ধর্মের বিলোপ সাধন করবে।

তাদমীরের এরূপ প্রচারণার ফলে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। অনেকে গ্রাম ছেড়ে কর্ডোভার দিকে যাত্রা করে। ফলে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। কেউ কেউ তাদমীরের সঙ্গে যোগদান করে। এতে তার সঙ্গীদের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায় এবং এদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার।

তাদমীর এগুচ্ছিলেন, আর বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ থেকে রসদ সংগ্রহ করছিলেন। ফলে তারা বেশ নির্বিঘ্নেই পথ চলছিলেন। বিলকীসের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছিল এবং তার

বন্ধন খুলে দেয়া হয়েছিল। এখন তিনি কেবল নজরবন্দী। কিন্তু ইসমাঈলের প্রতি তাদের প্রবল ভীতি ছিল। তাদের মনে আশংকা ছিল যে, তার বন্ধন খুলে দিলেই হয়ত পালিয়ে যাবে, নতুবা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ শুরু করবে।

ইসমাঈল সম্পর্কে তাদমীরের মনে অনুরূপ ভয়ের কারণও ছিল। তিনি ইসমাঈলকে যে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখেছিলেন, তাতে তার মনে এই প্রত্যয় জন্মেছিল, এখন যদি তার হাতের বন্ধন ছেড়ে দেয়া হয়, তবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তিনি একাই সকল খ্রিস্টানকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। তাই তাদমীর ইসমাঈলের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন।

তাছাড়া তাদমীর মুসলমানদেরকে মানুষ মনে করতো না। কারণ তিনি বুঝতেও পারেননি, এরা কারা এবং কোত্থেকে এসেছে, কিই-বা তাদের উদ্দেশ্য। তার ধারণা ছিল, যারা জীবন বাজি রেখে এরূপ আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে তারা মানুষ নন। তাই মুসলমানদের সম্পর্কে তার মনে চরম ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল।

তাদমীর আরবী ভাষা জানতেন না। তাই ইসমাঈল ও বিলকীসের মধ্যে যে কথোপকথন হতো, তিনি বা তার সঙ্গীরা তার কিছুই বুঝতেন না। তাতে তাদমীরের মনে আশংকা হলো, বিলকীস ও ইসমাঈলকে একসঙ্গে রাখলে বিলকীস হয়ত ইসমাঈলকে ছেড়ে দিতে পারে। এজন্য উভয়কে পৃথক রাখা হলো।

পথিমধ্যে এক স্থানে তারা কয়েকটি তাঁবু পেয়েছিল। একটিতে তাদমীর নিজে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটি তাঁবু বিলকীসকে দেয়া হলো। বাকীগুলো অন্যান্য খ্রিস্টান অফিসারদের মধ্যে বন্টিত হলো। তাদমীর এখন বিলকীসের প্রতি অধিকতর যত্ন নিতে লাগলেন। বিলকীসের প্রতি যত্ন নেয়ার কারণও ছিল। তাদমীর জানতেন যে, বিলকীসকে রডারিকের কাছে পাঠাতে হবে। তার প্রতি যত্ন নেয়া না হলে সে রডারিকের কাছে নালিশ করতে পারে। তাতে তাদমীরের ক্ষতি হতে পারে।

তাদমীর তাও জানতেন যে, রডারিক যে স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হন তার প্রতি অন্য কারো দুর্ব্যবহার তিনি কখনো সহ্য করেন না। সুতরাং বিলকীস তাদমীরের নামে কোন অভিযোগ করলে তাতে রাজা অবশ্যই তাদমীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে শাস্তি দেবেন। এজন্য তাদমীর বিলকীসের আরাম-আয়েসের প্রতিবিধানে কোন ত্রুটি করেননি।

বিলকীস নিজ তাঁবুতে গিয়ে ইসমাঈলের কথা ভাবতে লাগলেন। কিভাবে ইসমাঈলকে নিজ তাঁবুতে আনা যায়, তাঁর কষ্ট লাঘব করা যায়– তিনি এ চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লেন। বিলকীস তার এ ইচ্ছার কথা তাদমীরকেও একাধিকবার জানিয়েছেন, কিন্তু তাদমীর তার কথায় কর্ণপাত করেননি। বিলকীস এ ভাবনায়ও উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, ইসমাঈল হয়ত তাকে স্বার্থপর ভাবতে পারেন। কারণ বিলকীস আজকাল ইসমাঈলের সঙ্গে কথা বলার তেমন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সব সময়ই

তাদমীর তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। আর ইসমাঈলকে সর্বদা খ্রিস্টান সৈন্যরা ঘিরে রাখতো।

একদিন খ্রিস্টান সৈন্যদল সে স্থান ছেড়ে যাত্রা করল। তারা পাহাড়ী পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের এ অংশটি ছিল সবুজ-শ্যামল। উভয় দিকে সবুজের সমারোহ। বৃক্ষগুলো ফলে-ফুলে পূর্ণ। ফলে চারদিকে ফুলের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। সূর্যের সোনালী আভা বৃক্ষের সবুজ পাতায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

তাদমীর এবং বিলকীস দু'টি ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি যাচ্ছিলেন। তারা ছিলেন সবার আগে। তাদের পিছনে খ্রিস্টান সৈন্যদল সারিবদ্ধভাবে পথ চলছিল। তাদের মাঝখানে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ইসমাঈল একটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। অনেক দূর যাওয়ার পর তারা একটি উপত্যকায় পৌছেন। তাদমীর সেখানে নেমে পড়েন এবং ঘোড়ার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। তার ইচ্ছে ছিল, তিনি সকলকে নিয়ে দিনে দিনে পাহাড়টি অতিক্রম করে পাদদেশে পৌছে যাবেন। তাই তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন:

বাহাদুর সিপাহীগণ, এখানে তোমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করো। ঘোড়াগুলোকেও কিছুটা বিশ্রাম দাও। আজকে হয়ত অনেক রাত পর্যন্ত আমাদেরকে পথ চলতে হবে। একথা শোনামাত্র সিপাহীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে এবং বিশ্রাম গ্রহণ করে।

এমন সময় সম্মুখে একজন আরোহীকে আসতে দেখা গেল। তার পরনে ছিল খ্রিস্টানদের পোশাক। তাকে একজন দূত বলে মনে হচ্ছিল। তাদমীর তাকে দেখতে পান এবং তার দিকে এগিয়ে যান। এই সুযোগে বিলকীস তার ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। একজন খ্রিস্টান সিপাহী তা দেখামাত্র ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে।

বিলকীস সামনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। ভাবখানা যেন কোন ফুল তোলার জন্য নির্বাচন করছিলেন। কখনো পার্শ্ববর্তী ফুল গাছ থেকে ফুল তুলছিলেন। আবার কখনো আড়চোখে ইসমাঈলের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ইসমাঈলও দূর থেকে বিলকীসকে দেখছিলেন। বিলকীস একটি ফুল নিয়ে খেলাচ্ছলে সামনে এগুতে লাগলেন এবং এক সময় ইসমাঈলের কাছাকাছি এসে পৌছলেন। তিনি সলাজ দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে একটি ফুল ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,

আপনি কি এ ফুলটি গ্রহণ করবেন?

ইসমাঈল হাসলেন। তিনি বললেন, এটা কি আমি তোমার প্রেমের নিদর্শন বলে মনে করব?

বিলকীস লজ্জিত হলেন। আনত দৃষ্টিতে বললেন, আপনি যদি আমাকে এর যোগ্য বলে মনে করেন, তবে............

ইসমাঈল ফুলটি হাতে নিয়ে বললেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বিলকীস আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বললেন, আপনি হয়ত আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করেছেন, কিন্তু আমার অসুবিধাগুলো জানেন না।

ইসমাঈল–আমি সব জানি।

বিলকীস–আপনি হয়ত আমাকে অভিযুক্ত করতে পারেন।

ইসমাঈল–আমার কি এর অধিকার আছে?

বিলকীস–আপনি এরূপ বলছেন কেন?

ইসমাঈল–কথা হলো যে, বিলকীস.......

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিলকীস বললেন: দেখুন, তাদমীর ফিরে আসছে। সে আমার প্রতি কঠোর নজর রাখছে এবং আপনার সঙ্গে আমার যাতে কোনরূপ যোগাযোগ না হয় সে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। হয়ত আমাদেরকে একত্রে দেখে সে কোনরূপ সন্দেহ করতে পারে। যাক, যে কথার জন্য এসেছিলাম তা হলো আজ রাতে আপনি একটু সতর্ক থাকবেন।

ইসমাঈল তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন আমার জন্য কি কোন ভয়ের কারণ আছে?

বিলকীস হেসে ফেললেন। বললেন, আমি কি বলেছি, আর আপনিই বা কি বুঝলেন। আমি বলেছি আজ রাতে হয়ত আমি আপনার কাছে আসার চেষ্টা করব।

ইসমাঈল–কি জন্য?

বিলকীস–তা সে সময়ই বুঝতে পারবেন। এখন চললাম।

বিলকীস তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন। ইসমাঈল বিলকীসের দেয়া ফুলটি নিজের বুকে চেপে ধরেন এবং বিলকীসের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকেন। বিলকীস সেখান থেকে সরাসরি নিজের ঘোড়ার কাছে চলে যান। ইতিমধ্যে তাদমীরও আগন্তুককে নিয়ে ফিরে এসেছেন।

আগন্তুক ছিল দূত। তাদমীর তাকে চিঠি দিয়ে রডারিকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তিনি খ্রিস্টান সিপাহীদের লক্ষ্য করে বললেন, বাহাদুর সিপাহীগণ! আমাদের রাজা স্বয়ং এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে আসছেন। সুতরাং এখন আর আমাদের বিশ্রামের সময় নেই। আমাদেরকে এখন দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরা নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে বসল এবং যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর চলার পর তারা একটি পাহাড়ীপথে এসে উপস্থিত হলো। পথটি ছিল এতই সংকীর্ণ যে কেবল চারজন আরোহী পাশপাশি চলতে পারতো।

সিপাহীরা চার চার জন করে সারিবদ্ধভাবে এগুতে লাগল। তারা পাহাড়টি পেরিয়ে শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। তখন রাত হয়ে এসেছে। পাহাড়টির প্রান্তেই ছিল একটি বিরাট ময়দান। তারা সকলেই সে ময়দানে আশ্রয় নিল এবং রাত্রি যাপনের

জন্য খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই তারা যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করল। এমন সময় দেখা গেল যে ইসমাঈল নিখোঁজ

তাদমীর তাতে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। অস্থির চিত্তে তার তালাশে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন। জানা গেল, শোয়ার সময়ও সে ছিল এবং এর পরেও তাকে দেখা গেছে; কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে তাকে আর পাওয়া যায়নি।

সিপাহীরাও অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ল। তারা বুঝতেই পারলো না, এত লোকের মাঝ থেকে কিভাবে সে পালিয়ে গেল। তারা বসে বসে ইসমাঈলের তালাশের চিন্তা-ভাবনা করছিল। এমন সময় বিলকীসের তাঁবুর প্রহরী এসে খবর দিল, বিলকীসকেও পাওয়া যাচ্ছে না। তাদমীর দৌড়ে বিলকীসের তাঁবুর দিকে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁবু খালি পড়ে আছে। তিনি আরো অস্থির হয়ে পড়লেন। বললেন, সে দুর্ভাগাও গেল এবং বিলকীসকেও নিয়ে গেল। তিনি সকলকে তাদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন।

সিপাহীরা তাদের তালাশে পাহাড়ের উপর উঠে গেল এবং সমস্ত পাহাড় তন্নতন্ন করে খুঁজলো; কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। এভাবে সারা দিন কেটে গেল এবং রাত হয়ে এলো। তারা ফিরে এলো এবং সেখানেই রাত যাপন করল। পরদিন সকালে আবার তাদের তালাশে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করল; কিন্তু কোথাও তাদের হদিস মিলল না। তৃতীয় দিন বাধ্য হয়ে তারা সে স্থান ত্যাগ করে সামনে যাত্রা করল।

কুড়ি

দুঃখজনক সংবাদ

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ইসমাঈল ও বিলকীসের কোন সন্ধান করতে না পেরে তাদমীর সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তারা আর কালবিলম্ব না করে সোজা কর্ডোভার দিক অগ্রসর হলো এবং প্রান্তর অতিক্রম করে গোয়াডাল কুইভার নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছল।

স্পেনে কেবল দু'টি বৃহৎ নদী রয়েছে। একটি হচ্ছে টেগাস্, অপরটি গোয়াডাল কুইভার। দু'টো নদীই অত্যন্ত নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতো। ফলে এগুলো থেকে সেচের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। এজন্য নদী দু'টো স্পেনের কোন উপকারে আসতো না। তা সত্ত্বেও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সুন্দর ঘাস ও ফুলে-ফলে এক মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

খ্রিস্টান সৈন্যরা গোয়াডাল কুইভার অতিক্রম করে কর্ডোভার নিকটে এসে পৌঁছালো। তারা জানতে পেরেছিল, রডারিক ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে কর্ডোভায় অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে তাদমীরের সৈন্যদল কর্ডোভায় পৌঁছে গেল। রডারিকের সৈন্যদল সারা শহর ছেয়ে ফেলেছিল। তাতে শহরটি একটি তাঁবুর শহর বলে মনে হচ্ছিল।

রডারিকের আগমনে তাদমীরের সৈন্যরাও আনন্দিত হলো। তারাও রডারিকের বাহিনীর তাঁবুর পাশে তাঁবু ফেললো। রডারিকের কাছেও তাদমীরের আগমন-বার্তা গিয়ে পৌঁছল। রডারিক তাদমীরের চিঠিতে বর্ণিত আরব বন্দীটিকে দেখার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। সর্বাধিক আগ্রহ ছিল বিলকীসের প্রতি। তাই তাদমীরের আগমন-বার্তা শোনামাত্র তিনি নিজেই তাদমীরের তাঁবুর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

রডারিকের বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সবাই সতর্ক হয়ে গেল; কিন্তু রাজা কি জন্যে বের হয়েছেন এবং কোন্ দিকে যাবেন, তা কেউই বলতে পারলো না। তাই সকলেই সমস্ত কাজ ফেলে রাজার সম্বর্ধনার জন্য প্রস্তুত থাকলো।

রডারিক সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করলেন, তাদমীরের তাঁবু কোন্ দিকে?

একজন সৈন্য এগিয়ে এসে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তাদমীরও রাজার আগমন–বার্তা শুনতে পেলেন। তিনি দ্রুত সামরিক পোশাক পরিধান করে বেরিয়ে আসলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, রাজা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছেন। রাজার কাছাকাছি পৌঁছে তাদমীর অবনত মস্তকে রাজাকে অভিবাদন জানান। রডারিক তাদমীরকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার চিঠিতে যে এক বিস্ময়কর জাতির কথা উল্লেখ করেছিলে, তাদের সঙ্গে কি তোমার কোন যুদ্ধ হয়েছে?

তাদমীর–হাঁ, হুযুর।

রডারিক–সে লোকগুলো কোত্থেকে এসেছে?

তাদমীর–হুযুর? তারা কোত্থেকে এসেছে, তা কেউই বলতে পারে না।

রডারিক-তাদের সংখ্যা কত হবে?

তাদমীর–সঠিক সংখ্যা হয়ত বলা যাবে না, তবে সাত-আট হাজারের বেশী হবে না।

রডারিক মুচকি হেসে বললেন, মাত্র সাত হাজার!

তাদমীর–জী হাঁ, তবে তাদের এ পরিমাণই যথেষ্ট শক্তিশালী।

রডারিক–তুমি তাদেরকে খুবই সাহসী বলে মনে করো?

তাদমীর–কি বলবো হুযুর, তাদের চাইতে অধিক সাহসী আমি আর কাউকেই দেখিনি।

রডারিক–তারা খুবই যুদ্ধবাজ, তাই তো?

তাদমীর–ঠিক তা-ই হুযুর, তারা যেন যুদ্ধকে খেলা মনে করে।

রডারিক–তারা কি পদাতিক না অশ্বারোহী?

তাদমীর–তারা পদাতিক হুযুর; কিন্তু অশ্বারোহীদের ভ্রুক্ষেপই করে না।

রডারিক–এ যুদ্ধে তোমাদের নিহতের সংখ্যা কত?

তাদমীর–মৃতের সঠিক সংখ্যা হয়ত বলা যাবে না; তবে তের-চৌদ্দ হাজারের কম হবে না।

রডারিক–তাদের কতজন নিহত হয়েছে?

তাদমীর-সত্যি বলতে তাদের কাউকেই আমি মরতে দেখিনি। তারা এমন এক জীব যেন মৃত্যুও তাদেরকে ভয় পায়।

রডারিক–তা তো খুবই বিস্ময়ের কথা!

তাদমীর–তাদের সব কিছুই বিস্ময়কর হুযুর।

রডারিক–তোমরা কেবল একজনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছ।

তাদমীর–হুযুর, তাও তো বহু চেষ্টা ও কৌশলে।

রডারিক–সে কি তোমাদের বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়েছিল?

তাদমীর–জী হাঁ, আমরা পরাজিত হলে আমি পঞ্চাশ-ষাট জন সৈন্য নিয়ে আমার তাঁবুতে পালিয়ে আসি। উদ্দেশ্য ছিল, বিলকীসকে নিয়ে পালিয়ে যাব, কিন্তু......

রডারিক–শত্রুরা এসে তোমাদের পথ রোধ করে।

তাদমীর–জী না হুযুর, শত্রুদলের এক যুবক এসে বিলকীসকে নিয়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

রডারিক–বিলকীসকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল?

তাদমীর–জী হাঁ।

রডারিক–আর বিলকীস?

তাদমীর-সেও যেন যুবকটির সঙ্গে যেতে রাজি ছিল।

রডারিক–তারপর কি হলো?

তাদমীর–সে আমাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

রডারিক–বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, সে একাই তোমাদের এত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো?

তাদমীর–শুধু প্রস্তুতই হলো না, আক্রমণও চালালো।

রডারিক–ভারী বিস্ময়ের ব্যাপার দেখছি।

তাদমীর–আরো বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সে একাই আমাদের একুশ জনকে হত্যা করলো।

রডারিক–তাহলে সে তো বাস্তবিকই একজন সাহসী ব্যক্তি।

তাদমীর–অথচ সে একটু আঘাতও পেলো না।

রডারিক–তাহলে তাকে বন্দী করলে কিভাবে?

তাদমীর–আমি বিলকীসকে গিয়ে ধরলাম, অমনি সে চিৎকার দিয়ে উঠল। তাতে যুবকটি অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে তাকালো। ঠিক তখনই আমার সৈন্যরা তাকে ধরে বেঁধে ফেললো।

রডারিক–তাহলে তোমরাও যথেষ্ট চেষ্টা করেছ। আমি যুবকটিকে দেখতে চাই।

তাদমীর–এখন তাকে কোথায় পাব হুযুর?

রডারিক–কেন, তাকে কি হত্যা করেছ?

তাদমীর–না হুযুর, সে পালিয়ে গেছে।

রডারিক–বিস্ময়ের সুরে বললেন, কোথা থেকে, কিভাবে পালিয়ে গেল? সে কি যাদুকর ছিল?

তাদমীর–তা-ই হুযুর, হয়ত যাদুকর অথবা জ্বীন হতে পারে।

রডারিক–বিলকীস কোথায়?

তাদমীর–সেও পালিয়েছে হুযুর। যুবকটি হয়ত তাকেও নিয়ে গেছে।

রডারিক রাগত স্বরে বললেন, তোমরা হয়ত তাদের প্রহরার যথাযথ ব্যবস্থা করোনি। তাই তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

তাদমীর–তাদের প্রহরার ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি করা হয়নি হুযুর। তদুপরি যুবকটিকে সব সময় বেঁধে রাখা হতো। তা সত্ত্বেও সে নিজেও পালিয়ে গেল এবং বিলকীসকেও নিয়ে গেল। এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার হুযুর।

রডারিক–তাদের কি সন্ধান করেছ?

তাদমীর–ক্রমাগত তিন দিন তাদেরকে খোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাইনি।

রডারিক–সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে হাতছাড়া করলে।

তাদমীর–হুযুর, আমি এ জন্যে খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

রডারিক কঠোর সুরে বললেন, এখন তোমার প্রথম কর্তব্য হলো সেই সুন্দরীকে খুঁজে বের করা।

তাদমীর–আমিও তা–ই চিন্তা করছি।

রডারিক–ঠিক আছে, সৈন্যদের এই নির্দেশ দিয়ে দাও।

তাদমীর–তা–ই হবে।

রডারিক সেখান থেকে চলে গেলেন। তাদমীর রডারিকের নির্দেশটি সকলকে অবহিত করেন। পরদিন সকালেই তাদমীর তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওয়াদী–আল–কাবীয়ের দিকে যাত্রা করেন।

একুশ

সাহায্যকারী বাহিনী

তাদমীরের কোন হদিস না পেয়ে আমামন ও তার সঙ্গে গমনকারী মুসলিম মুজাহিদরা ফিরে এলেন। তাতে তারিক ও মুজাহিদরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে সে রাত অতিবাহিত করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিখোঁজ মুসলিম মুজাহিদের অনুসন্ধান শুরু হলো। প্রথমে আমামনের কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাওয়া হলো। আমামন জানালেন, তার কাছে সকল আরবকেই একরূপ বলে মনে হয়। সুতরাং তার পক্ষে সে মুজাহিদটির বিশেষ কোন চিহ্ন উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

অতঃপর সকল মুজাহিদের হাযিরা নেয়া শুরু হলো। দুপুরের দিকে জানা গেল যে, সে মুজাহিদটির নাম ইসমাঈল। তিনি ছিলেন পঁচিশ জন সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রথমে সকলেরই ধারণা ছিল, তিনি হয়ত তারিকের সঙ্গে রয়েছেন। কারণ, তারিক ইসমাঈল ও মুগীছকে খুবই বিচক্ষণ ও সাহসী বলে মনে করতেন। তাঁদের মধ্যে মুগীছ ছিলেন প্রৌঢ় আর ইসমাঈল ছিলেন যুবক।

তারিক যখন জানতে পারলেন যে, তাদমীর ইসমাঈলকে ধরে নিয়ে গেছে, তখন তিনি খুবই দুঃখিত হন। তিনি আমামনকে ডেকে পাঠান এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন।

আপনি কি বলতে পারেন, তাদমীর কোনদিকে পালিয়েছে?

আমামন–না জনাব, যেসব স্থানে গিয়েছে বলে আমার ধারণা ছিল সেসবের প্রত্যেকটিতে তালাশ করেছি; কিন্তু কোন হদিস পাইনি।

তারিক–সে কোন্ দিকে যেতে পারে, সে সম্পর্কে আপনার ধারণা?

আমামন–আমার মনে হয়, সে হয়ত কর্ডোভায় যাবে।

তারিক–কর্ডোভা এখান থেকে কতদূর?

আমামন–অনেক দূর জনাব।

তারিক–পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ কোন্ কোন্ স্থান রয়েছে?

আমামন–আলজাযারের ও সেডোনা।

তারিক–কোন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে কি?

আমামন–না জনাব।

তারিক–কোন দুর্গ?

আমামন–তেমন কোন দুর্গ নেই।

তারিক–কোন যুদ্ধলিপ্সু জাতির বসতি?

আমামন–আপনাদের শত্রু তো সর্বত্রই।

তারিক–তাহলে তো তারা আমাদের মুকাবিলা করবে।

আমামন–স্পেনের সর্বত্রই হয়ত আপনাদের মুকাবিলার সম্মুখীন হতে হবে।

তারিক–কিন্তু এ দিকে তো কোন সীমান্ত চৌকি নেই?

আমামন– এ দিকে সমুদ্র। খ্রিস্টানদের ধারণা এ দিক থেকে তাদের কোনরূপ হামলা হবে না।

তারিক–তাহলে তাদমীর এখানে কি করছিল?

আমামন-এটি একটি আকস্মিক ঘটনা জনাব।

তারিক–আচ্ছা, এখন আমরা কোন্ দিকে যাব?

আমামন–কর্ডোভার দিকে।

তারিক–আপনি কি নিশ্চিত যে, তাদমীর কর্ডোভা যাবে?

আমামন–জী হাঁ, আমার নিশ্চিত ধারণা সে কর্ডোভা হয়ে টলেডো যাবে।

তারিক–টলেডো কি স্পেনের রাজধানী?

আমামন–জী হাঁ।

তারিক–কর্ডোভায় কি অনেক সৈন্য রয়েছে?

আমামন–সৈন্য হয়ত তেমন বেশী নেই। তবে সেখানকার দুর্গ অত্যন্ত সুরক্ষিত।

তারিক–দুর্গে প্রবেশ করার কোন গোপন পথ আপনার কি জানা আছে?

আমান–না জনাব?

তারিক–অর্থাৎ কোন গোপন পথই নেই, না আপনারই জানা নেই?

আমামন–আমার জানা নেই জনাব।

তারিক–আচ্ছা, আপনি কি আমাদের সঙ্গে থাকতে চান?

আমামন–আমি এখন আপনাদের ছেড়ে কোথায় যাব?

তারিক–আফসোস, আপনার কন্যা হাতে এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল।

আমামন–আমারই নির্বুদ্ধিতা জনাব

তারিক–সেটা কিরকম?

আমামন–আমি তাড়াহুড়ো করে কেবল একজন মুজাহিদকে সেদিকে নিয়ে গেলাম।

তারিক–হাঁ, এটা আপনার ভুল হয়েছে। আরো কাউকে নিয়ে গেলে হয়ত আপনার কন্যাও হাতছাড়া হতো না এবং আমরা একজন মুজাহিদকে হারাতাম না।

আমামন–আমার ধারণা ছিল, তখন হয়ত তাঁবুতে কোন সৈন্য নেই। এত শীঘ্র তারা পরাজয় বরণ করবে আমি সেটা আঁচ করতে পারিনি।

তারিক–খ্রিস্টানেরা যদি তাদের পিছু ধাওয়ার ভয়ে ইসমাঈলকে হত্যা করে?

আমামন–তাহলে সে মুসলমানদের জন্য খুবই দুঃখের কারণ হবে।

তারিক–হাঁ, দুঃখ তো বটেই, তবে........

আমামন–তবে অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবেন।

তারিক–হাঁ, ইসমাঈলকে হত্যা করা হলে সেখানে উপস্থিত তাদের সকলকে হত্যা করা হবে।

আমামন–আর যদি আমার কন্যা বিলকীসকে হত্যা করা হয়?

তারিক–তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে এবং তাদের সকলকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে।

আমামন শুনে খুবই খুশী হলেন। তিনি বললেন, মজলুমদের প্রতি আপনারা কতইনা সহায়ক। ইতিমধ্যে মুজাহিদরা আহার শেষ করে বেরিয়ে আসলেন। তারিক আর দেরী করা সমীচীন নয় বলে সকলকে যাত্রার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র সবাই রওয়ানা দিলেন।

তাড়াতাড়ি কর্ডোভায় পৌছার উদ্দেশ্যে তাঁরা দ্রুত এগুচ্ছিলেন; কিন্তু কর্ডোভা ছিল অনেক দূর। তাদের পথ যেন শেষ হচ্ছিল না। তাদমীরের পরাজয় ও পলায়নের সংবাদ আলজাযায়ের ও সেডানার অধিবাসীদের কাছেও পৌছে গিয়েছিল। তাতে অধিবাসীরা খুবই ভীত হয়ে পড়েছিল এবং এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে সে সব এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাই সে সব এলাকায় কোন মুকাবিলা তো দূরের কাথা, মুজাহিদরা কোন খ্রিস্টানেরই সাক্ষাৎ পেলেন না। তাঁদের রসদপত্রের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সমগ্র অঞ্চলটি জনশূন্য হওয়ায় রসদ সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যক্রমে সে সময় ফসল পেকে আসছিল। মুজাহিদরা প্রয়োজন মত সেখান থেকে আহার্য সংগ্রহ করতেন। তাছাড়া তাঁরা স্থানে স্থানে আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল পাচ্ছিলেন। তাঁরা সেসবও খেতেন। তাঁরা একে একে আলজাযারের ও সেডোনা সংলগ্ন অঞ্চলগুলো জয় করে লা-জাণ্ডা ঝিলের নিকট গিয়ে পৌছলেন। ২৮ শে রমযান ৯২/জুলাই ৭১১ সালে লা-জাণ্ডা ঝিলের নিকটবর্তী একটি ছোট নদীর তীরে গিয়ে পৌছেন। তারা দেখতে পান, সামনের বিরাট প্রান্তর জুড়ে খ্রিস্টান সৈন্যদল তাঁবু খাটিয়ে পড়ে আছে।

যতদূর দৃষ্টি যায় তাঁবুর সারি আর সারি। মুজাহিদরা এ বিরাট সৈন্যদল দেখে কিছুটা দমে গেলেন। তারিক তা বুঝতে পেরে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিম ভাইগণ! আমি বুঝতে পেরেছি যে, বিরাট সৈন্যদল দেখে তোমরা কিছুটা ঘাবড়ে গেছ; কিন্তু মনে রাখা উচিত, তোমরা এমন এক জাতির সন্তান, যাঁরা শাম দেশের ন্যায়

শক্তিশালী রাজ্যকে তছনছ করে দিয়েছে। শত্রুসৈন্য বেশি হলে এক লাখ হবে; অথচ তোমাদের ছয় হাজার ছয় লাখের মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। তিনি অবশ্যই তোমদেরকে বিজয় দান করবেন। তাঁর এ সংক্ষিপ্ত ভাষণ সৈন্যদেরকে খুবই প্রভাবিত করে। নদীতীরে তাঁরাও তাঁবু ফেললেন। তাঁদের তাঁবুর সংখ্যা কম হলেও সেগুলো এমনভাবে খাটানো হলো যে, দূর থেকে চারগুণ মনে হলো। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে খুবই অনন্দিত হলো। তারা ভাবল যে, প্রথম আক্রমণেই তাদেরকে খতম করে ফেলবে। মুসলমানরা সারা রাত জেগে কাটালেন। তাদের ধারণা ছিল, খ্রিস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে বের হবে; কিন্তু তারা বের না হওয়ায় মুজাহিদরা তাঁবুতেই অবস্থান করলেন।

পরদিন ছিল ঈদুল ফিতর। সফরে থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদরা রোযা রেখেছিলেন। ঈদের সকালে দু'রাকআত নামায আদায় করে তাঁরা ঈদ উদযাপন করেন; সেদিনও খ্রিস্টানরা ময়দানে বেরোল না। তাতে তারিক ভাবলেন, খ্রিস্টানরা হয়ত আরো সৈন্য আগমনের অপেক্ষা করছে। সেদিনই বিকেলে মুসলমানরা তাদের পশ্চাৎদিকে গোধূলি দেখতে পেলেন। মুসলমানরা ভাবলেন, তাদের জন্যই হয়ত খ্রিস্টানরা অপেক্ষা করছিল। তাঁরা তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন; কিন্তু ক্রমে নিকটবর্তী হলে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুজাহিদরা দেখতে পেলেন এরা আরব পোশাক পরিহিত। সুতরাং তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মূসা তাঁদের সাহায্যার্থে এ সৈন্যদল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুললেন। এ দলের সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। সব মিলিয়ে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো বার হাজার। নবাগতরাও পুরনোদের সাথে অবস্থান নিল। সে রাত মুসলমানরা বেশ হাসিখুশীতে কাটালেন।

বাইশ

একটি সুন্দর প্রতিকৃতি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদমীর বিলকীসের বন্ধন খুলে দিয়েছিল। তাতে তিনি ইচ্ছেমতো চলাফেরা করতে পারতেন; কিন্তু বিলকীস তাঁবুর বাইরে কোথাও যেতেন না, বরং ভিতরেই কাটাতেন। তাদমীরের সৈন্যদল যাত্রা শুরু করলে বিলকীসও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। তিনি জানতেন, তাকে রডারিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি চেষ্টা করছিলেন, একটু সুযোগ পেলেই ইসমাঈলকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন। ইতিপূর্বে তিনি তা ইসমাঈলকে বলেও রেখেছেন। খ্রিস্টান সৈন্যদল যেদিন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিল, সেদিন বিলকীস সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আজই তিনি পালিয়ে যাবেন। তাই সেদিন রাতের আহার শেষ করে তিনি সকাল সকালই শুয়ে পড়েন। প্রহরীরা তার তাঁবুতে উঁকি মেরে দেখতে পেলো, বিলকীস শুয়ে পড়েছেন। তারাও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক মধ্যরাতে বিলকীসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বাইরে বেরিয়ে আসলেন। চাঁদনি রাত, বাইরে চাঁদের উজ্জ্বল আলো। তিনি দেখতে পেলেন, তার তাঁবুর প্রহরীরা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। তাদের পাশে পড়ে রয়েছে খোলা তলোয়ার। চারদিক নীরব, নিথর–যেন সারা বিশ্বই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চাঁদ তখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছিল। তখন মনে হচ্ছিল, চাঁদ যেন উদার দৃষ্টি দিয়ে ঘুমন্ত বিশ্বকে অবলোকন করছে।

বিলকীস তার তাঁবুতে ফিরে আসলেন এবং ঘুমের পোশাকের উপর তার পরিধেয় কাপড় পরে নিলেন। অতঃপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এক পা-দু'পা করে এগুতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে কি মনে করে আবার তাঁবুতে ফিরে গেলেন। প্রহরীদের একটি তলোয়ার তুলে নিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসলেন।

বিলকীস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রহরীদের পাশ কেটে এগুচ্ছিলেন। তিনি বিভিন্ন তাঁবুর আড়াল দিয়ে ইসমাঈলের তাঁবুর দিকে যেতে লাগলেন। তিনি দিনেই ইসমাঈলের তাঁবুর অবস্থান জেনে নিয়েছিলেন। তাঁর তাঁবুতে পৌছে দেখতে পান, ইসমাঈলও প্রহরীদের সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিলকীস ইসমাঈলকে রাতে সতর্ক

থাকার কথা বলেছিলেন; কিন্তু তাঁকে ঘুমন্ত দেখে বিলকীস কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। কারণ খ্রিস্টানরা ইসমাঈলকে এত কড়া পাহারায় রেখেছিল যে, তাঁর শৃংখলের রজ্জুকে তারা তাদের কোমরে বেঁধে রেখেছিল। যাতে ইসমাঈল একটু নড়াচড়া করলেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়।

বিলকীস ইসমাঈলের কাছে গিয়ে আস্তে একটু কাশি দিলেন। কাশির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইসমাঈলের ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং মাথার কাছে তিনি বিলকীসকে দেখতে পেলেন। বিলকীস তার উপর ঝুঁকে পড়ে তলোয়ার দিয়ে দ্রুত বন্ধন কাটতে লাগলেন এবং নিমিষেই সব বন্ধন কেটে তাঁকে উঠে আসতে ইঙ্গিত করেন।

ইসমাঈল বুঝতে পারেন যে, একটু শব্দ হলেই প্রহরীরা জেগে উঠেবে। তাই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উঠে এলেন, যেমন করে কোন মা তার সন্তানের নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে আসেন।

ইসমাঈল তাঁর পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসেন এবং আনন্দের আতিশয্যে বিলকীসের হাতের দু'টি আঙ্গুল নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বলতে থাকেন, তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব–তা ভেবে পাচ্ছিনে। বিলকীস তার নিজ তর্জনী স্বীয় নরম ঠোঁটে চেপে ধরে চুপ করার ইঙ্গিত করেন এবং ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, এখন ধন্যবাদ জানানোর সময় নেই। দয়া করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসুন। তার কথামত ইসমাঈল বিলকীসের পেছনে পেছনে দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে ইসমাঈল বিলকীসের কাঁধ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বললেন, তোমার তলোয়ারটি আমার হাতে দাও। বিলকীস অনুচ্চস্বরে বললেন, এখন তলোয়ার দিয়ে কি করবেন?

ইসমাঈল–কেউ যদি জেগে উঠে, তবে তাকে স্তব্ধ করে দেব।

বিলকীস–তাতে তো অন্যরাও জেগে উঠতে পারে।

ইসমাঈল–তুমি নিশ্চিত থাক, তলোয়ারটি আমি তখনই ব্যবহার করবো যখন দেখবো যে, এ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

বিলকীস–আমি এটাই চাচ্ছি। এই বলে বিলকীস তলোয়ারটি ইসমাঈলের হাতে দিয়ে দিলেন। ইসমাঈল তলোয়ারটি উঁচু করে তুলে ধরলেন। তা দেখে বিলকীস বললেন, আপনি এ কি করছেন?

ইসমাঈল–ঘাবড়িয়ো না, আমি এর তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করছি।

বিলকীস–দয়া করে এখন এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছেড়ে দিন।

ইসমাঈল মুচকি হেসে বললেন, আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। তোমার নির্দেশমতো তা-ই হবে।

বিলকীসও তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁবুর এলাকার বাইরে চলে আসলেন। এখন আর তাঁদের ততো সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু

কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ঘুমন্ত এক খ্রিস্টান সৈনিকের পায়ের সঙ্গে ইসমাঈলের পায়ের ধাক্কা লেগে গেল। অমনি সে উঠে বলে উঠল, কে রে নির্বোধ?

তার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ইসমাঈল তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলেন। সিপাহীটা ইসমাঈলের হাতে খোলা তলোয়ার দেখে ঘাবড়ে গেল। হাত জোড় করে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে রইল। ইসমাঈলের চেহারা ও পোশাক দেখে সে আরো ঘাবড়ে গিয়েছিল।

ইসমাঈল বুঝতে পারলেন, তিনিও সিপাহীটির কথা বুঝবেন না এবং সিপাহীও তাঁর কথা বুঝবে না; এখানে অযথা দেরী করলে অন্যরা হয়ত জেগে উঠতে পারে। তাই সিপাহীটিকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। সিপাহীটিও চুপচাপ পড়ে রইল এবং এক সময় আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতের ঘটনাটি কারো কাছে বলল না; কারণ তার মনে ভয় ছিল যে, তাদমীর ঘটনাটি জানতে পারলে তাকে হয়ত শত্রুদের সহায়তার অভিযোগে হত্যা করে ফেলবে।

যাহোক, ইসমাঈল ও বিলকীস মাঠ ছেড়ে পাহাড়ে উঠে এলেন। সেখান থেকে শত্রুছাউনি ছিল অনেক দূরে। তাই তাঁরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ইসমাঈল বিলকীসকে লক্ষ্য করে বললেন, এই সাহসিকতার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিলকীস বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ধন্যবাদ জানানোর কোন প্রয়োজন নেই।

ইসমাঈল লক্ষ্য করলেন, বিলকীসের চেহারা দেখে তাকে বোকা বোকা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে বোকা নয়; সে অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। বন্দী ছিল বলে হয়ত তাকে বোকা মনে হতো। বিলকীস বললেন, আপনাকেই বরং আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।

ইসমাঈল–কেন, তুমি কি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য নও?

বিলকীস–নিশ্চয়ই না।

ইসমাঈল–কিন্তু............

বিলকীস–এসব আলাপ ছেড়ে পথ চলুন; কারণ শত্রুদের পশ্চাদানুসরণের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসমাঈল–তুমি তো দেখছি অত্যন্ত চতুর।

বিলকীস–তাতে আপনার কি?

ইসমাঈল–তুমি এত মুখপোড়া কেন?

বিলকীস–তা কেন বলব?

ইসমাঈল–কারণ তুমি সুন্দরী।

বিলকীস–এসব আলাপ ছেড়ে এখন ভাবুন আমরা কোথায় যাব?

ইসমাঈল–আমি তো এদেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না।

বিলকীস-আমি সব চিনি, তাই তো?

ইসামইল-তাহলে আমরা এখন কোথায় যাব?

বিলকীস-চলুন, আমরা আবার শত্রুছাউনিতে ফিরে যাই।

ইসামইল-ওমা, একি বলছ তুমি!

বিলকীস খুব ভয় পেয়ে গেলেন দেখছি। আপনি পুরুষ হলেন কেন?

ইসমাঈল-কেন আমি কি হবো?

বিলকীস-যা হওয়া উচিত ছিল।

ইসমাঈল-আমি তো তা-ই হয়েছি।

বিলকীস-হাঁ, আপনি কচু হয়েছেন।

এসব আলাপ-আলোচনায় তারা এতই বিভোর ছিলেন যে, অন্য কোন দিকেই তাদের কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। চাঁদের আলোয় শুধু একের পর এক টিলা অতিক্রম করে উঁচু চূড়ায় উঠে গেলেন। ইসমাঈল ছিলেন আগে এবং বিলকীস তার পেছনে। তাঁরা যখন চূড়ায় পৌঁছলেন, তখন চাঁদ ডুবুডুবু অবস্থা। পূর্বাকাশে সূর্যের আগমন লক্ষ্য করা গেল। ইসমাঈল বললেন, এখন ভোর হয়ে আসছে। শত্রুরা আমাদের তালাশে এদিকে আসতে পারে।

বিলকীস-আমরা এখন কোথায় এসেছি তা দেখে নিন।

ইসমাঈল লক্ষ্য করলেন, তারা কয়েকশত' ফুট উপরে উঠে এসেছেন।

তিনি বিস্ময়ের সুরে বললেন, আমরা এত উঁচুতে আসলাম কি করে?

বিলকীস-আমরা এসে তো গেলাম; কিন্তু এখন নামবো কি করে?

ইসমাঈল-যিনি উপরে নিয়ে এসেছেন, তিনিই নামিয়ে নেবেন।

সে সময় সূর্য উঠে গেছে। তারা উভয়ে একটি পাথর আড়াল করে বসে পড়লেন। খ্রিস্টানরা ধারণা করল যে, এত উঁচুতে হয়ত তারা উঠতে পারবে না, তাই সেদিকে যাওয়ার চিন্তাই করেনি; বরং নিচ থেকেই তালাশ করে চলে গেছে।

তেইশ

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

রডারিক দেখতে পেলো আরো নতুন সৈন্য এসে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখন মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাই সে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল, নতুন সৈন্য আসার আগেই তাদের উপর আক্রমণ রচনা করা উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে রডারিকের ধারণা ছিল যে, মুসলমানরা হয়ত এমনিতেই রসদপত্রের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাবে; কিন্তু ইতিমধ্যে আরো নতুন সৈন্য এসে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় খ্রিস্টানদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হলো। তারা আশংকা করল, যুদ্ধ বিলম্বিত হলে নতুন নতুন সৈন্যদল হয়ত এভাবে আসতেই থাকবে।

অতএব ২রা শাওয়াল (৯২ হিজরীর) সকালেই খ্রিস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে এসে জমায়েত হতে শুরু করল। খ্রিস্টান ও মুসলিম সৈন্যদলের অবস্থানের দূরত্ব ছিল ৩-৪ মাইল। স্থানটি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় সারা ময়দান জুড়ে সহস্রাধিক টিলা বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া সমগ্র ময়দান জুড়ে অবিন্যস্তভাবে দাঁড়ানো ছিল অনেক বৃক্ষ।

খ্রিস্টান সৈন্যদের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে রণবাদ্য বেজে উঠল। অশ্বারোহী খ্রিস্টান সৈন্যরা তাদের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে জয়ধ্বনি দিতে দিতে যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হতে লাগল।

মুসলিম মুজাহিদরাও ফজরের নামায পড়ে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে যেতে লাগল এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে শুরু করল। মুসলমানদের কাছে কেবল 'আটশত' অশ্ব ছিল। সেগুলোও তারা তাদমীরের পরাজিত সৈন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল। একটি অশ্বের উপর তারিক, অপরটির উপর মুগীছ এবং অন্যগুলোর উপর অপরাপর মুসলিম মুজাহিদ আরোহণ করেছিল। বারো হাজার সৈন্যের মধ্যে বাকীরা সবাই ছিল পদাতিক।

নবাগত মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশই ছিল লাঠিধারী। তারা লাঠি দ্বারাই যুদ্ধ করত।

মুসলিম বাহিনীর সবার কাছে ঢাল, তলোয়ার বা বর্শা ছিল না। বলতে গেলে তারা ছিল নিরস্ত্র। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা ছিল সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তদুপরি তারা সকলেই ছিল নিয়মিত যোদ্ধা; কিন্তু মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশই ছিল সাধারণ লোক। কেবল জিহাদের আগ্রহই তাদেরকে স্বদেশ থেকে এত দূরদেশে নিয়ে এসেছিল এবং অস্ত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও তারা জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট বারো হাজার এবং খ্রিস্টান সৈন্যসংখ্যা ছিল নব্বই হাজার। সুতরাং খ্রিস্টান সৈন্যসংখ্যা ছিল মুসলিম সৈন্য সংখ্যার প্রায় আট গুণ। সৈন্যসংখ্যা কিংবা অস্ত্রশস্ত্র কোন দিক দিয়েই খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের তুলনা ছিল না। মুসলমানরা কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, বিজয় একমাত্র আল্লাহর হাতে।

মুসলমানরাও যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন, খ্রিস্টানদের তাঁবু থেকে একটি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ী বেরিয়ে আসছে। চারটি ঘোড়া গাড়ীটিকে টেনে নিয়ে এসেছিল। গাড়ীটি ছিল রৌপ্য নির্মিত। গাড়ীর একটি রেশমী গদিতে রডারিক উপবিষ্ট ছিলেন। তারিক মুজাহিদদের সারি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিম মুজাহিদগণ! তোমরা মনে করো না যে তোমরা নিরস্ত্র এবং খ্রিস্টানরা সুসজ্জিত। এটা ঠিক যে, খ্রিস্টানরা সংখ্যায় অধিক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই মুসলমানদেরকে এমতাবস্থায়ই বিজয় দান করেন। জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন।

আল-কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মুসলমানদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন। তা কতই না সহজ ও ভাল সওদা। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকেরই মৃত্যু অবধারিত। অতএব জিহাদে শরীক হয়ে জীবনদানে বাধা কোথায়?

শহীদদের প্রতিদান জান্নাত। সুতরাং জান্নাতের চাইতে উত্তম প্রতিদান আর কি হতে পারে?

পৃথিবীর ইতিহাস মুসলমানদের কীর্তি-কাহিনীতে ভরপুর। প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই মুসলমানরা জয়লাভ করেছে। কেননা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন তিনি মুসলমানদের সাহায্যকারী। আর আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী তাদের জয় তো অবশ্যম্ভাবী। তাই আমরা বিশ্বাস করি, আমরা অবশ্যই জয়লাভ করবো। তোমরা সিংহপুরুষদের বংশধর। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষ শত্রুদের খতম করো।

তারিক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করেই দেখতে পেলো, খ্রিস্টান সৈন্যরা উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় সামনে এগিয়ে আসছে। তাদের অগ্রসরমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারা হয়ত মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিম মুজাহিদদের পায়ের তলায় পিষে মারবে। খ্রিস্টান সৈন্যদের সারি পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মুগীছকে ডানে

এবং তাহিরকে বামে রেখে তারিক নিজে পশ্চাদভাগে নিয়োজিত হন। খ্রিস্টান সৈন্যরা রণবাদ্যের তালে তালে দ্রুত সামনে এগুতে লাগল।

তারিকও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলিম মুজাহিদরা সামনে এগুতে লাগলেন। তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে। সমগ্র রণাঙ্গনে সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়েছে। আলোকরশ্মিতে সিপাহীদের পোশাক ঝিকমিক করছিল। উভয় সৈন্যদলই ধীরে ধীরে সামনে এগুনোর ফলে উভয় দলের মধ্যকার দূরত্ব কমে আসছিল। খ্রিস্টান সৈন্যদের সারি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকায় ডান দিকের সৈন্যরা বাঁ দিকে এবং বাঁ দিকের সৈন্যরা ডানদিকে দেখতে পেত না। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তারা তীরের মাধ্যমে যুদ্ধ করবে; কিন্তু খ্রিস্টানরা তীর দ্বারা যুদ্ধ করে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিল না। মুসলমানরা তা বুঝতে পেরে তারা বর্শা উঁচিয়ে ধরলেন। খ্রিস্টানরাও আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। পূর্ণোদ্যমে বর্শা নিক্ষেপ শুরু হলো। খ্রিস্টানরা প্রথম থেকেই নানা প্রকার হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছিল।

আক্রমণ শুরু করার পূর্বে তারিক তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। তৃতীয় তাকবীরের সময় সকল মুজাহিদও তাতে শরীক হন। অতঃপর একযোগে আক্রমণ শুরু হলো। মুসলমানরা ছিল পাথরের ন্যায় অটুট ও সুদৃঢ়। তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। খ্রিস্টানরা দ্বিতীয়বারের মতো হামলা চালালে মুসলিম মুজাহিদরা তাও প্রতিহত করেন এবং পাল্টা আক্রমণ চালান। প্রথম অক্রমণেই মুজাহিদরা অনেক খ্রিস্টানকে হত্যা করলো।

খ্রিস্টানদের অবস্থা টলটলায়মান। অসংখ্য খ্রিস্টান হতাহত হতে লাগল এবং উহ্-আহ্ করতে করতে একের পর এক ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়তে লাগল। এ অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আরো ক্ষিপ্রগতিতে হামলা চালালো; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তীব্রতার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হলো না। তারা যেরূপ দৃঢ়তা নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিল, সেভাবেই যুদ্ধ করে চলল। যতদূর পর্যন্ত সৈনিকরা প্রসারিত ছিল যুদ্ধও ততদূর ছড়িয়ে পড়ল; কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রথম সারির মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চাতের সারির সৈন্যরা আক্রমণের অপেক্ষায় ছিল। খ্রিস্টানদের প্রথম সারির কোন সৈন্য মারা গেলে পেছনের সারি থেকে অন্য একজন এসে তার স্থান পূরণ করতো; কিন্তু মুজাহিদদের দ্বিতীয় সারির কোন সৈন্যকেই সামনে আসার প্রয়োজন হয়নি। কারণ প্রথম সারির মুজাহিদরা চাচ্ছিল যে, তারা শীঘ্রই খ্রিস্টানদের প্রথম সারিকে সাফ করে ফেলবে। তাছাড়া অশ্বারোহী খ্রিস্টানরা যাতে পদাতিক মুজাহিদদের কাছে পৌঁছতে না পারে, এজন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বর্শা-যুদ্ধ সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়ায় উভয় পক্ষই বর্শা ছেড়ে তলোয়ার ধরলো। শুভ্র-স্বচ্ছ তলোয়ার সূর্যের আলোকছটায় ঝিকমিক করে উঠলো।

যুদ্ধের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের উঠানামাও দ্রুততর হলো। ঢাল দ্বারা তলোয়ারের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা চলল; কিন্তু খ্রিস্টানদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে লাগল। মুজাহিদদের প্রবল আক্রমণে খ্রিস্টানদের হস্ত-পদ-শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে লাগল। সূর্যের তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রবলতাও বৃদ্ধি পেলো। খ্রিস্টানদের প্রথম সারির সৈন্য প্রায় সকলেই একে এক মৃত্যুবরণ করল। আরোহীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল।

মুসলিম মুজাহিদরা সহিসবিহীন সেসব ঘোড়া ধরে ফেলেন এবং এগুলোর পিঠে আরোহণ করেন। ইতিমধ্যে এলোপাতাড়ি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদের মধ্যে ও খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারদিকে তখন তুমুল যুদ্ধ এবং তলোয়ারের দ্রুত উঠা-নামায় সারা রণাঙ্গনে এক অপূর্ব দৃশ্য বিরাজ করছে। আরোহীদের অবস্থান ও তলোয়ারের দ্রুত উঠা-নামা দেখে মনে হচ্ছিল যেন শস্যক্ষেত্র থেকে ফসল কাটা হচ্ছে।

খ্রিস্টানরা প্রথম থেকেই হৈ চৈ করে আসছিল। তাদের শোরগোলের আওয়াজ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; কয়েক মাইল জুড়ে তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। খ্রিস্টান সৈন্যরা তখনও বিপুল উত্তেজনা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে, অতি শীঘ্রই মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। কিন্তু মুসলমানরা এমন লৌহপ্রাচীর গড়ে তুলেছিল যে, না তাদের মৃত্যু হচ্ছিল, না তারা পিছপা হচ্ছিল। একবার তারা যে খ্রিস্টানটির উপর আক্রমণ চালাতো, তাকে হত্যা না করে ছাড়তো না। তাদের নাঙ্গা তলোয়ারের আঘাতে ঢাল দ্বি-খণ্ডিত হয়ে শত্রুদের মাথায় গিয়ে আঘাত হানতো।

একদিকে মুগীছ আর-রূমী, অপর দিকে তারিক আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। তাঁরা যেদিকেই অগ্রসর হতেন, সে দিকেই একের পর এক শত্রুসৈন্যকে নিধন করতেন। এভাবে বহু শত্রুসৈন্য নিহত হলো। সর্বাধিক উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন সেনাপতি তারিক। তাঁর এক হাতে ছিল পতাকা, অপর হাতে তলোয়ার। তার ক্ষিপ্র আক্রমণ শত্রুদের মধ্যে এমন ভয়ের সৃষ্টি করছিল যে, কেউই তাঁর সামনে আসার সাহস করতো না।

বেলা দ্বি-প্রহর হয়ে এসেছে। তীব্রগতিতে যুদ্ধ চলছে। একদল অপর দলের মধ্যে ঢুকে একাকার হয়ে পড়েছে। খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা হয়ত তাদের ঘোড়ার পায়ের আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; কিন্তু দেখা গেল, পদাতিক মুজাহিদদের বর্শার আঘাতে অশ্বারোহী খ্রিস্টানরাই একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগল। খ্রিস্টানরা বুঝতে পারল পদাতিক মুজাহিদরা অশ্বারোহী খ্রিস্টানদের চাইতেও বজ্র-কঠিন। পদাতিক মুসলমানরা যে অশ্বকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করতো, সে অশ্বই পায়ে আঘাত লেগে

মৃত্যুবরণ করতো সঙ্গে সঙ্গে আরোহীও ধরাশায়ী হতো। আবার যে আরোহীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করত, তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে অপর পাশ দিয়ে তীর বেরিয়ে যেতো। আর আরোহী চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তো

স্থানে স্থানে খ্রিস্টানদের ছিন্ন দেহ স্তূপাকারে পড়ে আছে এবং রক্তের স্রোত বইছে। খ্রিস্টানরা লক্ষ্য করছিল, এককভাবে তাদেরই মৃত্যু হচ্ছিল; অপরপক্ষে মুসলমানদের মৃত্যুর হার ছিল এতই নগণ্য যে, তা বোঝাই যাচ্ছিল না। কোন মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করলেও তাঁরা কমপক্ষে দশ-পনেরো জন শত্রুসৈন্য নিধন করে তারপর শহীদ হতেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একই গতিতে যুদ্ধ চলল। উভয় দল যদিও আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, আজকেই চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলবে, তথাপি সন্ধ্যা হয়ে আসায় তা আর সম্ভব হলো না। উভয় পক্ষই বাধ্য হয়ে যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলো।

দ্বিতীয় ভাগ

এক

বিলকীস হারিয়ে যাওয়া

ইসমাঈল ও বিলকীস উভয়েই পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় উঠে গিয়েছিল। তাদমীরের অনুচররা যতক্ষণ তাদের তালাশ করছিল, তারা পাহাড়ের উপরেই লুকিয়ে ছিল। শত্রুরা চলে গেলে তাঁরা স্বস্তিবোধ করেন এবং তখন নিচে নেমে আসার পথ খুঁজতে লাগলেন; কিন্তু অন্ধকারে শত্রুসৈন্যের ভয়ে তারা যে চূড়ায় উঠেছিলেন, তা ছিল খাড়া-উঁচু। কিন্তু এখন সেখান থেকে নিচে নেমে আসা কষ্টকর হয়ে পড়ল। সেখান থেকে নিচের দিকে তাকাতেও ভয় করছিল। বিলকীস বললেন, আমরা নামব কি করে?

ইসমাঈল বললেন, আমরা যে পাশ দিয়ে উঠে এসেছি সেখান দিয়ে তো দেখছি নিচে নামা যাবে না।

বিলকীস–কিন্তু আমরা উঠলাম কি করে?

ইসমাঈল–শত্রুর ভয়ে রাতের অন্ধকারে উঠে এসেছিলাম, কিন্তু এখন...........।

বিলকীস বললেন, কিন্তু কিসের?

ইসমাঈল–আমার উঠা তো তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়; কিন্তু তোমার............

বিলকীস–আমি কি করে উঠলাম, এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার, তাই তো?

ইসমাঈল–হ্যাঁ।

বিলকীস–ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কেন?

ইসমাঈল–কারণ তোমরা স্পর্শকাতর, দুর্বল। তাই তোমার পক্ষে খাড়া চূড়ায় উঠা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।

বিলকীস আনমনা হয়ে বললেন–কেন আমি কি মানুষ নই?

ইসমাঈল–মানুষ! তুমি কি মানুষ?

বিলকীস–তাহলে কি?

ইসমাঈল–আমি কি করে বলব যে তুমি কী?

বিলকীস অভিমানের সুরে বললেন–যান, আপনার সাথে আমার আর কোন কথা নেই।

ইসমাঈল বিস্মিত হয়ে বললেন—কেন, আমি কি কসুর করেছি?

বিলকীস—আপনি কি বুঝতে পারছেন, আমি কি বলছি?

ইসমাঈল যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছ। আমি যেন মাঝে-মধ্যে নিজেই নিজের মাঝে হারিয়ে যাই, যেন কিছুই বুঝতে পারি না। পাগলের মত হয়ত আজেবাজে বকেছি। তুমি কিছু মনে করো না।

বিলকীস বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

ইসমাঈল—তাই মনে করতে পারো।

বিলকীস—না না, এরূপ কথা মুখে আনবেন না, তাতে আমার ভয় হয়।

ইসমাঈল—কিসের ভয়?

বিলকীস—আল্লাহ্ না করুন আপনি যদি পাগল হয়ে যান, তাহলে আমার কি হবে?

ইসমাঈল—তোমার কোন ভয় নেই।

বিলকীস—কেন?

ইসমাঈল—কারণ আমার এ পাগলামী তোমারই রূপ-লাবণ্যের সৃষ্টি।

বিলকীস লজ্জিত হলেন। চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে। ইসমাঈল বিলকীসের লজ্জাবনত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উভয়েই তখন নির্বাক, নিশ্চুপ। বিলকীসের দৃষ্টি তখন দূরে, বহু দূরে। তিনি প্রকৃতির শ্যামলিমা উপভোগ করছেন। কিছুক্ষণ পর ইসমাঈল বিলকীসকে বললেন, তুমি এমনভাবে তাকিয়ো না, তাতে আমি আত্মহারা হয়ে যাই।

বিলকীস লজ্জা পেলেন। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে ইসমাঈলকে বললেন, আপনার কি এখানে থাকতে ভাল লাগছে?

ইসমাঈল—পাহাড়ের উঁচু চূড়া। চারদিকের সবুজ-শ্যামল দৃশ্য, রং-বেরঙের ফুলের সৌরভ এবং এর মাঝে তোমার উপস্থিতি স্থানটিকে একেবারে স্বর্গে পরিণত করেছে।

বিলকীস—আরে এ যে কবিত্ব দেখছি। আপনি কবি নাকি?

ইসমাঈল—প্রত্যেক আরবই জন্মগত কবি।

বিলকীস মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে কবি সাহেব, আমরা কিভাবে নামব এখন সে কথাই ভাবা যাক। যেখানে লোকজন নেই, সেখানে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না। চাই তা স্বর্গই হোক বা অন্য কিছু।

ইসমাঈল—এসো দেখা যাক কি করা যায়। এই বলে তাঁরা পথ চলতে শুরু করেন।

সমগ্র পাহাড়টি ছিল নানা প্রকার ফুল-ফলের বৃক্ষ দিয়ে ঢাকা। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজের সমারোহ।

এসব দলিত-মথিত করেই তাদেরকে এগুতে হচ্ছিল। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করতেন।

প্রকৃতি যেন সারা পাহাড়টিকে ফুলে-ফলে ভরে রেখেছিল। ফলে তাঁদের আহার্যের অভাব হলো না। যখনই ক্ষুধা পেতো, তখনই বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। এভাবেই তাঁরা সারাদিন পথ চলতেন। রাত হয়ে এলে কোন পাথরের উপর শুয়ে পড়তেন। আহার্য হিসেবে ফল-মূল তো পাওয়া যেতো; কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া গেল না।

এভাবেই গত হলো কয়েকদিন; কিন্তু পানির আর হদিস মিললো না। রসালো ফল ভক্ষণে পিপাসা সাময়িক নিবৃত্তি হতো বটে, কিন্তু তিষ্টা থেকেই যেতো; ফলে তারা পানির জন্য কষ্টানুভব করতে লাগলেন।

ইসমাঈল ছিলেন আরববাসী। তার উপর পুরুষ। তাই পানির কষ্ট তাঁর সহজাত ব্যাপার ছিল। ফলে কয়েকদিনের পিপাসায় তাঁর তেমন কষ্ট অনুভব হয়নি; কিন্তু বিলকীস তাতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই পানির পিপাসায় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর নরম ওষ্ঠদ্বয় শুকিয়ে গিয়েছিল। কাতরতায় তিনি ছটফট করছিলেন।

বিলকীসের নাজুক অবস্থা ইসমাঈলেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি তা দেখে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। রসালো ফল খাইয়ে তার পিপাসা লাঘবের চেষ্টা করছিলেন। বিলকীস নিজেও ধৈর্য ধারণের যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

বিলকীস নিজেও চাচ্ছিলেন তার কোন অস্থিরতা যেন ইসমাঈল বুঝতে না পারে। তাই তিনি জোর করে মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন যে, বেশি দূর হাঁটতে পারছিলেন না। কিছুদূর গিয়েই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তেন।

সমতল ভূমি হলে হয়ত পথ চলতে তেমন কষ্ট হতো না। একে তো খাড়া পাহাড়ী পথ, তদুপরি এদিক-ওদিক পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় সোজা পথে নামা সম্ভব ছিল না। কখনো উপরে উঠতে হতো আবার কখনো বা নিচে নামতে হতো। ফলে বিভিন্ন চূড়ার আড়ালে-আবডালে ঘুরেই তাদের দিন চলে যেতো।

কয়েকবার এমন হয়েছে যে, একই শৃঙ্গের চারপাশে একাধিকবার ঘুরেছেন; কিন্তু পথ পাননি এবং নামতে পারেননি। এভাবে ঘোরাঘুরি করেই তাদের কয়েক দিন কেটে গেল। এ সময় বিলকীসের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। পিপাসায় তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। একদিন দুপুরে আর পথ চলতে না পেরে একটি পাথরের উপর বসে পড়েন। সূর্য তখন ঠিক মধ্য গগনে। মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বিলকীসের রুক্ষ চুলগুলো উড়ে এসে তার সুন্দর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছিল এবং নরম ওষ্ঠে এসে ভিড় জমাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি ঢলে পড়লেন এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ইসমাঈলের বুঝতে বাকী রইল না যে, অতি পিপাসায়ই তার এ অবস্থা হচ্ছে। বিলকীসকে সেখানে রেখেই তিনি তৎক্ষণাৎ পানির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি এগুতে লাগলেন এবং ফিরে ফিরে পেছনে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর মনে আশংকা হচ্ছিল যে, বিলকীস হয়ত জেগে উঠতে পারে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটি টিলার আড়ালে পড়ে তিনি দ্রুত দৌড়াতে লাগলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পানির খোঁজ করছেন। তাঁর ধারণা ছিল হয়ত এখানে কোন ঝরনার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

তিনি যতই এগুচ্ছিলেন ততই সবুজ তৃণলতায় ঢাকা টিলার সন্ধান পাচ্ছিলেন এসব দেখে তাঁর ধারণা হলো, হয়ত নিকটেই কোথাও পানির ঝরনা রয়েছে। কিছুদূর এগিয়ে তিনি একটি ফাটল দেখতে পান। ফাটলটির কাছে গিয়ে দাঁড়ান। এবং ভেতরের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি দেখতে পান যে, ফাটলটির গভীরে অসংখ্য উজ্জ্বল পাথর টুকরো রয়েছে। এগুলো এতো দীপ্ত ছিলো যে, তাকানো যাচ্ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন, আল্লাহ্ তাঁকে হিরে-মুক্তোর খনিতে নিয়ে এসেছেন; কিন্তু এসব এত গভীর ছিল যে, তাঁর পক্ষে সেখানে নেমে ফিরে আসা সম্ভব হতো না।

ইসমাঈল ফাটলটি পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। আরো কিছু দূর এগিয়ে তিনি পানির আওয়াজ শুনতে পান। তার মন আনন্দে ভরে গেল। যে দিক থেকে শব্দ আসছিল, তিনি সে দিকেই যেতে লাগলেন। এভাবে অনেক দূর যাওয়ার পর পাহাড়ের প্রান্তে এসে দেখতে পেলেন, নিকটস্থ একটি উঁচু পাহাড় থেকে পানি নেমে আসছে এবং পাথর বেয়ে নিচে প্রবাহিত হচ্ছে।

স্থানটি ছিল তাঁর খুবই নিকটে। তাঁরও খুব পিপাসা পেয়েছিল, কিন্তু তিনি জানতেন, বিলকীস পানির পিপাসায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাই বিলকীসের আগে পানি পান করতে তাঁর লজ্জাবোধ হলো। ফলে তিনি পানি পান থেকে বিরত রইলেন।

তিনি দ্রুত বিলকীসের কাছে ফিরে আসলেন। কিন্তু বিলকীসকে অজ্ঞান অবস্থায় যে স্থানে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। তাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন।

ইসমাঈল পাগলের মত হয়ে পড়েন এবং এদিক-ওদিক দৌড়াতে থাকেন। বনকুঞ্জের আড়ালে, গাছের উপরে, টিলার আড়ালে-আবডালে তাকে খোঁজ করলেন; কিন্তু কোন হদিস পেলেন না।

তিনি চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। আরো দ্রুত দৌড়াতে লাগলেন। চিৎকার করে বিলকীসের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন; কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল তাঁর ডাকার শব্দ চারদিকে ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তিনি একটি পাথরের উপর বসে পড়েন এবং চিন্তারাজ্যে ডুবে যান।

দুই

বিরাট বিজয়

৯২ হিজরী সালের ২রা শাওয়াল খ্রিস্টান ও মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিতে হলো, তা সারাদিন চলল; কিন্তু কারো পক্ষেই বিজয়লাভ সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে রাত হয়ে এলো। উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলো। সবাই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলো।

পরদিন সকালে উভয় শিবিরে আবার রণ-দামামা বেজে উঠল। সাজ-সাজ রবে সকলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবারই মরণ-পণ চেষ্টা অপর পক্ষকে পরাভূত করে বিজয়মাল্যে ভূষিত হওয়া। রণ-বাদ্যের সুর, সৈন্যদের জয়ধ্বনি এবং আহতদের আর্তচিৎকারে চতুর্দিক মুখরিত। গত দিনের ন্যায় আজো তুমুল যুদ্ধ চলছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকারে মৃতদেহ পড়ে আছে এবং রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু আজো যুদ্ধে মীমাংসা হলো না। রাত হয়ে আসায় দ্বিতীয় দিনের মত যুদ্ধবিরতি দিতে হলো।

তৃতীয় দিন সকালে আবার রণবাদ্য বেজে উঠল। উভয় পক্ষ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বহু লোক হতাহত হলো। সারাদিন যুদ্ধ চললো কিন্তু সেদিনও যুদ্ধের ফয়সালা হলো না। সন্ধ্যা হয়ে এলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালো।

৯২ হিজরী সালের ৫ই শাওয়াল। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিস্টানরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসে পড়ল। সংখ্যায় ছিল তারা অনেক বেশি। তাদের বিরাট বিরাট সারি দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক জনসমুদ্র। রাজা রডারিক বিশেষ এক আসনে বসে খ্রিস্টানদের পশ্চাতে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন:

হে খ্রিস্টান সৈন্যদল। তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। শত্রুদলের সৈন্যসংখ্যা তোমাদের তুলনায় এক-অষ্টমাংশ। এর পরও এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ক্রমাগত তিন দিন যুদ্ধের পরও তোমরা শত্রুদের পরাভূত করতে পারছ না। তোমাদের জন্য এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। আমি চাই, আজ যে করেই হোক তোমরা শত্রুদেরকে পরাজয় বরণে বাধ্য করবে।

এতে খ্রিস্টানরা আবার নতুন করে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তারা 'হয় তো বিজয়, নয় তো মৃত্যু' প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। রণবাদ্য বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুসলিম মুজাহিদরা ফজরের নামায পড়েই যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারিক সকলের সামনে দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, মুজাহিদ ভাইসব! বিগত তিন দিন ধরে তোমরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছ; কিন্তু কোন মীমাংসা হলো না। এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে তা কতদিনে শেষ হবে, আল্লাহ্ই জানেন। যুদ্ধের এই শ্লথগতি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে পেছনে নিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের পূর্বপুরুষরা খ্রিস্টানদের অস্তিত্বই স্বীকার করতো না; সর্বদাই খ্রিস্টানরা তাদের হাতে পরাজিত হতো। আজ সেই খ্রিস্টানদের সঙ্গেই তোমাদের যুদ্ধ হচ্ছে। আশা করি তোমরাও তাদেরকে পরাস্ত করবে। মনে রেখো, মুসলমানরা মৃত্যুকে ভয় করে না। এ জন্য আল্লাহ তাদেরকে বিজয়দান করেন। তোমরা ধর্মপ্রাণ, তাই আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করেন। তোমরা সাহসী হও, আল্লাহর নাম নিয়ে পূর্ণোদ্যমে হামলা চালাও। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে বিজয়দান করবেন।

তিনি তাঁর কথা শেষ করেই তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। তৃতীয় তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে সকল মুসলিম মুজাহিদও সমস্বরে ধ্বনি তুললেন। আল্লাহর জয়ধ্বনির শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠে। খ্রিস্টানরাও অনেকটা ভীত হয়ে পড়ে। তাকবীর শেষ করেই মুসলিম মুজাহিদরা সামনে এগুতে থাকেন। অপর দিক থেকে খ্রিস্টান সৈন্যরাও দ্রুত এগিয়ে আসছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয় পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। উভয় দলেই তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছিল। শুভ্র তলোয়ারের দ্রুত উঠা-নামায় মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে; রক্তের বন্যা বইছে। খ্রিস্টানদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে লাগল। যুদ্ধ চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে, একদল অন্য দলের মধ্যে ঢুকে গেছে। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল রক্তস্নাত তলোয়ার। চারদিকে মার মার রব। খ্রিস্টানদের আর্তচিৎকারে চারদিকে নিনাদিত। কান পাতার অবস্থা নেই। একেক সৈন্য যেন একেকটি ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্র। প্রত্যেকেই তার অপর পক্ষকে ঘায়েল করার কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এ অবস্থা কারো জন্যেই নিরাপদ নয় ভেবে সকলেই যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসার প্রত্যাশী। উভয় পক্ষের ধারালো তলোয়ার একাধারে সংহার করে যাচ্ছে। সূর্যের প্রখরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধের গতিও তীব্রতর হলো। যে গতিতে খ্রিস্টানরা আঘাত হানছিল, ঠিক একই গতিতে মুসলমানরা পাল্টা আঘাত হেনে খ্রিস্টানদেরকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করছিল। সাজসরঞ্জামের দিক দিয়ে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের তুলনা ছিল না। খ্রিস্টানরা

ছিল প্রায় সকলেই অশ্বারোহী; কিন্তু খুব কমসংখ্যক মুসলমানের অশ্ব ছিল। খ্রিস্টানরা সংখ্যায়ও ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া প্রত্যেক খ্রিস্টান সৈন্যের কাছেই সকল প্রকার অস্ত্র ছিল। অপরপক্ষে মুসলমানদের কাছে ছিল মাত্র একেকটি অস্ত্র। খ্রিস্টানরা বর্ম পরিহিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের পরিধেয় ছিল সাধারণ পোশাক। তা সত্ত্বেও মুসলিম মুজাহিদরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা যেদিকে হামলা চালাতেন সারির পর সারি উলট-পালট করে দিতেন। তলোয়ারের অব্যর্থ আক্রমণ ঢাল ভেদ করে শত্রুদের মস্তকে আঘাত হানতো। মুসলমানরা নুইয়ে মাথা আড়াল করে যুদ্ধ করতেন। আজো তারা একইভাবে যুদ্ধ করছিলেন। মুজাহিদরা পনের-বিশটি সারি পরাভূত করে সামনে এগিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সহস্রাধিক খ্রিস্টান সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হলো।

মুগীছ আর-রুমী ছিলেন ডানদিকস্থ মুজাহিদ দলের অধিনায়ক। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর কাছে অশ্ব ছিল। তিনি যে দিকে ধাবিত হতেন একের পর এক শত্রুসৈন্যকে ভূপাতিত করে এগিয়ে যেতেন। তিনি যে উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁর অনুগামী সৈন্যরাও একই গতিতে যুদ্ধ করছিলেন। সকলেই বীর বিক্রমে শত্রুসৈন্য ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে গেলেন। এ দলের হাতে অসংখ্য শত্রুসৈন্য নিহত হলো।

বামদিকস্থ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন তাহির। তিনি ছিলেন একজন তরুণ যুবক। তার মাঝে ছিল যৌবনের তারুণ্য। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি আক্রমণেই অন্তত দু'চার জন খ্রিস্টান সৈন্যকে নিধন করতেন। তাঁর অনুগামী সৈন্যদলের লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টানদের ডানদিকস্থ সেনাদলকে পর্যুদস্ত করা। এ জন্য তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতেন; অন্যদিকে খ্রিস্টানরাও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধের চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হলো না; বরং যারাই সামনে এগিয়ে আসতো তারাই নিহত হতো। যুদ্ধের গতি তখন অত্যন্ত তুঙ্গে। এলোপাতাড়ি যুদ্ধ চলছে। বেশ কিছু মুজাহিদও শাহাদত বরণ করেন; এঁদের অনেকেই শাহাদত বরণ করেছিলেন অশ্বের খুরের আঘাতে; কিন্তু কোন মুজাহিদই কমপক্ষে দশ জন খ্রিস্টান সৈন্যকে হত্যা না করে মৃত্যুবরণ করেননি। তদুপরি তাঁদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, বোঝাই যেতো না। অপরদিকে খ্রিস্টানদের নিহতের সংখ্যা এত অধিক ছিল, সকলেই তা বুঝতে পারতো।

মুজাহিদদের মধ্যস্থলে ছিলেন তারিক। তাঁর এক হাতে ছিল ইসলামী পতাকা অপর হাতে ছিল তলোয়ার। তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যে দিকে আক্রমণ করতেন, সে দিকে মাতম পড়ে যেতো; যে অশ্বারোহীর দিকে ধাবিত হতেন, তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। তিনি যে উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, তিনি নিজেই সকল খ্রিস্টানকে সাফ করে ফেলবেন। অন্য

মুজাহিদরাও একইভাবে আক্রমণ রচনা করেন। মুসলিম সৈন্যরা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ, ষাট-ষাট করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। তাঁরা কোন অশ্বারোহী শক্রসৈন্যকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কেউ সে অশ্বের পিঠে চড়ে বসতেন দুপুর পর্যন্ত এভাবে প্রায় পাঁচশ' অশ্ব তাদের নিয়ন্ত্রণে এলো। শ'খানেক অশ্বারোহী মুজাহিদ তারিকের দলে অন্তর্ভুক্ত হলেন। তারিক যে দিকেই আক্রমণ চালাতেন, অশ্বারোহী সে দলটি সে দিকেই ধাবিত হতেন। ফলে শত্রুনিধনের হিড়িক পড়ে গেল। তাঁরা যে সারির প্রতি ঝুঁকে পড়তেন, এক এক করে সকল সৈন্যকে হত্যা করে সাফ করে দিতেন। এভাবে অসংখ্য খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হচ্ছিলো। মুজাহিদরা রডারিকের দিকে এগুতে লাগলেন। একের পর এক সারি অতিক্রম করে তাঁরা এগুচ্ছিলেন। রডারিক ছায়াদার গাছের নিচে একটি আসনে হেলান দিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিলেন। একের পর এক খ্রিস্টান সৈন্যের নিহত হওয়া দেখে তার রাগ হচ্ছিল। তখন পর্যন্ত তার মনে আশা ছিল যে খ্রিস্টানরা সংখ্যায় মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি। সুতরাং তারা জিতবেই। এমনি সময় তিনি তার নিকটে শোরগোল শুনতে পান। তিনি দেখতে পান যে, তারিক শতাধিক অশ্বারোহীসহ তার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি ঘাবড়ে যান এবং তার অশ্ব তলব করেন। অশ্বটি তার পাশেই প্রস্তুত ছিল। তার অশ্বটি ছিল ধবধবে সাদা। নাম ছিল ওরিলিয়া। অশ্বটি কাছে আসতেই তিনি তার পিঠে চড়ে বসেন এবং তলোয়ার বের করেন। তলোয়ারটি তুলে ধরতেই তার সামনে সে অলৌকিক গম্বুজের দৃশ্য ভেসে উঠল। গম্বুজে চামড়ার ফিতায় তিনি যে দৃশ্য দেখেছিলেন, এ যুদ্ধে যেন সে দৃশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। মৃত্যুর এক ভয়াল দৃশ্য তার সামনে ভেসে উঠল। তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। সামনেই তারিককে দেখতে পান। তাঁকে দেখামাত্রই রডারিকের শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। তারিক তাকে বললেন, পাপিষ্ঠ! সাহস থাকে তো মুকাবিলা কর।

রডারিক তার রক্ষীদলের দিকে তাকালেন। কিন্তু তারাও মুজাহিদদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। রডারিকের আশা ছিল, রক্ষীদল তাকে সাহায্য করবে; কিন্তু তাদেরকে যুদ্ধরত দেখে তিনি আরো ঘাবড়ে গেলেন। এমনি সময় তারিক উদ্যত তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে গেলেন। রডারিক কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন। এমনি মুহূর্তে তারিকের তলোয়ার রডারিকের মাথায় গিয়ে আঘাত হানল। রডারিক এক বিকট চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তার ঢলে পড়ার পর তারিক তার সৈন্যদলের উপর আরো তীব্র আঘাত হানলেন। তারা সে আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পিছিয়ে গেল। মুজাহিদরা আবার হামলা চালালেন। এতে অনেক সৈন্য নিহত হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহস্রাধিক শক্রসৈন্য মৃত্যুবরণ করল। এতে খ্রিস্টানরা হতোদ্যম হয়ে গেল। তারা নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া

করেন এবং বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, একজন খ্রিস্টানও দাঁড়িয়ে নেই। অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করেছে, বাকীরা পালিয়ে গেছে। এই যুদ্ধে এত বেশী খ্রিস্টান নিহত হয়েছিল যে, তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। বহু দিন পর্যন্ত রণাঙ্গণে তাদের মৃতদেহ পড়েছিল। অপরপক্ষে 'দুইশ' মুসলিম মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।

এ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তি-সাহস আরো বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্টানদের উপর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এটা ছিল সেই বিজয়–যার স্মরণে খ্রিস্টানজগতে আজো মাতম উঠে। অপরদিকে এ জয়ের কথা মনে করে মুসলিম বিশ্ব আনন্দ উৎসব পালন করে।

তিন

অগ্রযাত্রা

রডারিক স্পেনের খ্যাতনামা সমরনায়কসহ ৯০ হাজার সেরা যোদ্ধা নিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই বিরাট সৈন্যদলের সামনে মুসলমানরা টিকতেই পারবে না; অথচ ফল হলো উল্টো। ঈমানী প্রেরণায় বলীয়ান ১২ হাজার মুসলিম মুজাহিদ ৯০ হাজার সৈন্যের বিরাট খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজয় বরণে বাধ্য করেন। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেন যে, বিপুল সৈন্যবলে বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও এই যুদ্ধে খ্রিস্টানদের শোচনীয় পরাজয় হয়। বহু খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হয়। বহু দিন পর্যন্ত মৃতদের হাড়-মাংস যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়ানো-ছিটানো ছিল।

এই বিজয় লাভের পর মুসলিম মুজাহিদরা অবনত মস্তকে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানান। অতঃপর মুজাহিদদের কেউ কেউ খ্রিস্টানদের তাঁবুর দিকে যান আর কেউ কেউ মৃত খ্রিস্টানদের ঘোড়াগুলো ধরার কাজে ব্যাপৃত হন। সন্ধ্যার আগেই সকল শত্রুছাউনি ও ঘোড়া মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এলো। এরপর শহীদদের মৃতদেহগুলোকে একত্রিত করা হলো এবং জানাযা আদায় করে দাফন কাজ সম্পন্ন করা হলো। সূর্যাস্তের পর মুজাহিদরা মাগরিবের নামায আদায় করে রাতের খাবার তৈরিতে ব্যাপৃত হলেন। যারা আহত হয়েছিল, তাদেরকে ওষুধ দেয়া হলো। এশার নামাযের পর রাতের খাবার খেয়ে সকলেই নিদ্রায় গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুজাহিদরা ফজরের নামায আদায় করেন। তারিক গনীমতের মালের হিসেব নিতে শুরু করলেন। সহস্র তাঁবু, অসংখ্য তলোয়ার, বর্শা, ঢাল, কামান ও তীর-ধনুক হাতে এলো। রসদপত্র ছিল প্রচুর। পরিধেয় বস্ত্র, নানা প্রকার সাজসরঞ্জাম, তৈজসপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্রও মুসলমানদের হস্তগত হলো।

যে আসনটির উপর বসে রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন, তা ছিল সোনা-রূপা খচিত। এতে ছিল হাতির দাঁতের বিভিন্ন কারুকাজ। তাঁর শিরস্ত্রাণটি ছিল মূল্যবান ধাতুমণ্ডিত। এতে ইয়াকূত, হীরা-মোতি সংযোজিত ছিল। এসবই গনীমতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া ছিল শত্রুদের পরিত্যক্ত চৌদ্দ হাজার ঘোড়া। মুজাহিদরা মৃত খ্রিস্টানদের লৌহবর্মও খুলে নেন।

এসব দেখে মুজাহিদরা খুবই খুশী হন এবং অবনত মস্তকে আবার আল্লাহর শুকরিয়া জানান। তারিক সে সময়ই সকল অস্ত্রশস্ত্র মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেন। ফলে সকল পদাতিকই অশ্ব পেলেন, লৌহবর্ম পেলেন। যাঁদের কাছে অস্ত্র ছিল না, তাঁরা অস্ত্র পেলেন। এরপর তারিক রডারিকের শিরস্ত্রাণ ও আসনটির ধাতুগুলোকে পৃথক করে বাকী জিনিসগুলোকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এর চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং বাকী এক ভাগ বায়তুলমালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি এই যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ দিয়ে মূসার কাছে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

প্রেরক:
তারিক ইব্ন যিয়াদ
স্পেন অভিযানের সেনাপতি

প্রাপক:
মূসা ইব্ন নূসায়র
প্রাচ্যদেশীয় গভর্নর

জনাব,

সালাম বাদ আরজ এই যে, সকল মুজাহিদকে নিয়ে আমরা ভালভাবেই সবুজ দ্বীপে এসে পৌঁছি। সেখান থেকে এগিয়ে আমরা স্পেন সীমান্তে উপনীত হলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে আমাদের মুকাবিলা হয়। খ্রিস্টান দলের সেনাপতি ছিলেন তাদমীর। আল্লাহর রহমতে আমরা তাদেরকে পরাজিত করি এবং সামনে এগিয়ে যাই। আমরা গোয়াডাল কুইভার নদীর তীরে পৌঁছি। সেখানে রডারিকের ৯০ হাজার সৈন্যসম্বলিত এক বিরাট বাহিনীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। তাদের সঙ্গে অনেক পাদ্রীও ছিল। তারা খ্রিস্টানদেরকে প্রেরণা যোগাতো। ক্রমাগত তিন দিন তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হলো। মুজাহিদরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু খ্রিস্টানরা বহু হতাহতের পরও পিছপা হলো না। তারা মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করল; অবশেষে চতুর্থ দিন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের কাছে তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো। সেদিন ৫ই শাওয়াল ১২ হিজরী। আল্লাহ আমাদেরকে বিজয়দান করলেন। রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গেল।[১] এতে এত খ্রিস্টান সৈন্য মারা গেল যে, সঠিক

---

১. একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের মতে তারিক মূসার কাছে চিঠির সঙ্গে রডারিকের কর্তিত শিরও প্রেরণ করেছিলেন। অপর এক ঐতিহাসিকের মতে রডারিক আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর সময় রাতে টেগয়স নদীতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। আরব ঐতিহাসিকদের মতে রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেছিল এবং তার শির মূসার নিকট প্রেরিত হয়নি—লেখক।

সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। মাত্র দু'শ মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়েছে। আমাদের প্রত্যেক মুজাহিদই একেকটি বাহন পেয়েছে। রডারিকের শিরস্ত্রাণ, তার ব্যবহৃত আসনের বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু, পরিধেয় শাহী বস্ত্র সবই গনীমতরূপে মুসলমানদের হস্তগত হয়। আমাদের ধারণা, খ্রিস্টানরা আমাদেরকে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেছে। এখন তারা আমাদের নাম শুনলেই ভয় পায়। আমরা এখন আভ্যন্তরীণ অভিযানে লিপ্ত রয়েছি। আমাদের জন্যে দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে কামিয়াব করেন। কায়রোবাসীদের প্রতি আমাদের সালাম রইল। আপনার প্রেরিত সৈন্যদলটি যথাসময়েই আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

ইতি
আপনার অনুগত
তারিক, স্পেন

এই চিঠি দিয়ে তারিক একজন দূতকে মূসার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর সকল মুসলমানকে ডেকে পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে পরামর্শ করেন। এবং এখন কোন্ দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু সে দেশটি সম্পর্কে মুজাহিদরা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তাঁদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হলো না। আমামন তখনও মুজাহিদদের সঙ্গেই ছিলেন। তারিক তাকে ডেকে পাঠালেন।

তারিক সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর হাজার শোকর যে, তিনি আমাদেরকে এ মহাবিজয় দান করেছেন। এখন আমরা মূসার পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করব, না সামনে অগ্রসর হবো, সে সম্পর্কে আপনারা পরামর্শ দিন।

মুগীছ বললেন, এ মহাবিজয়ের পর এখন আমাদের বসে থাকলে খ্রিস্টানদের উপর থেকে বিজয়ের প্রভাব ম্লান হয়ে যাবে। আমার মতে আর কালবিলম্ব না করে এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত।

যায়দ–পরবর্তী নির্দেশের জন্যে এখানে বসে থাকলে আমার মতে হয়ত ভুল হবে। কিছু খ্রিস্টান সৈন্য পালিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে কিছু অফিসারও রয়েছে। তারা হয়ত আবার নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে পারে। তাতে আমাদের জন্যে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। এর চাইতে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্যে উত্তম।

তাহির–এখন আমরা যদি খ্রিস্টানদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখি, তাহলে শত্রুরা কোথাও স্থির হতে পারবে না। আমরা শহরের পর শহর অধিকার করতে পারব।

মুগীছ–খ্রিস্টানদের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে, তাতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখলে তারা আরো ঘাবড়ে যাবে। ফলে নতুনভাবে সাহস সঞ্চারের কোন সুযোগ পাবে না।

তাহির–এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে. আমরা শীঘ্রই হয়ত স্পেনের রাজধানী অধিকার করতে সক্ষম হবো।

আমামন–আমার ধারণা যে, খ্রিস্টানদের উপর আপনারা যে বিজয় লাভ করেছেন, তাতে তাদের সকল অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তারা এতই ভয় পেয়েছে যে, আপনাদের দেখলেই পালিয়ে যাবে।

তারিক–তাহলে আমাদের সমানে এগুনো উচিত।

যায়দ–নিশ্চয়ই।

তারিক–কিন্তু আমরা কোন্ দিকে এগুবো?

মুগীছ–আমরা তো এ দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমামনকে জিজ্ঞেস করা যায়।

তারিক আমামনকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমাদেরকে বলুন, আমরা কোন্ দিকে যাব?

আমামন–প্রথমে আমার ধারণা ছিল, কেবল কর্ডোভার উপর আক্রমণ করলেই হয়ত যথেষ্ট হবে; কিন্তু এখন......

তারিক–এখন কি তোমার ধারণা বদলে গেছে?

আমামন–হাঁ, এখন মনে হয় তিন দিক দিয়েই হামলা করা উচিত।

তারিক–তাহলে কি আমরা আমাদের সৈন্যদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করব?

আমামন–এতে অধিকতর সফলতার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি সৈন্যদল কর্ডোভা হয়ে টলেডোর দিকে, দ্বিতীয় সৈন্যদল মালাগা, আলোর ও ইসতিজার দিকে এবং তৃতীয় দল সেভীল ও মারিভার দিকে এগিয়ে যাবে। খ্রিস্টানদের পরাজয়ের সংবাদ ইতিমধ্যেই সারাদেশে পৌঁছে গেছে এবং সকলেই আপনাদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত। ফলে আপনারা যেদিকেই যাবেন সেদিকেই জয়লাভ করবেন।

মুগীছ–আমামনের অভিমতটি খুবই যুক্তিসঙ্গত।

তারিক–আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি (মুগীছ) আমার সঙ্গে কর্ডোভায় যাবেন। যায়দ মালাগার দিকে যাবে। কর্ডোভা বিজয়ের পর আপনাকে অন্য দিকে পাঠানো হবে। যায়দ মালাগা জয় করে টলেডোর কাছে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

মুগীছ–তা-ই ভাল।

তারিক–সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত হবে যে, কোন উপাসনালয়, শস্যক্ষেত্র ও আবাসভূমি যেন নষ্ট না হয় এবং শিশু, পীড়িত, নারী, বৃদ্ধ ও ধর্মীয় নেতাদেরকে যেন হত্যা করা না হয়। তাদের সকলের সঙ্গে যেন সদয় ব্যবহার করা হয়।

এসব কথা শেষ করে তারিক সকল সৈন্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগ যায়দকে দিয়ে মালাগা পাঠিয়ে দিলেন। অপর দু'ভাগ নিজের সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

চার

প্রকৃতির ভাণ্ডার

ইসমাঈল পাথরের উপর বসে চিন্তায় ডুবে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি সেখানে বসে রইলেন। বিলকীস কোথায় গেল, কোন বিপদে আপতিত হলো কিনা–এসব নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে আশংকা হলো, হয়ত কোন শত্রু এসেছিল। তিনি অনুশোচনা করতে লাগলেন আমি কতই না বোকামী করেছি, কেনই বা এখানে তাকে একা ফেলে চলে গেলাম। বিলকীস যদি কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে চলে যায়, তাহলে তো কোন কথা নেই। কিন্তু তা না হয়ে সে যদি কোন বিপদে আপতিত হয়, তা হলে তার সে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের জন্যে আমিই দায়ী; কিন্তু এখানে তো কোন লোকজনেরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তিনি ধারণা করলেন এখানে যদি কোন লোকজনের আগমন হতো, তাহলে পর্বতচূড়ার তলদেশে যেসব মূল্যবান পাথর টুকরো রয়েছে, এগুলো সেখানে থাকতো না। এসব মূল্যবান পাথর তারা অবশ্যই কুড়িয়ে নিয়ে যেতো।

এসব চিন্তা-ভাবনা তাঁর মনে এসে ভিড় জমাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং যে পাথরটিতে বিলকীস বসেছিল, তিনি তা পরখ করার চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর মনকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, এটি সে পাথর নয়, যাতে বিলকীস বসেছিল। কিন্তু পাথরটি শনাক্ত করার যেসব আলামত ছিল তা সবই তাঁর স্মৃতিতে অক্ষুণ্ন ছিল। তাই টিলার উপরিস্থিত সে পাথরটির চারপাশে বারবার ঘুরে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, এটি সেই পাথরই যাতে বিলকীস বসেছিল। সবকিছুই ঠিক রয়েছে, নেই কেবল সেই কমলকান্তি রমণী। কিছুক্ষণ তিনি সেখানে অপেক্ষা করলেন। তাঁর আশা ছিল বিলকীস হয়ত আবার এখানে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল, তিনি ততই নিরাশ হতে লাগলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এলেন এবং আবার পাথরটিকে ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন।

অধিকতর নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে ইসমাঈল পাথর ও টিলাটিকে বারবার দেখতে লাগলেন; তাঁর মন থেকে যেন সন্দেহ দূর হচ্ছিল না। ইতিপূর্বেও কয়েকবার তিনি

পাথরটিকে পরখ করে দেখেছেন। আসলে মানুষ যখন কোন কিছু হারিয়ে ফেলে, তখন একই স্থানে বারবার ঘুরে বেড়ায়। ইসমাঈলের অবস্থাও তা-ই হলো। পরিশেষে স্থানটি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি একটি পাথরের উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং এদিক-ওদিক বিলকীসকে খোঁজার চেষ্টা করলেন; কিন্তু বিলকীসকে কোথাও পাওয়া গেল না। চারদিকে ছিল বহু উঁচু টিলা এবং বড় বড় গাছ, তাই স্পষ্টভাবে চতুর্দিকে দেখাও যাচ্ছিল না। ইসমাঈল বিলকীসকে নাম ধরে ডাক দিলেন। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর ডাকের শব্দ; কিন্তু কোন প্রতি-উত্তর পাওয়া গেল না। তিনি নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। কখনো পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়, কখনো বা গাছের উঁচু ডালে উঠে বিলকীসকে খুঁজছিলেন; কখনো বা গাছের আড়ালে-আবডালে ছোটাছুটি করছিলেন। এভাবে দৌড়া-দৌড়িতে তাঁর পিপাসা আরো বেড়ে গেল; কিন্তু অস্থিরতার প্রাবল্যে সেদিকেও তাঁর ভ্রুক্ষেপ ছিল না। বিলকীসের সন্ধানের আশায় তিনি ছোটাছুটি করতে লাগলেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটি স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন, যার দু'পাশে ছিল উঁচু পাহাড়, মধ্যভাগে একটি বিরাট মোতি খণ্ড।

টিলার দু'পার্শ্বে সবুজের সমারোহ, যেন কোন নিপুণ মালি সযত্নে সবুজ লতা-পাতা দিয়ে টিলাটিকে ঢেকে রেখেছে। প্রকৃতির এ দৃশ্য খুবই লোভনীয়। ইসমাঈল হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ান। তিনি কি যেন ভাবতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত টিলায় উঠতে থাকেন।

টিলাটি ছিল ঢালু। তাই তাতে আরোহণ করতে ইসমাঈলের তেমন অসুবিধে হলো না। সেখানে উঠে তিনি চারদিকে দৃষ্টি দেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, সবকিছু তিনি খতিয়ে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। টিলার নিচে তিনি একটি বিরাট উন্মুক্ত গুহা দেখতে পান। গুহাটি ছিল এতই বিরাট যে, মনে হচ্ছিল সমগ্র পাহাড়টিই যেন গুহার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যাবে।

তিনি ভয় পেয়ে যান এবং দ্রুত সেখান থেকে সরে আসেন। কিন্তু সরে আসার মুহূর্তেই হঠাৎ করে তার পা পিছলে গেল। আর অমনি তিনি নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকেন।

তিনি টিলার তৃণগুল্মকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু সেগুলো এতই নাজুক যে, হাত লাগামাত্রই তা উঠে আসতো। তাঁর মনে হলো যে, এভাবে গড়িয়ে পড়তে থাকলে পাথরের আঘাতে আঘাতে তাঁর শরীরের হাড়-মাংস হয়ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

ইসমাঈল অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি জ্ঞান হারালেন না। এভাবে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় হঠাৎ টিলার একটি গাছকে আঁকড়ে ধরেন এবং এর সাহায্যে নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করেন।

তিনি তখনো পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি। এমনি মুহূর্তে ধস নামার একটি বিকট আওয়াজ তাঁর কানে এলো। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পান, যে

গাছটিকে তিনি টিলায় আঁকড়ে ধরেছিলেন, সেটি স্থানচ্যুত হয়ে তাঁর উপর নেমে আসছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন, গোটা পাহাড়টিই তাঁর উপর পড়ে যাচ্ছে।

ইসমাঈল ঘাবড়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন যে, এখন তাঁর মৃত্যু অবধারিত। কারণ টিলাটি যেভাবে নেমে আসছে, তাতে নিচে চাপা পড়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

তিনি বুঝতে পারেন যে, এখন এক মুহূর্ত দেরী করার সময় নেই। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে দ্রুত পশ্চিম পার্শ্বে দৌড়ে আসেন এবং আল্লাহর অশেষ কৃপায় টিলার নিচ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

টিলাটি ক্রমাগত নিচে পড়ছিল। কিছুদূর দৌড়ে এসে ইসমাঈল মাটির উপর শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর একটি বিকট আওয়াজ হলো। তিনি মাথা তুলে দেখেন যে, টিলাটি বহুদূরে গিয়ে পড়েছে এবং ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। তাঁর মনে বিস্ময়ের উদয় হলো যে, সামান্য ভারেই টিলাটি ধসে পড়বে কেন? অতএব তিনি বিষয়টি দেখার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মন থেকে ভয় তখনো সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়নি; কিন্তু টিলাটি ধসে পড়ার রহস্য তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি আবার সে দিকে এগুতে লাগলেন। তবে এবার ছিলেন তিনি অত্যন্ত সতর্ক। আস্তে আস্তে পড়ে যাওয়া টিলাটির নিকটবর্তী হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, টিলাটির নিচে উজ্জ্বল সাদা পাথর রয়েছে এবং সেগুলো রূপার ন্যায় চকচক করছে। তিনি আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বুঝতে পারেন যে, এ পাথরগুলো অপরিশোধিত রূপা, যার মূল্য লক্ষ কোটি টাকা।

তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল। কারণ একই দিনে তিনি প্রকৃতির দু'টি গুপ্ত ধন ভাণ্ডার দেখতে পান। কিন্তু তাঁর কাছে সর্বাধিক মূল্যবান ছিল বিলকীস; অথচ তাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

তিনি ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলেন এবং নিচের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। এ সময় সন্ধ্যা হয়ে আসছিল; গোধূলী লগ্ন। ইসমাঈল তাই আরো দ্রুত হাঁটতে লাগলেন; কিন্তু সামনেই একটি উঁচু টিলা এবং এর উত্তর দিকে একটি বিস্ময়কর তোরণ দ্বার। দু'দিক থেকে দু'টি টিলা এসে সেখানে মিলিত হয়েছে। টিলা দু'টির মাঝখানে একটি বিরাট খোলা জায়গা দেখে একটি দ্বার বলে মনে হয়।

ইসমাঈল সে পথে ঢুকে পড়েন। পথটির দু'পাশের টিলায় কালো বা ছাই রঙের পাথর দেখা যাচ্ছিল। তাতে ছিল রং-বেরঙের ফুলের সমারোহ। চারদিকে বিচিত্র ফুলের সুবাস। ইসমাঈল তা দেখে অবাক বিস্ময়ে সে সবের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সে পথ দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একটি চিৎকারের আওয়াজ তাঁর কানে এলো। তিনি থমকে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ পর যে দিক থেকে আওয়াজ আসছিল, তিনি সে দিকে দৌড়াতে লাগলেন।

পাঁচ

অহংকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায়

যে ক্ষুদ্র নদীতীরে খ্রিস্টান ও মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, সে স্থানটির নাম ছিল বেকা উপত্যকা। মুসলমানরা স্থানটির এ নামকরণ করেছিলেন। এর পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী প্রবাহিত। নদীটির পাশেই মুসলমানরা বিরাট বিজয় লাভ করেছিল। এর একটু দূরেই ছিল বিখ্যাত গোয়াডাল কুইভার নদী। নদীটি পার হয়ে তারিক মুসলিম মুজাহিদদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করেন। একটি দল মুগীছ আর-রূমীর নেতৃত্বে কর্ডোভার দিকে যাত্রা করে; দ্বিতীয় দল তারিকের নেতৃত্বে টলেডোর দিকে যাত্রা করে; তৃতীয় দল যায়দের নেতৃত্বে মালাগা যাত্রা করে। তখন বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে। নদ-নদী পানিতে ভরে গেছে। এতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়; কিন্তু মুসলমানরা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তিই ভ্রূক্ষেপ করেনি; একের পর এক নদী-নালা অতিক্রম করে তাঁরা তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।

খ্রিস্টানরা বেকা'র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে একটা অংশ কর্ডোভায় চলে গিয়েছিল। কিছু সৈন্য চলে যায় টলেডোয়। তবে বেশীর ভাগ সৈন্যই মালাগা, আলোর ও ইস্‌তিজায় গিয়ে সমবেত হয়। পরাজিত ও পলায়নরত এই সকল খ্রিস্টান সৈন্য যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের কাছে নিজেদের পরাজয়ের কাহিনী ও মুসলমানদের আগমনের কথা বলেছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা মরতে জানে না। আর যারা মৃত্যু কি জিনিস জানে না, তারা মানুষ নয়। জনসাধারণের মধ্যে বিস্ময়কর গম্বুজের কাহিনীও বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, স্পেনের পতন অত্যাসন্ন। কেউ মুসলমানদের হাত থেকে এর পতন রোধ করতে পারবে না। তারা এও শুনেছিল যে, তাদের রাজা রডারিক নিখোঁজ রয়েছে। কোথাও তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়েছিল। তাই তারা রডারিকের পরিণতি দেখতে পায়নি। অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে, রডারিক আত্মগোপন করেছেন। এক সময়ে তিনি আবার

আত্মপ্রকাশ করবেন এবং শত্রুদের হাত থেকে স্পেনকে পুনরুদ্ধার করবেন। বহু দিন পর্যন্ত খ্রিস্টানদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

এ ধারণার বশবর্তী হয়ে খ্রিস্টানরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত তারা লড়ে যাবে এবং দেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে।

কিন্তু এ পদক্ষেপে তাদের মন সায় দিল না। এক প্রকার ভয় তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। মুসলমানদের নাম শুনলেই তারা আঁতকে উঠতো।

যায়দ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মালাগার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র দু'হাজার মুসলিম মুজাহিদ। বেকার যুদ্ধে খ্রিস্টানদের পরাজয়ের ফলে তাদের অনেক তাঁবু মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। মুসলমানরা সেসব তাঁবু ব্যবহার করে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছিল। তাঁরা যে দিক দিয়ে যেতো, সকল গ্রাম ও জনপদ শূন্য হয়ে পড়তো। লোকেরা মুসলমানদের ভয়ে নিজ নিজ আবাস ছেড়ে পালিয়ে যেতো।

খ্রিস্টান জনসাধারণ সবকিছু নিয়ে মালাগায় গিয়ে সমবেত হয়েছিল। তারা আশংকা করলো যে, খ্রিস্টানরা একত্রে সমবেত হতে থাকলে মুসলমানদের জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তারা যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে এগুতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে যায়দ মালাগায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিনি একটি উঁচু দুর্গ দেখতে পান। এর চারদিকের প্রাচীর ঘিরে ছিল বহু খ্রিস্টান সৈন্য। তিনি বুঝতে পারেন যে, খ্রিস্টানরা পালিয়ে এসে এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেছে। প্রকৃত ঘটনাও ছিল তাই। চারদিকের খ্রিস্টানরা সকল সাজসরঞ্জাম নিয়ে এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল।

সে সময় দুর্গের ভেতর পনের-ষোল হাজার সৈন্য অবস্থান গ্রহণ করেছিল; কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র দু'হাজার। খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা যে কোন সময় আক্রমণ চালাতে পারে। সেজন্যে তারা অত্যন্ত শংকিত ও চিন্তিত ছিল। কিন্তু তারা যখন দেখতে পেলো যে, মুসলমানদের সংখ্যা কেবল মাত্র দু'হাজার, তখন তারা সাহসী হয়ে উঠলো। তারা সিদ্ধান্ত নিল, উন্মুক্ত মাঠেই তারা মুসলমানদের মুকাবিলা করবে।

যায়দ দুর্গ থেকে মাইল তিনেক দূরে তাঁবু ফেললেন। তিনি ভাবছিলেন, খ্রিস্টানদের ভাষা বুঝতে পারে, এমন কাউকে পাওয়া গেলে হয়ত প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দেখা যেতো; কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। তাই বাধ্য হয়ে যায়দ নিজেই কয়েকজন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের নিকটে গেলেন।

দুর্গের খ্রিস্টানরা তাদেরকে দেখতে পেলো। প্রথমে তারা মনে করেছিল যে তীর ছুঁড়ে মুসলমানদেরকে স্বাগত জানাবে; কিন্তু তারা এই ভেবে শান্ত রইলো যে, দেখা যাক না, তারা কি বলতে এসেছে। কারণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখে তাদের মনেও ধারণা জন্মেছিল যে, হয়ত তারা কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তারা

জানতো না যে এ দলে তাদের সেনাপতিও রয়েছে। জানলে হয়ত তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করতো

মুসলমানরা দুর্গের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। যায়দের হাতে ছিল ইসলামী পতাকা। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পতাকাকে বাতাসে উড়াচ্ছিলেন। যায়দ উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন-খ্রিস্টানগণ, আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। কিন্তু তিনি তাঁর ভাষায় বলছিলেন বলে খ্রিস্টানরা তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারলো না।

দুর্গের ভিতরে কিছু ইহুদী ছিল। তারা আরবী ভাষা জানতো। খ্রিস্টানরা একজন ইহুদীকে ধরে নিয়ে এলো। সে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এলো। সে ছিল বৃদ্ধ, মুখে পাকা দাড়ি। পরনে ছিল রেশমী কাপড়ের জাতীয় পোশাক। মুসলমানরা বুঝতে পারলো যে, নিশ্চয়ই তিনি কোন সম্মানী ব্যক্তি।

আরব দেশেও ইহুদীদের বসতি ছিল এবং প্রাচীনকাল থেকেই সিরিয়া ও আফ্রিকায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। তাই তাদের সঙ্গে মুসলমানদের পরিচিতি ছিল। মুসলমানরা আগন্তুক বৃদ্ধকে দেখেই বুঝতে পারলো যে, সে একজন ইহুদী। ইহুদীটি চিৎকার করে বলল, তোমরা কি বলতে চাও ?

যায়দ বললেন, তুমি কি বলতে চাও?

ইহুদীটি অনেকটা আফসোসের সুরে বললেন, আমি দুর্ভাগা এক ইহুদী।

যায়দ-তুমি কি জান যে, খ্রিস্টানরা তোমাদেরকে কতটুকু হীন মনে করে?

ইহুদী-হাঁ, ভাল করেই জানি।

যায়দ-মুসলমানরা তোমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করে তা কি তুমি জান?

ইহুদী-হাঁ, সে সম্পর্কেও আমি অবহিত।

যায়দ-দুর্গের ভিতর কি পরিমাণ সৈন্য রয়েছে?

ইহুদী-সৈন্য রয়েছে পনের হাজার। সাধারণ খ্রিস্টানের পরিমাণও অনুরূপ হবে, কিন্তু তারা তোমাদেরকে কম দেখে খুবই সাহসী হয়ে উঠেছে। তবে মনে মনে তারা অত্যন্ত ভীত।

যায়দ-তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তারা সন্ধি করতে রাজি আছে কিনা? তা হয়ত তাদের জন্য ভাল হবে।

ইহুদীটি নীরবে পেছনে সরে গেল। যায়দ বুঝতে পারেন যে, সে হয়ত খ্রিস্টানদের মতামত জানতে গেছে।

কিছুক্ষণ পর ইহুদীটি ফিরে এলো এবং জোরে জিজ্ঞেস করল কি কি শর্তাবলীর উপর সন্ধি করতে হবে, খ্রিস্টানরা তা জানতে চাচ্ছে।

যায়দ-কেবল জিযয়া দেয়ার শর্তেই সন্ধি হতে পারে।

ইহুদী-খ্রিস্টানরা তা করতে রাজী নয়।

যায়দ-তাদের কি ইচ্ছে?

ইহুদী–তারা বলছে, তোমরা এখান থেকে চলে গেলে ওরা তোমাদের পিছু দাওয়া করবে না।

মুসলমানরা তা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যায়দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে দেখেছ?

ইহুদী–আনন্দের সঙ্গে বলল, আমি তো খুবই বিপদগ্রস্ত।

যায়দ–কি বিপদ তোমার?

ইহুদী–রডারিক আমার কন্যা রাহীলকে জোরপূর্বক নিয়ে গেছে।

যায়দ–তোমার কন্যা হয়ত টলেডোয় রয়েছে।

ইহুদী–আমি সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোন হদিস পাইনি।

যায়দ–তাহলে আর কোথায় থাকতে পারে?

ইহুদী–এতটুকু জেনেছি যে, একরাতে সে নাকি সেখান থেকে পালিয়েছে।

যায়দ–কোথাও মেরে ফেলেনি তো?

ইহুদী–এতটুকু জেনেছি যে, তাকে মেরে ফেলা হয়নি। সে মহল থেকে পালিয়ে এসেছে। আমার ধারণা ছিল হয়ত এখানে চলে এসেছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত তো এসে পৌঁছল না।

যায়দ–আমি তোমাকে সমবেদনা জানাছি।

ইহুদী–আমার ধারণা, হয়ত আপনাদের সাহায্যে তাকে ফিরে পেতে পারি।

যায়দ–আমরা তাকে বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ইহুদী–আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?

যায়দ–দুর্গে প্রবেশের কোন গোপন পথ থেকে থাকলে আমাকে জানাতে পার।

ইহুদী–রাস্তা তো ছিল; কিন্তু এখন বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বাইরে ঘোরাফেরা করছে। যে কোন সময় আপনাদের উপর হামলা চালাতে পারে। আপনারা তাদের মুকাবিলার প্রস্তুতি নিন।

যায়দ-তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ইহুদী–জয়লাভের পর ইহুদীদের কথা ভুলে যাবেন না। তারা খুবই মজলুম।

যায়দ-কোন চিন্তা করো না। আমরা তোমাদের হেফাজত করবো ইনশাল্লাহ।

এই বলে যায়দ ফিরে এলেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। মুজাহিদরা প্রস্তুত হতে না হতেই দুর্গের দরজা খুলে গেল। খ্রিস্টান সৈন্যরা বন্যাবেগে মাঠে বেরিয়ে আসতে লাগল।

ছয়

মালাগা বিজয়

খ্রিস্টানদের দেখামাত্র মুসলমানরাও নিজ নিজ সাজসরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। তাঁরা রণাঙ্গনের দিকে এগুতে লাগলেন। খ্রিস্টানরা ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। তারা বন্যার বেগে একের পর এক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। দশ-বার হাজার খ্রিস্টান সৈন্য ইতিমধ্যে সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। আস্তে আস্তে তাদের আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

মুসলিম মুজাহিদরা চার ফার্লং দূরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। উভয় দলই তখন একে অপরের মুখোমুখি। সূর্য অনেকটা উপরে উঠে গেছে, সারা ময়দানে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আরোহীদের স্বচ্ছ-শুভ্র তলোয়ার সূর্যালোকে ঝলমল করছে।

কিছু খ্রিস্টান সৈন্য তখন পর্যন্ত দুর্গ প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়েছিল। এক সময় খ্রিস্টান সৈন্যদলে রণবাদ্য বেজে উঠলো। এর ভয়ঙ্কর সুর সারা ময়দানে প্রতিধ্বনিত হলে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর একজন খ্রিস্টান সৈন্য একটি সবল ঘোড়ায় চড়ে সামনে এগিয়ে এলো। সৈন্যটির ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে তার শক্তিমত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী।

সে উভয় বাহিনীর ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বর্ম ও তলোয়ার চিকচিক করছিল। সে চিৎকার করে বললো, যার মৃত্যুর সাধ আছে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধে আসতে পারো। মুসলমানরা তার কথা বুঝতে পারলো না, তবে তার ভাবগতি দেখে এতদূর বোঝা গেল যে, সে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

তাহির ছিলেন একজন তরুণ মুসলিম মুজাহিদ ও অত্যন্ত সাহসী।

তিনি দ্রুত যায়দের কাছে গিয়ে বললেন, দয়া করে আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিন।

যায়দ তাঁকে অনুমতি দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। তবে সকলের উপর হামলা চালিয়ো না।

তাহির ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গেলেন। খ্রিস্টান সৈন্যটি তাঁকে দেখে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো,

তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ? কেন অযথা নিজের জীবনটা খোয়াতে চাচ্ছ। এর চাইতে বরং সবল কাউকে আমার কাছে পাঠাও।

তাহির তার কথা কিছুই বুঝতে পারলো না তিনি বললেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

খ্রিস্টানটি বুঝতে পারলো যে, যুবকটি যেতে রাজী নয়। অতএব সে কালবিলম্ব না করে সর্বশক্তি দিয়ে তাহিরের উপর হামলা চালালো। খ্রিস্টানটি তাঁকে খুবই হেয় মনে করেছিল; কিন্তু তাহির অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। এক্ষণে খ্রিস্টানটি বুঝতে পারলো যে, তাহির একজন সাধারণ যোদ্ধা নয়।

ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উভয় সৈন্যদল দাঁড়িয়ে তাদের যুদ্ধ দেখছিল। ঘোড়ার পায়ের নিক্ষিপ্ত ধূলো-বালি দর্শকদের চোখকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তারা উভয়েই তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করছিল। প্রত্যেকেই একে অপরকে ক্ষিপ্রগতিতে আঘাত হানছে এবং একই গতিতে তা প্রতিরোধ করছে। হামলার চাপ ছিল অত্যন্ত প্রবল।

একবার হঠাৎ খ্রিস্টান সৈন্যের তলোয়ারটি মাটিতে পড়ে গেল। সে ঘাবড়ে গেল। এক সময় দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সে তাহিরকে গিয়ে ঝাপটে ধরল। তাহিরও তাঁর তলোয়ার মাটিতে ফেলে দেন এবং খ্রিস্টানটির সঙ্গে শারীরিক শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। খ্রিস্টানটির বিশ্বাস ছিল যে, সে প্রথম দফায়ই তাহিরকে উপরে ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সে যখন তাহিরকে নাড়াতে পারলো না, তখন সে ভীত হয়ে পড়ল।

অপরদিকে তাহির তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে খ্রিস্টানটিকে ঝাপটে ধরলো এবং তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে খ্রিস্টানটিকে উপরে তুলে এক পাক ঘুরিয়ে জোরে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠলো এবং খ্রিস্টানটির উপর পা মারিয়ে পালিয়ে গেলো। খ্রিস্টানরা সঙ্গীর এ করুণ পরিণতি দেখে হৈ চৈ শুরু করলো এবং দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সদলবলে এগিয়ে এলো।

তাহির মৃত খ্রিস্টানটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন; কিন্তু হৈ চৈ–এর শব্দ শুনে সে দেখতে পান যে, খ্রিস্টানরা তলোয়ার উচিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি মাটি থেকে নিজ তলোয়ারটি তুলে দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে বসেন।

তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঠিক করে বসতে না বসতেই খ্রিস্টানরা তাঁকে ঘিরে ফেললো এবং তার উপর আক্রমণ চালালো। তাহির সে আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ চালান এবং বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার চালাতে থাকেন। তাঁর তলোয়ারের আঘাতে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো। খ্রিস্টানরা তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষোভে–দুঃখে মাথা কুটতে লাগলো।

খ্রিস্টানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল; কারণ তাদের ক্ষোভ-প্রচেষ্টা সবই যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল। তাদের যে-ই তাহিরকে হামলা করার জন্য

এগিয়ে যেতো সে-ই নিহত হতো। নিছক একজন মুজাহিদের কাছে তাদের এ করুণ পরিণতি তাদেরকে আরো বেশী পীড়া দিচ্ছিল। কারণ এখন পর্যন্ত সে মুজাহিদটি সামান্য আহত পর্যন্ত হলো না। খ্রিস্টানরা মরিয়া হয়ে তাহিরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। কিন্তু তাহির একটুও ঘাবড়ালো না; বরং একই গতিতে যুদ্ধ করে খ্রিস্টানদের নিধন করছিলেন।

ইতিমধ্যে অন্য মুজাহিদরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন। মুসলমানদের সে তাকবীর ধ্বনি শুনে খ্রিস্টানরা আরো ভয় পেয়ে গেলো। তারা দেখতে পেলো যে অন্য মুসলমানরা তলোয়ার উঁচিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসেই মুসলমানরা একযোগে আক্রমণ চালালো। প্রথম আক্রমণেই মুসলমানরা প্রত্যেকের কাছাকাছি অন্তত একেক জন খ্রিস্টানকে হত্যা করলো। নিজেদের এ অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং আরো প্রবল বেগে আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুসলমানরা ছিল যেন লৌহপ্রাচীর। খ্রিস্টানদের কোন আক্রমণই তাদের ক্রিয়া করতে পারলো না; বরং পাল্টা এমন আক্রমণ চালাতো যে, খ্রিস্টানরা মৃত্যুবরণ ছাড়া কোন পথ পেতো না।

ইতিমধ্যে সারা ময়দানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত রণাঙ্গনে শুধু তলোয়ারের দ্রুত উঠানামার দৃশ্য। চারদিকে মারমার, কাটকাট রব। মাটিতে রক্তের বন্যা স্রোত। শরীর থেকে হাত-পা-মাথা ছিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে।

এদিকে খ্রিস্টানদের প্রাচীররক্ষীরাও হৈ চৈ শুরু করলো, আহতদের চিৎকার ধ্বনি ধ্বনিত-মথিত হতে লাগলো; কিন্তু মুসলমানরা ছিল সম্পূর্ণ নীরব। তাঁরা মাথা নিচু করে শুধু যুদ্ধই করে যাচ্ছে। তাঁদের প্রতিজ্ঞা সকল শত্রুসৈন্যকে খতম না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। তাদের যেন বিদ্যুৎগতি। একের পর এক খ্রিস্টান সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তাহির প্রথম স্থানটিতে দাঁড়িয়েই এখনো যুদ্ধ করছেন। তাঁর চারপাশে লাশের স্তূপ পড়ে গেছে; কিন্তু তাঁর আক্রমণের গতি এখনো স্তিমিত হয়নি। যে-ই তাঁর কাছে যেতো তাকে নরকে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর সমস্ত শরীর শত্রুদের রক্তে ভিজে গেছে। চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু কোন দিকেই তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি কেবল লড়েই যাচ্ছেন।

তাহির যখন দেখতেন যে, কোন একজন মুজাহিদ একজন খ্রিস্টানকে হত্যা করেছে, তখন তিনি আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন এবং আরো প্রবল বেগে আক্রমণ চালাতেন। তাঁর অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যেন তিনি নিজেই সমস্ত শত্রুসৈন্য খতম করে ফেলবেন। সকল মুজাহিদই এ আশা পোষণ করতেন। সবারই ইচ্ছে যে, তিনি নিজেই যেন তার নিজ হাতে সব শত্রুকে হত্যা করতে পারেন।

কিন্তু খ্রিস্টানরাও তো রক্ত-মাংসের মানুষ; বরং আরো সুস্থ-সবল ও সশস্ত্র; অথচ তারা একের পর এক মার খেয়ে যাচ্ছে। আসলে মুসলমানরা যখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো,

তখন তারা পাহাড়সম বাধাকেও ভ্রুক্ষেপ করতো না; বরং উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট হতো। তাছাড়া মুসলমানরা বিশ্বাস করতো যে, জীবন-মরণ উভয়েই তাদের সফলতা রয়েছে। মৃত্যুবরণ করলেও তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহে ধন্য হবে। তাই তাঁরা মৃত্যুকে ভয় করতো না

আসলে মৃত্যু মানুষের জন্য এক মহাভীতিকর বিষয়। যে জাতি মৃত্যুকে ভয় পায় না, জগত তাদেরকে ভয় পায়। মুসলমানদের অবস্থা হয়েছিল তাই। তাঁরা মৃত্যুকে জীবনের উপরে প্রাধান্য দিতো। তাই কোন জাতি তাদের মুকাবিলা করতে পারতো না।

যায়দ এক হাতে পতাকা অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যে শত্রুসারির দিকে ধাবিত হতেন, তাকে উল্টে দিতেন। যে ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যেতেন, তাকে খতম না করে ক্ষান্ত হতেন না।

যায়দ অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। সামনে পেছনে, ডানে-বামে সমানে আক্রমণ চালাচ্ছেন। তাঁর আক্রমণের শিকার হচ্ছে অসংখ্য খ্রিস্টান। হয়ত তিনিও আশা করছিলেন যে, সমস্ত শত্রুসৈন্য যেন তিনি নিজ হাতে খতম করতে পারেন।

সূর্য তখন মধ্য গগনে। তাই সূর্যের তাপ অনেকটা বেড়ে গেছে। প্রত্যেক সৈন্যের গা থেকে দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে। এ তাপে মুজাহিদরাও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তাকবীর ধ্বনি দিয়ে প্রবল বেগে আক্রমণ চালালেন। এ আক্রমণে প্রায় দু'হাজার খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো। এ অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা ঘাবড়ে গেলো এবং দুর্গের দিকে পালাতে লাগলো।

মুসলিম মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো এবং হত্যা করতে লাগলো। ফলে দুর্গ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়লো। খ্রিস্টানদের দুর্গে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরাও দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

খ্রিস্টানরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হচ্ছিল। মুসলমানরা কেমন লোক যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না? দুর্গের ভেতরেও মুসলমানদের ঢুকে পড়তে দেখে খ্রিস্টানদের প্রাণ শুকিয়ে গেলো। তারা অস্ত্র ফেলে দিল। মুসলিম মুজাহিদরা আক্রমণ বন্ধ করে তাদেরকে গ্রেফতার করতে লাগলেন।

সাত

হারানো প্রিয়তমা

চিৎকারের শব্দ শুনে ইসমাঈল সেদিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এটি বিলকীসের শব্দ। তিনি দ্রুত ফল-ফুলের গাছে পা মারিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পান যে, একটি ফুল গাছের নিচে বিলকীস বেহুশ অবস্থায় পড়ে আছে। ইসমাঈল হকবাক হয়ে গেলেন, বিলকীস এখানে কিভাবে এলো এবং কিজন্যেই বা বেহুশ হয়েছে। নিকটে গিয়ে দেখতে পান যে, একটি কালো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। সাপটি বিলকীসের দিকে তাকিয়ে ছিল। তা দেখে ইসমাঈল ঘাবড়ে যান। তাঁর মনে ভয় হলো যে, সাপটি হয়ত বিলকীসকে দংশন করেছে। ইসমাঈলের পায়ের শব্দ শুনে সাপটি তাঁর দিকে তেড়ে আসল। ইসমাঈল তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দিয়ে সাপটিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। একটি পাথর ছুঁড়ে সাপটার মস্তক পিষে দিলেন। অতঃপর বিলকীসকে একটি সমতল স্থানে শুইয়ে দিলেন। তখন বিলকীস ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। মুখ সাদা বর্ণ ধারণ করেছে, চোখ বুঁজে এসেছে। এত আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছে যে, বোঝাই যাচ্ছে না।

ইসমাঈল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য কি করা উচিত ইসমাঈল কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন; কিন্তু বিলকীসের দিকে যতই তাকাচ্ছিলেন, তিনি ততই অস্থির হয়ে পড়ছিলেন।

সাপে কাটার কি চিকিৎসা, এ সম্পর্কে ইসমাঈল ভাবতে লাগলেন। তিনি শুনেছিলেন যে, সাপে কাটলে নাকি বেশী ঘুম আসে। তাই তাকে ঘুমুতে না দেয়া উচিত। কেননা ঘুমালে সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু বিলকীস ঘুমিয়ে আছে না অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। সাপে কাটলে কোথায় কেটেছে, তা জানতে পারলে ইসমাঈল হয়ত সেখানে বেঁধে দিতে পারতেন। তিনি বিলকীসের শরীরে নাড়া দিলেন, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

ইসমাঈল সিদ্ধান্ত নেন যে, বিলকীসের জামার আস্তিন খুলে প্রকৃত অবস্থা বুঝার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি একজন মুসলমান। আর মুসলমানরা জানে যে, একমাত্র বিয়ে ছাড়া পরনারীর শরীর তো দূরের কথা, চেহারাও দেখা অসিদ্ধ; কিন্তু এখন যে জীবন-মরণ সমস্যা। এমতাবস্থায় শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ নেই।

অতএব, ইসমাঈল বিলকীসের আস্তিনের বোতাম খুলতে লাগলেন। কিন্তু বোতাম খুলতে না খুলতেই বিলকীসের জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি ঘনঘন শ্বাস নিতে লাগলেন। অতঃপর চেহারাও উজ্জ্বল হতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে চোখ খুললো।

ইসমাঈল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ডাক দিলেন–বিলকীস!

এখনো বিলকীসের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসেনি। সে শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার চাহনি দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন ইসমাঈলকে চেনার চেষ্টা করছে। ইসমাঈলও বিলকীসের দিকে তাকিয়েছিলেন।

কিন্তু বিলকীসের মুখ থেকে তখন পর্যন্ত কোন কথা বের হচ্ছে না; কারণ তখনও বিলকীসের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। তাতে ইসমাঈল মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে, সাপে যদি কেটে না-ই থাকে, তবে এখনো তার মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না কেন?

ইসমাঈল চাচ্ছিলেন তাকে সাপের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন; কিন্তু আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে এরূপ আশংকায় কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তবে অত্যন্ত স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকলেন– বিলকীস!

বিলকীসের মুখ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসলো; বললেন, আপনি!

ইসমাঈল–হাঁ, আমি। তোমার কি হয়েছে?

বিলকীস কোন জবাব দিল না, কেবল মাথায় ইশারা করল।

ইসমাঈল–উঠতে পারবে কি?

বিলকীস– না, এখন বসতে পারবো না।

ইসমাঈল– কোথাও ব্যথা হচ্ছে?

বিলকীস– না।

ইসমাইল-কোন দুঃখ পেয়েছ কি?

তা হলে উঠতে পারছো না যে?

বিলকীস–খুব কষ্ট হচ্ছে।

ইসমাইল–কেন? কি হয়েছে।

বিলকীস–বলতে পারবো না।

ইসমাঈল–পানি খাওনি?

বিলকীস–খেয়েছি, তবে.........

ইসমাঈল–তবে কিসের, কি হয়েছে!

বিলকীস–হয়ত বেশী খেয়ে ফেলেছি।

ইসমাঈল–কম খেলেই তো হতো।

বিলকীস–বেশী পিপাসা পেয়েছিল তো।

ইসমাঈল–তোমাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দেই?

বিলকীস–না, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবো।

ইসমাঈল–অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে কেন?

বিলকীস–বলছি, আমাকে সব মনে করতে দিন।

ইসমাঈল–ঘুম পাচ্ছে না তো?

বিলকীস–না।

ইসমাঈল–মাথাটা ভারী লাগছে?

বিলকীস–কিছুটা।

ইসমাঈল–বেশী পিপাসার পরে পানি পান করার জন্যেই হয়ত এরূপ হয়েছে।

বিলকীস–হয়ত তাই।

ইসমাঈল–কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?

বিলকীস–না।

ইসমাঈল–তাহলে উঠে বসে পড় না।

বিলকীস–আহা, বসবো তো একটু পরে।

ইসমাঈল–কি জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে, তা কি মনে পড়েছে?

বিলকীস-আপনি এসব জানতে চাচ্ছেন কেন?

ইসমাঈল–কারণ, তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

বিলকীস-আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

ইসমাঈল–তোমার জন্য পানির খোঁজ করতে।

বিলকীস–আমাকে একলা ফেলে?

ইসমাঈল–এটা অবশ্য আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু..........

বিলকীস–কিন্তু কিসের?

ইসমাঈল–তোমার পিপাসার কষ্ট দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

বিলকীস–আমি যে একা, এ ব্যাপারে আপনার খেয়াল ছিল না।

ইসমাঈল–আসলে তোমার পিপাসার কষ্ট দেখে আমি এসব ভুলেই গিয়েছিলাম।

বিলকীস–আমি এরূপ করতে পারতাম না।

ইসমাঈল–এরূপ পরিস্থিতি হলে তুমিও তা-ই করতে।

বিলকীস–তারপর পানি পেয়েছেন কি?

ইসমাঈল–হাঁ, একটি ঝরনার সন্ধান পেয়েছি।

বিলকীস–পানি এনেছেন কি?

ইসমাঈল–না, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে এসে দেখি তুমি সেখানে নেই। তাই হতভম্ব হয়ে পড়ি এবং তোমাকে খুঁজতে থাকি। বিলকীসের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বলে–কেন, আপনার হতবুদ্ধি হওয়ার কি আছে?

ইসমাঈল--কারণ আমি অনুতাপ করছিলাম যে, আমার ভুলের জন্যই তুমি আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ। আমি চিৎকার করে তোমাকে ডাকতে লাগলাম। তারপর তোমাকে দেখার জন্য একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করলাম; কিন্তু পা ফসকে সেখান থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম। তারপর একটি গাছ আঁকড়ে ধরলাম; কিন্তু গাছটি একটি বিরাট ফাটলসহ উপড়ে আমার উপরই পড়তে লাগল। পরিশেষে ভাগ্য গুণে বেঁচে গেলাম।

বিলকীস সমবেদনার দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে বলল–আল্লাহর হাজার শোকর যে, আপনি বেঁচে গেছেন।

ইসমাঈল–সর্বাধিক শুকরিয়া এইজন্য যে, তোমাকে পাওয়া গেল।

বিলকীস–আপনি পানি পান করেছেন?

ইসমাঈল–না।

বিলকীস–বিস্মিত হয়ে বলল, এখনো খাননি?

ইসমাঈল–তোমাকে না খাইয়ে তো আমি খেতে পারি না।

বিলকীস আফসোসের সুরে বলল–আপনি খাননি অথচ আমি খেয়ে ফেলেছি?

ইসমাঈল–এতে অনুতাপের কিছু নেই; বরং বলো যে, কেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

বিলকীস–একটি কালো সাপ আমার দিকে ফণা তুলে আসতে দেখেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

ইসমাঈল–তোমাকে দংশন করেনি তো?

বিলকীস–না।

ইসমাঈল–আল্লাহর শোকর যে, আমি সে সময় এখানে এসেছিলাম।

বিলকীস–আপনি কি করলেন?

ইসমাঈল–আমি সাপটিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলি।

বিলকীস–তাহলে ভাল করেছেন। এখন চলুন, আগে পানি খেয়ে নিন।

ইসমাঈল–উঠে দাঁড়ালেন এবং বিলকীসকে সঙ্গে নিয়ে পানি খেতে চলে গেলেন।

আট

রূপের রানী বিলকীস

উপত্যকাটি স্বর্গতুল্য। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজের সমারোহ। চারদিকে শুধু ফল আর ফুল। ফুলের সুবাসিত ঘ্রাণ আশপাশকে মোহিত করে ফেলেছে। ফল-ফুলের নরম গাছকে পা মাড়িয়ে তারা এমন একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছল, যেখান দিয়ে একটি ছোট ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছিল, বয়ে যাচ্ছিল স্বচ্ছ পানি।

বিলকীস ইসমাঈলকে বলল, এখানে স্বচ্ছ মিষ্টি পানি রয়েছে, খেয়ে নিন।

ইসমাঈল ঝরনার পার্শ্বে গিয়ে বসছিলেন। প্রথমে তিনি উযু করলেন; তারপর পানি পান করলেন। পানি খেয়ে উঠে দেখেন অনতিদূরে বিলকীস দাঁড়িয়ে আছে, তার চারপাশে রং-বেরঙের ফুল। সূর্যের ডুবু ডুবু অবস্থা। অস্তপ্রায় সূর্যের নীলাভ আলোয় বিলকীসের উজ্জ্বল চেহারা আরো উজ্জ্বলতর মনে হচ্ছিল।

বিলকীস পা ঝুলিয়ে একটি পাথরের উপর বসেছিলেন। তার পাশে প্রস্ফুটিত ফুল। সুন্দরী বিলকীসকে দেখে ওরাও যেন হেলেদুলে আনন্দ প্রকাশ করছে। ইসমাঈল তাঁর লাবণ্যময়ী চেহারার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বিলকীস তাতে লজ্জা পেলো, সে মাথা নিচু করে বসে রইলো। ইসমাঈলের কাছে তাকে আজ আরো মোহনীয় বলে মনে হচ্ছিল। তিনি বিলকীসের কাছে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, তুমি তোমার যাদুময়ী দৃষ্টি দিয়ে কাকে যাদু করছ?

বিলকীস লজ্জিত হয়ে মুচকি হাসল। বলল–যাদুময়ী দৃষ্টি আমার!

ইসমাঈল–হাঁ, তোমার দৃষ্টিতে যাদু রয়েছে।

বিলকীস ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে বলল–আপনাকে তো আর যাদু করিনি!

ইসমাঈল–আমাকে তো অনেক আগেই যাদু করে ফেলেছ।

বিলকীস–অভিমানের সুরে বললেন–তাহলে আমি কি যাদুকর?

ইসমাঈল–রাগ করেছ? তুমি যাদুকর না হলে যাদুকর আর কে হবে?

বিলকীস–আমি তো অবলা, যাদু জানবো কি করে?

ইসমাঈল–তুমি যাদু না জানলে তবে.....

বিলকীস–তবে কিসের?

ইসমাঈল–তাহলে আমিই যাদুকর।

বিলকীস আনত দৃষ্টিতে ইসমাঈলকে দেখছিল, আর মুচকি হাসছিল। তার এই মুচকি হাসি ইসমাঈলকে আরো ব্যাকুল করে তুলে। তিনি বললেন, এ যে এক সুন্দরী যাদুকন্যা।

বিলকীসের অবস্থাও তথৈবচ। সে ইসমাঈলকে বলল, আমি যদি যাদুকর হয়ে থাকি তাহলে আপনার সঙ্গে আমার আর কথা নেই।

ইসমাঈল ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বিলকীসের আরো কাছে গিয়ে বিনয়ের সুরে বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

বিলকীস তার মুখ ফিরিয়ে নিল এবং চারপাশে ফুল গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। ইসমাঈল তার হাত বাড়িয়ে বিলকীসের হাতকে হাতের মুঠোয় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার উপর রাগ করেছ?

বিলকীস–আপনার সঙ্গে কি আর কোন কথা থাকতে পারে?

ইসমাঈল–তাই তো জিজ্ঞেস করলাম, কি অপরাধ আমার?

বিলকীস–আমি তো মানুষ নই, যাদুকর।

ইসমাঈল–তুমিই বলো, আমি তোমাকে কি বলবো?

বিলকীস ইসমাঈলের হাতের মুঠোয় থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিল এবং মুখ ভার করে বসে রইল। ইসমাঈল তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি দেখছিলেন, অভিমানী ভাবটিও বিলকীসের আরেক রূপের প্রকাশ। তার চেহারাটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন সতেজ গোলাপের নরম পাপড়ি। ইসমাঈল বিলকীসের হাত আবার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

বিলকীস বলল, আপনার সঙ্গে কথা বলছে কে?

ইসমাঈল–সেই মহিয়সী নারী যে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে।

বিলকীস–মুচকি হাসলো। ইসমাঈল বললেন, কি যাদুকর মহিলাই না তুমি!

বিলকীস–আবার একই কথা আরম্ভ করেছেন?

ইসমাঈল–তাহলে আমি কিছুই বলবো না।

বিলকীস–হাঁ, এসব কথা আর বলবেন না।

ইসমাঈল–আচ্ছা ঠিক আছে, তা হলে আর বলবো না।

বিলকীস ইসমাঈলের দিকে তাকালো এবং মুচকি হেসে বলল,

আচ্ছা–আপনি কি তাহলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?

ইসমাঈল–আমি ভয় পেলে তোমার কি হবে?

বিলকীস–তাহলে তো দেখছি, সত্যিসত্যিই আপনাকে এবার ভয় পাইয়ে দিচ্ছি?

ইসমাঈল–ভয় তো পাবই, কারণ তুমি যা নির্মম!

বিলকীস হাসতে লাগলেন। তার স্বচ্ছ-শুভ্র দন্তরাজি মোতির মত ঝকঝক করছিল। তার হাসি যেন বিদ্যুৎ ছড়াচ্ছে। ইসমাঈল অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিলকীস বলল, এমন করে কি দেখছেন?

ইসমাঈল–তুমি যে কত সুন্দর।

বিলকীস–যা বলার একেবারেই বলে ফেলেন।

ইসমাঈল–বলতে তো চাচ্ছি। কিন্তু পারছি না তো।

বিলকীস–আড়দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কেন?

ইসমাঈল–তোমার রাগের ভয়ে।

বিলকীস–দেখুন তো, এ জায়গাটি কত সুন্দর।

ইসমাঈল–স্থানটি যেন বেহেশতের একটি টুকরা। আর......

বিলকীস–আর?

ইসমাঈল–তুমি হচ্ছো এ বেহেশতের হুর।

বিলকীস লজ্জা পেলো। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মনে হয়?

বিলকীস–আমার আর কি মনে হবে।

ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে যেখানে বসিয়ে রেখেছিলাম তুমি সেখান থেকে উঠে গিয়েছিলে কেন?

বিলকীস–আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে আপনাকে না দেখে আমি খুব ঘাবড়ে যাই। আমার আশংকা হলো, আপনি হয়ত বিরক্ত হয়ে আমাকে রেখে গেছেন।

ইসমাঈল–এটি তোমার নিছক ভুল ধারণা।

বিলকীস–পুরুষদের বিশ্বাস করা যায় না।

ইসমাঈল–আর মেয়েদেরকে?

বিলকীস-মেয়েরা প্রতিশ্রুতিশীল।

ইসমাঈল–প্রতিশ্রুতিশীল!

বিলকীস–উচ্চস্বরে বলল, হাঁ।

ইসমাঈল–যাক, তারপর কি করেছ?

বিলকীস–আমি ভীত হয়ে সেখান থেকে উঠে যাই। কিছুদূর গিয়ে পানির একটি ঝরনা দেখতে পাই। সেখান থেকে পানি পান করি এবং আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে যাই। আমি হঠাৎ একটি সাপ দেখতে পাই। সাপটি ফণা তুলে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠি এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

ইসমাঈল–তুমি অনর্থক ভয় পেয়েছ।

বিলকীস–কেন?

ইসমাঈল–সে তোমার কোন ক্ষতি করতো না।

বিলকীস–কেন?

ইসমাঈল–সাপটিও তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বিলকীস লজ্জিত হলো। ইসমাঈল বললেন, আমি এসে দেখি সাপটি ফণা তুলে তোমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যেন তোমার সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

বিলকীস প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, রাত তো হয়ে এলো। আমরা কি আজ এখানেই রাত কাটাবো?

ইসমাঈল–না। বসো, আমি আসরের নামায পড়ে নেই। এই বলে ইসমাঈল উযু করে নামায পড়েন। তারপর বিলকীসকে নিয়ে ঝরনার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তার ধারণা ছিল, ঝরনাটি হয়ত উপত্যকা থেকে বেরিয়ে আরো দূর পর্যন্ত বয়ে গেছে। ঝরনার দু'ধারে সবুজ আর সবুজের সমারোহ, প্রস্ফুটিত রাশি রাশি ফুল।

তারা উভয়েই ধীরে ধীরে সামনে এগুতে লাগলেন। উপত্যকাটি ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচের দিকে গিয়েছে। মাইল খানেক যাওয়ার পর দেখা গেল যে, ঝরনাটি আরো সরু হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং নিচে একটি টিলায় পতিত হচ্ছে।

আরো এগিয়ে দেখা গেল যে, ঝরনার পাশে প্রায় দু'ফুট প্রশস্ত একটি খাড়া পথ রয়েছে। ইসমাঈল বললেন, আমরা এ খাড়া পথে নিচে নেমে যেতে পারবো।

বিলকীস–তাহলে চেষ্টা করে দেখা যাক।

ইসমাঈল–তুমি ভয় পাবে না তো?

বিলকীস–না।

ইসমাঈল–দেখ, আমরা অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছি এবং পথটিও অত্যন্ত সরু।

বিলকীস–আমার ব্যাপারে ভয় নেই।

ইসমাঈল–তাহলে আমার হাত ধরে পেছনে পেছনে নেমে আস।

বিলকীস–আচ্ছা ঠিক আছে।

ইসমাঈল বিসমিল্লাহ বলে এগুতে লাগলেন। বিলকীস পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। পথটি ছিল অসমান, কখনো উঁচু আবার কখনো নিচু। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পথ। একটু ব্যতিক্রম হলেই গভীর খাদে পড়ে যেতে হবে। ইসমাঈল অত্যন্ত সাবধানে নামছিলেন এবং বিলকীসকেও নামাচ্ছিলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন।

আল্লাহ আল্লাহ্ করে পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে এক সময় তারা নিচে সমতল ভূমিতে নেমে এলেন। তারা আল্লাহর শুকরিয়া জানাল। ইসমাঈল উযু করে মাগরিবের নামায আদায় করেন।

নয়

জিহাদী প্রেরণা

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টানরা বেকা উপত্যকার নদীতীরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কর্ডোভা, মালাগা ও অন্যান্য দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। তারিক তাঁর সৈন্যদলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। একটি দল তাঁর সঙ্গে ছিল। এই দলকে সঙ্গে করে তিনি স্পেনের তৎকালীন রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুগীছ আর-রূমীকে কর্ডোভার দিকে এবং যায়দকে মালাগায় পাঠান। যায়দ মালাগা অধিকার করে ফেলেন। মুগীছ আর-রূমী কর্ডোভায় পৌঁছেন এবং দুর্গের অনতিদূরে অবস্থান গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের নীতি ছিল, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তাঁরা কোন দেশ আক্রমণ করতেন না। তাঁরা প্রথমে দূত পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিতেন। এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন।

সে নিয়ম অনুযায়ী মুগীছ আর-রূমী প্রথমে কর্ডোভাবাসীদের কাছে একজন দূত পাঠান। কর্ডোভায় রডারিকের এক আত্মীয় দুর্গের অধিপতি ছিলেন। প্রথম থেকেই সেখানে অনেক সৈন্য প্রস্তুত রেখেছিলো; তদুপরি পরাজিত অনেক খ্রিস্টান সৈন্যও সেখানে গিয়ে জমায়েত হলো। ফলে দুর্গে সৈন্যসংখ্যা অনেক বেড়ে গেল।

দুর্গটি ছিল খুবই মজবুত ও দুর্জ্জেয়। খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল মুসলমানরা সহজে দুর্গ অধিকার করতে পারবে না। তারা দুর্গের সকল দ্বার বন্ধ করে দিল এবং প্রাচীরের উপর সৈন্য মোতায়েন করা হলো।

মুসলিম দূত দুর্গটির সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে ছিল আরবী পোশাক, হাতে ছিল ইসলামী পতাকা। খ্রিস্টানরা দূতকে দেখে শোরগোল শুরু করলো এবং সকল খ্রিস্টান জড়ো হয়ে আরব দূতকে দেখতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলো এরাই রডারিকের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছে।

হৈ চৈ শুনে দুর্গের প্রধানও সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং দুর্গচূড়া থেকে দূতকে দেখতে লাগলো। সে ধারণা করেছিল মুসলমানরা মানুষ নয়; কিন্তু এখন দূতকে

দেখে সে বললো, এ তো দেখছি আমাদের মতোই মানুষ। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা মুশকিল কিসের?

তার পাশেই একজন খ্রিস্টান সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। বেকা উপত্যকার যুদ্ধে সে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সে বলল হুযুর! দেখতে তো মানুষই মনে হয়, কিন্তু যুদ্ধ শুরু করলে তারা অতিমানব হয়ে যায়।

সেনাপতি মুখ ভার করে বলল, এ আবার কেমন কথা। ওরা তো আমাদের মতোই মানুষ; সুতরাং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা মুশকিল কিসের?

সৈনিক–যখন যুদ্ধে যাবেন, কেবল তখনই তাদেরকে বুঝতে পারবেন।

সেনাপতি–আমি তাদের সবাইকে হত্যা করবো অথবা পলায়নে বাধ্য করবো।

সৈনিক–দেখা যাক, কি হয়।

সেনাপতি–গর্বের সুরে বলল, দেখো তাই হবে।

সৈনিক–দূতটি যেন কি বলছে বলে মনে হচ্ছে।

মুসলিম দূত খুব উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, আমি তোদের নেতার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু খ্রিস্টানরা তার কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। সেনাপতি সৈনিকটিকে লক্ষ্য করে বলল, ইহুদীরা যে ভাষায় কথা বলে সে তো দেখছি সেই ভাষায় কথা বলছে।

সেনাপতি–তাহলে কোন ইহুদীকে ডেকে নিয়ে এসো। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক দৌড়ে গেল এবং দু'জন ইহুদীকে ডেকে নিয়ে এলো। সেনাপতি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, দেখ তো আগন্তুক কি বলতে চাচ্ছে।

একজন ইহুদী এগিয়ে গেলো এবং দূতকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে এবং কি জন্য এসেছ?

দূত–আমি একজন আরব মুসলমান ও দূত।

ইহুদী সেনাপতিকে দূতের পরিচয় জানালো। সেনাপতি বিস্ময়ের সুরে বলল, আরব মুসলমান! তারা তো সেই জাতি যারা রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে সিরিয়ায় পর্যুদস্ত করেছিল।

ইহুদী–জী হাঁ, তারা সেই জাতি।

সেনাপতি–দূতকে জিজ্ঞেস করো, সে কি বলতে চাচ্ছে।

ইহুদী–খুব জোরে তার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলো।

দূত–তোমরা হয়ত শুনেছ যে, রাজা রডারিক পরাজিত ও নিহত হয়েছে এবং তার সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের নেতার ইচ্ছে যে, আর কোন প্রকার রক্তপাত না ঘটিয়ে দুর্গটি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। আমরা তোমাদের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করছি। তোমাদের উপর যেসব কর আরোপ করা হয়েছে, সব মাফ করে দেয়া হবে। কেবলমাত্র খাজনা ও জিযয়া দিলেই চলবে।

ইহুদী সেনাপতিকে দূতের কথা বুঝিয়ে দিল।

দূত–আর তোমরা যদি সন্ধি করতে রাজী না হও, তবে দুর্গের উপর হামলা করা হবে এবং বিজয়ের পর কাউকেই ক্ষমা করা হবে না।

সেনাপতি–তোমরা জেনে রাখ, 'একশ' বছরেও দুর্গটি জয় করতে পারবে না।

দূত–অহংকার করো না। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আজকেই দুর্গটি আমাদের অধিকারে এনে দেবেন।

সেনাপতি–তাহলে তোমরা তোমাদের আল্লাহ্র সঙ্গে মিলে চেষ্টা কর।

দূত–তাই হবে। আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র সহায়।

দূত ফিরে আসেন এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে আলোচনার সমস্ত বিষয় মুগীছকে অবহিত করেন। মুগীছ আমামনকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং দুর্গে প্রবেশের কোন গোপন পথ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন।

আমামন–জী না, আমার জানামতে কোন গোপন পথ নেই।

মুগীছ–প্রাচীরের কোন অংশ কি নিচু?

আমামন–জী না, প্রাচীর খুবই উঁচু ও মজবুত। কিন্তু--------

মুগীছ–কিন্তু কিসের?

আমামন–প্রাচীরের একদিকে একটি ফাটল রয়েছে। সেখানে একটি গাছও আছে। সে ফাটলটি যদি মেরামত করা না হয়ে থাকে, তবে হয়ত দুর্গে প্রবেশের একটি পথ বের করা যেতে পারে।

মুগীছ–আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে। তবে দিনে নয়, রাতে।

আমামন–তা–ই ঠিক হবে।

মুগীছ–সবাইকে জানিয়ে দাও, তারা যেন দিনের বেলায় বিশ্রাম সেরে নেয়। রাতে অভিযানে বের হতে হবে।

মুজাহিদরা তা শুনে আনন্দিত হন। তাঁরা নিজ নিজ তাঁবুর সামনে গিয়ে অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করতে থাকে। মুগীছ ভেবেছিলেন যে, মুজাহিদরা হয়ত দিনে বিশ্রাম নেবে; কিন্তু মুজাহিদরা জিহাদী প্রেরণায় এত উদ্দীপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা সকল প্রকার আরামকে হারাম করে অস্ত্রের ধার পরীক্ষায় মত্ত হলো।

আসরের নামাযের পর দেখা গেল যে, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে এবং প্রবল বেগে বাতাস বইছে। তখন ছিল বর্ষাকাল। মেঘের গর্জন দেখে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বৃষ্টি নেমে এলো।

মুগীছ সকলকে সকাল সকাল খাবার সেরে নেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা ছিল। আকাশ প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিল এবং কালো মেঘ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল।

খাবার তৈরি শেষ হতে না হতেই বৃষ্টি নামলো। তখন সবেমাত্র অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু কোন ছাউনি না থাকায় খাবার তৈরি তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

তা সত্ত্বেও তারা আটা দিয়ে রুটি তৈরি করতে লাগল। ইতিমধ্যে মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। সকলেই সমস্ত কাজ ফেলে নামাযে চলে গেলেন। যার হাতে একটিমাত্র রুটি বাকী ছিল, তিনিও সেটি ফেলে নামাযে চলে গেলেন

ফরয নামাযে রত থাকা অবস্থায়ই প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, সেখানেও কোন ছাউনি ছিল না। তাই মুসলমানরা বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন এবং ভেজা অবস্থায়ই নামায আদায় করলেন।

ইতিমধ্যে উনুনের আগুনও নিভে গেল। মুজাহিদরা অতিকষ্টে আবার আগুন জ্বালালেন এবং বৃষ্টিতে ভিজেই রুটি তৈরি করেন। ভেজা কাপড় নিয়েই তারা রাতে আহার গ্রহণ করেন। আহার শেষ হতে না হতেই এশার আযান হলো এবং বৃষ্টিতে ভিজে এশার নামায আদায় করলেন। নামায শেষ হলে মুগীছ সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাইসব, যদিও এখন বৃষ্টি হচ্ছে এবং এমন সময় অভিযানে বের হওয়া তোমাদের কাছে খারাপ লাগবে, তথাপি আমার ইচ্ছে যে, এ সময়ই আমরা অভিযানে বের হবো। তবে আমার সঙ্গে এক হাজার সৈন্য হলেই চলবে।

চারদিক থেকে সমানভাবে আওয়াজ এলো– আমরা সকলেই এ বৃষ্টিতে বের হতে ইচ্ছুক। মুগীছ খুশী হলেন। বললেন, আমার বিশ্বাসও তাই ছিল, তোমরা সকলেই আমার সঙ্গে যেতে চাইবে। তবে আপাতত এক হাজার অশ্বারোহী হলেই চলবে।

মুসলিম মুজাহিদরা তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সকলকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখে মুগীছ বললেন, তোমরা সকলেই কি যেতে চাচ্ছ?

কয়েকজন বললেন, না।

মুগীছ–তাহলে তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

একজন বললেন, কারা যাবে আপনি তো নির্দিষ্ট করে বলেননি, তাই আমরা সবাই এসেছি। এখন আপনি যাদেরকে বলবেন তারাই আপনার সঙ্গে যাবে।

তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অযথা সকলকে কষ্ট দেয়ার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রথম দিকের এক হাজার সৈন্যকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

অতঃপর তিনি এক হাজার বীর মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের দিকে এগুতে লাগলেন।

দশ

দুঃসাহসিক অভিযান

মুগীছ এক হাজার সৈন্য নিয়ে দুর্গের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন বৃষ্টি আরো বেড়ে গেল। বাতাসের গতিও বৃদ্ধি পেলো। মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। মুজাহিদরা যদিও বর্ম পরিহিত ছিল, কিন্তু বৃষ্টির পানি মাথা ভিজে গণ্ডদেশ বেয়ে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। বাতাস ও বৃষ্টির গতি তখন এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মুজাহিদরা চোখ খুলতে পারছিলেন না এবং সামনে যেতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলমানরা এসব উপেক্ষা করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এগুতে লাগলেন। একে তো অন্ধকার রাত, তদুপরি ঝড়-বৃষ্টির সকল বাধাকে এড়িয়ে মুজাহিদরা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন।

প্রকৃতপক্ষে এত অন্ধকার নেমে এসেছিল যে, একান্ত কাছের জিনিসকেও দেখা যেতো না। মুজাহিদরা কেবল অনুমানের উপর ভর করে সামনে এগুচ্ছিলেন। বিদ্যুৎ চমকানো আলোতে তারা তাদের পথ দেখে নিতেন। এভাবে তারা এক সময় দুর্গ প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছলেন।

আমামনও তাদের সাথে ছিলো। ক্রমাগত ভেজার কারণে তার সর্দি লেগে গিয়েছিল। তার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারো মুখেই কথা নেই। সবাই একইভাবে ভিজছে; কিন্তু মুসলমানরা বেপরোয়া, কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনবরত মেঘ গর্জন, ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক এবং প্রবল বায়ুপ্রবাহের ফলে চারপাশ এরূপ নিনাদিত ছিল যে, ঘোড়ার পদধ্বনি তাতেই মিশে যেতো। ফলে ঘোড়ার পদধ্বনি প্রাচীররক্ষীদের শোনার আর সম্ভাবনা রইল না। মুসলমানরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে কোন খ্রিস্টানই প্রাচীর প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে না।

প্রাচীররক্ষীরা সকলেই মিনার কিংবা নিকটস্থ ব্যারাকে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মনে ভরসা ছিল, প্রাচীরে কোন ফাটল বা সুরঙ্গ পথ নেই। তাছাড়া তারা ভেবেছিল, এ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মুসলমানরা কোনমতেই তাঁবু থেকে বেরুবে না।

মুগীছ আমামনকে জিজ্ঞেস করেন–প্রাচীরটি কোন্ দিকে?

আমামন ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বলল—অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না হুযুর।

মুগীছ—তোমার তো দেখছি খুব ঠাণ্ডা লেগে গেছে

আমামন—জী হ্যাঁ।

মুগীছ—আমরা এ বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে এনে খুবই ভুল করেছি।

আমামন—এ বৃষ্টির মধ্যে আমাদের বের হওয়াই ঠিক হয়নি।

মুগীছ—তা হয়ত ঠিক। কিন্তু বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ হয়ত আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা যদি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি, তাহলে আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে।

আমামন—আপনারা কিসের তৈরি, তা আমার বুঝে আসে না। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় কোন কিছুই আপনাদের উপর প্রভাব ফেলে না। শত্রুদের আধিক্যও আপনাদেরকে পিছপা করতে পারে না।

মুগীছ—মুসলমানরা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, তারা বেপরোয়া হয়ে থাকে। তাই মুসলমানরা যখন কোন কিছু ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেই করে। ফলে তারা কখনো সে ইচ্ছে থেকে সরে দাঁড়ায় না। আল্লাহ্‌ও তাদের সাহায্য করেন। তাই তারা সফলতা লাভ করে।

মুগীছ—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ফাটলটি কোন্ দিকে তা বোঝার চেষ্টা কর।

আমামন—তাই ঠিক।

প্রতিটি মেঘ গর্জনের পরই বিদ্যুৎ চমকাতো। মুসলমানরা সেসময় পথ দেখার চেষ্টা করতেন এবং লক্ষ্য-যাত্রা নির্ধারণ করতেন। এবার বিদ্যুৎ চমকালে মুগীছ জিজ্ঞেস করলেন, কিছু কি আন্দাজ করতে পেরেছ?

আমামন—জী না, বিদ্যুতের ঝলক আমার চোখ বন্ধ করে দিয়েছে।

মুগীছ—ফাটলের কোন চিহ্ন কি তোমার মনে আছে?

আমামন—হাঁ, মনে পড়েছে। ফাটলের নিকট একটি গাছ রয়েছে।

মুগীছ—বেশ তাতেই হবে।

অতঃপর মুগীছ সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, মুসলমান ভাইসব! তোমরা প্রাচীরের কাছে একটি গাছের তালাশ করবে। তারপর তিনি সামনে এগুতে লাগলেন। সকল সৈন্য তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক সময় তারা উত্তর পার্শ্বে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে প্রাচীরের কাছে কয়েকজন মুজাহিদ একটি গাছ দেখতে পান। আস্তে আস্তে বললেন, গাছটি এখানে হুযুর। মুগীছও গাছটির কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারের জন্য তিনি গাছটিকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। ইতিমধ্যে আবার বিদ্যুৎ চমকালে তিনি গাছটি দেখতে পান এবং বললেন,

হাঁ, ঠিক–এটিই সেই বৃক্ষ। এখন ফাটল তালাশ কর।

মুগীছ সেখানে দাঁড়িয়ে যান তার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলও সেখানে দাঁড়িয়ে যান। সকলের চোখই তখন প্রাচীরের দিকে, সকলেই প্রাচীরের সে ফাটলটির অন্বেষণে ছিলেন। কিন্তু গাছের পাতা বেয়ে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার জন্য উপরে তাকান যাচ্ছিল না। তথাপি কয়েকজন উৎসাহী যুবক চোখে হাত রেখে উপরে তাকানোর চেষ্টা করেন এবং বিদ্যুতের আলোতে সে ফাটলটি দেখতে পান।

তারা মুগীছকে জানান, আমরা ফাটলটি দেখেছি।

মুগীছ–কোথায় ফাটলটি?

একজন মুজাহিদ–গাছের বৃহৎ যে ডালটি প্রাচীরের দিকে গিয়েছে ফাটলটি সোজাসুজি এর উপরে।

আমামনও সেখানেই দাঁড়ানো ছিল। সে বলল, হাঁ ফাটলটি ডালের সোজা সামনে।

মুগীছ–ডাল কি ফাটলটি পর্যন্ত পৌঁছেছে?

আমামন–জী না, ফাটলটি ডাল থেকে তিন-চার ফুট দূরে। শেষের ডালটি এত নরম যে, কোন মানুষের ভার বহন করতে পারবে না।

হালকা-পাতলা গড়নের একজন মুজাহিদ বললেন, আমার ভার বহন করবে। সকলের মধ্যে আমিই হয়ত সবচাইতে হালকা।

আমামন– না না, আপনি উঠার চেষ্টা করবেন না, তাহলে নিচে পড়ে মরে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

মুজাহিদ–মৃত্যুই তো আমাদের কাম্য।

আমামন–আপনাদের এ মনোবলই আপনাদের সফলতার কারণ।

মুগীছ–তাহলে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে উঠে পড়ো; কিন্তু যেখান থেকে নরম ডালটি শুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। বিদ্যুৎ চমকালে ডালটি তোমার ভার বহন করবে কি না এবং ফাটল পর্যন্ত যেতে পারবে কি না, তা দেখে নেবে।

আমামন–দু'টিই অসম্ভব ব্যাপার।

মুগীছ–তোমার কি অভিমত?

আমামন–ডালটিও তার ভার বহন করবে না এবং ফাটলটি পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না।

মুগীছ–আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, তিনিই আপনাদের সাহায্য করবেন।

যুবকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেল। নিচে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে গিয়েছিল। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যুবকটি পানি ভেঙে গাছটির নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। গাছটি ছিল সম্পূর্ণ ভেজা। তাই তাতে উঠা সহজ ছিল না। কিন্তু যুবকটি বিসমিল্লাহ বলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাছে উঠতে লাগল। ডাল থেকেও টপটপ করে বৃষ্টি

পড়ছিল; কয়েকবার পা ফসকে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু তাতেও সে ভয় পেলো না; বরং যথারীতি উঠতে লাগলো এবং এক সময় উঠে গেল।

উপরে উঠেই প্রাচীরের দিকে যে ডালটি গিয়েছিল তাতে আরোহণ করল। গোড়ার দিকটা যথেষ্ট মোটা ছিল। তাতে একজন মানুষ সহজেই আসা-যাওয়া করতে পারতো, কিন্তু ডালটি যতই সামনে গিয়েছে, ততই সরু হয়েছে। যুবকটি সামলিয়ে এগুতে লাগলো। বিদ্যুৎ চমকানোর সময় সে প্রাচীর দেখে নিতো। তার অন্তরে সফলতার আনন্দের সুর বেজে উঠেছিল এবং প্রাচীরের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল; কিন্তু ক্রমে ঝুলে পড়ছিল। বিদ্যুৎ আলোয় দেখতে পেলো যে, প্রাচীরের ফাটলটি আর মাত্র পাঁচ-ছ'ফুট দূরে। সে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বিসমিল্লাহ্ বলে এক লম্ফ দিয়ে ফাটলটির ঠিক ভেতরে গিয়ে বসে পড়ল। যেন, কেউ তাকে হাতে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। একটু উপরেই ছিল প্রাচীরের একটি আংটা। যুবকটি সে আংটা ধরে প্রাচীরের উপরে উঠে গেল।

প্রাচীরের উপরে উঠে যুবকটি দেখতে পেলো, সমস্ত প্রাচীরটি একেবারে জনশূন্য। কোথাও কোন খ্রিস্টান সৈন্যের লেশমাত্র নেই। সে তাড়াতাড়ি নিজ পাগড়ী খুলে নিচে লটকিয়ে ধরল এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগল, আমি প্রাচীরের উপরে উঠে এসেছি এবং পাগড়ী লটকিয়ে ধরেছি। আপনারা শীঘ্র উপরে উঠতে শুরু করুন।

আমামনের বিশ্বাস ছিল যে, যুবকটি কোনমতেই প্রাচীরে উঠতে পারবে না; কিন্তু প্রাচীরের উপর থেকে যখন তার আওয়াজ শুনতে পেলো, তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। বলল, অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

মুগীছ–এটা আল্লাহর মেহেরবানী।

অতঃপর সকল মুজাহিদ ঘোড়া থেকে নেমে প্রাচীরের নিকটবর্তী হলো এবং একের পর এক উপরে উঠে যেতে লাগল। এভাবে প্রায় পাঁচশ' মুজাহিদ প্রাচীরের উপর উঠে গেলেন। মুগীছ অবশিষ্টদের উঠতে বারণ করেন। তিনি বাকীদেরকে সদর দরজায় গিয়ে দরজা খোলার অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন।

দু'জন মুজাহিদকে কেবল দরজা খোলার দায়িত্ব দেয়া হলো। অশ্বারোহী পাঁচ'শ সৈন্যকে দরজার দিকে পাঠিয়ে দিয়ে মুগীছ নিজে প্রাচীরে উঠে গেলেন এবং প্রাথমিক এ সফলতার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জানান।

এগার

দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদীন

তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজার ফলে মুজাহিদদের সর্দি লেগে গিয়েছিল এবং ঠাণ্ডায় কম্পন শুরু হয়েছিল। মুগীছ দেখতে পান যে, তার সামনেই একটি বুরুজ রয়েছে। তিনি মাত্র ৫০ জন সৈন্য নিয়ে সে বুরুজে ঢুকে পড়েন। কক্ষটি যথেষ্ট প্রশস্ত। এর ভেতরে আলো জ্বলছিল। সেখানে অনেক খ্রিস্টান সৈন্য ঘুমিয়েছিল

মুগীছ সেখানে গিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। এই ধ্বনি শুনে খ্রিস্টানরা ঘুম থেকে উঠে পড়ে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই তাদের সামনে সশস্ত্র মুজাহিদদেরকে দেখে ঘাড়বে যায়। তারা দ্রুত অস্ত্র নেয়ার চেষ্টা করে। মুগীছ তাদেরকে ধমকিয়ে বলেন, তোমরা ভাল চাও তো অস্ত্র ফেলে দাও; কিন্তু খ্রিস্টানরা তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারল না বরং অস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

মাত্র ৫০ জন মুসলমানকে বুরুজের ভেতর দেখতে পেয়ে খ্রিস্টানরা বুঝতে পারলো না কিভাবে এ স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ভেতরে প্রবেশ করলো; অথচ বুরুজের ভেতরে খ্রিস্টানের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন শ'র মতো। তাই তারা সাহসী হয়ে উঠল। তারা ভাবল যে, হয়ত তারা এ স্বল্প সংখ্যক মুসলমানকে মেরে ফেলবে নতুবা প্রাচীর থেকে নিচে ফেলে দেবে।

খ্রিস্টানরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মুসলমানদের উপর হামলা চালালো। এতে মুসলমানরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা তলোয়ার নিয়ে খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং একের পর এক খ্রিস্টানদেরকে হত্যা করতে লাগল। খ্রিস্টানরা প্রাণপণে চেষ্টা করছিল এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে তলোয়ার চালাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো না; অপরপক্ষে মুসলমানদের কোন আক্রমণই লক্ষ্যচ্যুত হলো না। বরং তাদের প্রতিটি আক্রমণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানতো এবং খ্রিস্টানদের মৃতদেহ প্রাচীরের নিচে ফেলে দিত।

মুগীছ বুরুজের সিঁড়ি তালাশ করতে লাগলেন; কিন্তু গভীর অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না তারা অনেক চেষ্টা করলেন সিঁড়ির খোঁজে, কিন্তু সন্ধান করা গেল না এমনি করতে করতে তারা অপর আরেকটি বুরুজের কাছে এসে গেলেন।

মুগীছ সে বুরুজটির ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পান, সেখানেও খ্রিস্টান সৈন্য রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল জাগ্রত। বাকীরা ঘুমিয়ে। মুগীছ অল্প কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁদের দেখেই খ্রিস্টানরা কাঁপতে লাগল এবং জ্বিন এসেছে বলে চিৎকার শুরু করল।

সত্য কথা বলতে কি মুসলমানরা জ্বিনের মতই কাজ করছিল। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা যেভাবে কর্ডোভা দুর্গে এসে হামলা করেছিল, তা কোন মানুষের পক্ষেই হয়ত সম্ভব ছিল না। যাক, ভীত খ্রিস্টানদের বিকট চিৎকারে ঘুমন্ত খ্রিস্টানরাও জেগে উঠল। কিন্তু চোখ খুলে মুসলমানদেরকে দেখতে পেয়ে আবার চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়ে রইল।

মুগীছ চিৎকার করে বলতে লাগলেন–খ্রিস্টানরা, তোমরা অনর্থক মৃত্যুকে ডেকে এনো না, ভাল চাও তো অস্ত্র ফেলে দাও।

খ্রিস্টানদের কেউই তার কথা বুঝতে পারলো না। ফলে তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে অস্ত্র তুলে নিল এবং মুসলমানদের সামনে এসে দাঁড়ালো। মুসলমানরা তাদেরকে এমতাবস্থায় দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তলোয়ার উঁচিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল; খ্রিস্টানরা এতই ভীত ছিল যে, তারা কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। এ ভাবেই তারা মৃত্যুবরণ করতে লাগল।

যেসব খ্রিস্টান চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল, তারাও উঠে এলো, কিন্তু মুসলমানদের তীব্র আক্রমণের মুখে তারা টিকতে পারলো না। মুজাহিদরা তাদেরকে হত্যা করতে লাগলেন।

এ অবস্থা দেখে খ্রিস্টানরা চিৎকার করতে করতে বুরুজের বাইরে চলে এলো; কিন্তু বেরিয়ে এসে বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলো যে, আরো বহু মুসলমান প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রথমে তারা ভেবেছিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা হয়ত বুরুজে যে কয়েকজন প্রবেশ করেছে এ পর্যন্তই। তাই তারা আত্মরক্ষার জন্য বাইরে বেরিয়ে এসেছিল; কিন্তু বাইরে এসে যখন আরো বহু মুসলমান প্রাচীরের উপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো দেখলো, তখন তারা চিৎকার করতে করতে বুরুজের অন্যদিকে চলে গেল।

বুরুজের বাইরে যেসব মুজাহিদ দাঁড়ানো ছিল, তারা খ্রিস্টানদেরকে পালাতে দেখে পিছু ধাওয়া করেন। মুসলমানরা তাদের পিছু দৌড়াচ্ছে আর খ্রিস্টানরা চিৎকার করতে করতে দ্রুত পালাচ্ছে।

কিছুদূর গিয়ে খ্রিস্টানরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলো। মুসলমানরাও তাদের পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। খ্রিস্টানরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল আর সাহায্য চাচ্ছিল।

ব্যারাকগুলো ছিল প্রাচীরের নিচে। তাদের চিৎকার ধ্বনি অন্যান্য ঘুমন্ত খ্রিস্টানকে জাগিয়ে তুলেছিল। ব্যারাকের খ্রিস্টানরা সঠিক অবস্থা বোঝার জন্য ব্যারাকের ভেতর থেকে দরজায় উঁকি দিল।

তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। তবে প্রবলতা অনেকটা কমে এসেছে। মেঘের গর্জনও অনেকটা কমে গেছে। তবে অন্ধকার তখনও কাটেনি। ফলে চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

প্রাচীরের উপর থেকে খ্রিস্টানরা যখন চিৎকার করতে করতে দৌড়াচ্ছিল, তখন ব্যারাকের খ্রিস্টানরাও তা শুনতে পেয়েছিল; কিন্তু কি ঘটছে কারোরই বাইরে এসে তা তলিয়ে দেখার সাহস ছিল না। বরং যেসব ব্যারাকে বাতি জ্বলছিল, তারাও ভয়ে আলো নিভিয়ে দিল। তাদের ভয়, মুসলমানরা যদি ভেতরে এসেই পড়ে তবে তো ব্যারাকে হামলা চালাতে পারে।

বুরুজ থেকে বেরিয়ে যারা পালানোর চেষ্টা করছিল তাদের অনেকেই নিহত হলো, যারা জীবিত ছিল, তারাও চিৎকার করতে করতে এদিক-সেদিক দৌড়াতে লাগল।

প্রকৃতপক্ষে তারা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। তাই চিৎকার করে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। তারা যদি চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে কোন ব্যারাকে আত্মগোপন করতো, তবে হয়ত মুসলমানদের পক্ষে তাদের পিছু ধাওয়া করা সম্ভব হতো না। কিন্তু চিৎকার করে তারা পিছু ধাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

অতএব, ফল এই দাঁড়ালো যে, এক এক করে সকল খ্রিস্টানকে হত্যা করা হলো। এক সময় খ্রিস্টানদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেলে মুসলমানরা ধরে নিল যে সকল খ্রিস্টান নিহত হয়ে গেছে, যদিও কেউ কেউ দুর্গের ভিতরে আত্মগোপন করেছিল।

কিন্তু এত ঘন অন্ধকার ছিল যে দুর্গের ভিতর কোথায় ব্যারাক, কোন্ দিকে সদর দরজা কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। মুসলিম মুজাহিদরা দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এখন তারা কি করবেন। কোন্‌দিকে যাবেন। মুগীছ এখনো আসেননি, মুজাহিদরা তাঁর জন্যও অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর মুগীছও সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি এসেই জোরে তাকবীর ধ্বনি লাগান। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরাও খুব জোরে ধ্বনি দিলেন। দুর্গের চারদিকে এ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এতে খ্রিস্টানরা আরো ভীত হয়ে পড়ল।

অতঃপর মুগীছ সামনে এগুতে লাগলেন। মুজাহিদরা তাঁর পেছনে চললেন। সদর দরজাও তাঁদের সামনে পড়ে গেল। এখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশও পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকারও কমে গেছে। এক সময় তারা দরজার

কাছে এসে পৌছলেন। দরজার সামনে পাঁচ'শ খ্রিস্টান সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল। সম্ভবত তারা মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। কারণ তারা অত্যন্ত প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মুসলমানদেরকে দেখা মাত্রই সে সকল খ্রিস্টান সৈন্য যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

মুসলিম মুজাহিদরাও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল এবং তলোয়ার বের করে সামনে এগুতে লাগল। খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে এগুতে দেখেই আক্রমণ চালাল

মুসলমানরাও পাল্টা আক্রমণ চালাল। তাদের আক্রমণ ছিল আরো তীব্রতর। প্রথম আক্রমণেই প্রথম সারির প্রায় সকল সৈন্য নিহত হলো। পরক্ষণেই দ্বিতীয় সারির উপর হামলা চালালেন।

সারা রাতের বৃষ্টি ভেজায় মুজাহিদরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেক আক্রমণে পঞ্চাশ-ষাটজন খ্রিস্টানকে হত্যা করতে লাগল।

খ্রিস্টানরাও জোর আক্রমণের চেষ্টা করছিল; কিন্তু ভাগ্য ছিল তাদের প্রতি অপ্রসন্ন। তাই কোন আক্রমণই মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারলো না; বরং মুসলমানরা কচু কাটার ন্যায় একের পর এক খ্রিস্টানদের হত্যা করছে আর সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অধিকাংশ খ্রিস্টান সৈন্য মারা গেল; বাকীরা পালিয়ে গেল। কয়েক জন মুজাহিদ দরজায় এগিয়ে গেলেন এবং তালা ভেঙ্গে দরজা খুলে দিলেন।

মুগীছ যে পাঁচ'শ সৈন্যকে দরজার বাইরে অপেক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তারাও সামনেই উপস্থিত ছিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভেতরে চলে এলো। তখন সুবহে সাদিক হয়ে এসেছিল। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোর রেখা ফুটে ছিল।

পাঁচ'শ অশ্বারোহী একসঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেই দুর্গের চারপার্শ্বে চক্কর দেয়ার ইচ্ছা করে। ইতিমধ্যে বাইরেও তাকবীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুসলমানরা বুঝতে পারেন যে, তাদের সকল সৈন্য এসে গেছে। অতএব তারাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি লাগালেন। ইতিমধ্যে সকল মুজাহিদ ভেতরে এসে প্রবেশ করেছে। মুগীছ তাদের সামনে এসে দাঁড়ান।

বার

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

কর্ডোভার খ্রিস্টানরা রাতের ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে ঘরের ভেতরে লুকিয়েছিল এবং তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ আল্লাহু আকবারের গগনবিদারী আওয়াজ শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা জানতে পেরেছিল যে, গতকাল সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম দূত এসেছিল; কিন্তু তারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, পুরো এক বছর অবরোধ করলেও মুসলমানরা তাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু আজ তাকবীর ধ্বনি শুনে তাদের সব কিছুই যেন উলট-পালট হয়ে গেলো। বাস্তবিক পক্ষে কি ঘটছে তা দেখার জন্য ব্যারাক থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসেই তারা দেখতে পেলো যে, মুসলমানরা বুরুজের সকল খ্রিস্টানকে হত্যা করে ফেলেছে এবং এদিক-ওদিক তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে।

ইতিমধ্যে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের উপক্রম হচ্ছে। কোথাও কোন অন্ধকার নেই।

মুসলমানরা ফাটল পেরিয়ে একটু এগিয়ে এসেই ব্যারাকের সৈন্যদেরকে দেখতে পান। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করার কোন মানসিকতা ছিল না; কিন্তু মুসলমানরা হামলা চালালে তারাও আত্মরক্ষার চেষ্টা করল; মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুসলমানদের সামনে এসেই তারা হতচকিত হয়ে পড়তো, যেমনভাবে ব্যাঘ্রের সামনে পড়লে মানুষ হতচকিত হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টানদের এ অবস্থা মুসলমানদেরকে আরো সাহসী করে তুলে। তারা সেখানে খ্রিস্টানদেরকে হত্যা করতে থাকে। অনন্যোপায় হয়ে খ্রিস্টান সিপাহীরা চিৎকার করে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে এবং তাদের সাহায্যের আহ্বান জানায়। তাদের চিৎকার ধ্বনি চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; কিন্তু মুসলমানদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কোন পরোয়া নেই। তাদের তলোয়ার দ্রুত আন্দোলিত হচ্ছে। আর একের পর খ্রিস্টানকে হত্যা করছে।

দুর্গের সেনাপতি হৈ চৈয়ের শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রহরীদের জিজ্ঞেস করল, কিসের হৈ চৈ হচ্ছে? সৈন্যরা চিৎকার করছে কেন?

একজন প্রহরী–দুর্গের ভেতর মুসলমানরা ঢুকে গেছে হুযুর।

সেনাপতি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল, বলল–

মুসলমানরা দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে!

প্রহরী–জী হাঁ হুযুর।

সেনাপতি–তুমি দেখেছ?

প্রহরী–না হুযুর।

সেনাপতি– তাহলে কি করে জানলে?

প্রহরী–ব্যারাকের একজন সিপাহী পালিয়ে এসে বলে গেছে।

সেনাপতি–সে কি মুসলমানদের দেখেছে?

প্রহরী–জী হাঁ, দেখেছে। সে বলল, মুসলমানরা ভেতরে ঢুকে ব্যারাকের সিপাহীদের হত্যা করছে।

সেনাপতি–দুর্গে প্রবেশ করল কি করে?

প্রহরী–ওরা তো জ্বিন হুযুর। জ্বিনদের তো কোথাও আসা-যাওয়ার কোন অসুবিধে নেই।

সেনাপতি–নিশ্চয়ই তারা জ্বিন বা অন্য কিছু। তারা মানুষ নয়। মানুষ হলে যেখানে পশু-পাখী ঢুকতে পারে না, সেখানে ওরা আসে কিভাবে?

প্রহরী–যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে জলদি সেখানে চলুন হুযুর।

সেনাপতি–হাঁ, যাচ্ছি; তুমি সৈন্যদের একত্রিত কর, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

প্রহরী–সেটাই ভাল হুযুর।

সেনাপতি চলে গেল। প্রহরী সকল সিপাহীদের একত্রিত করে।

ইতিমধ্যে সেনাপতিও প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এসেই জিজ্ঞেস করল। সকল সিপাহী এসেছে তো?

প্রহরী–জী হাঁ।

সেনাপতি–তোমরা সকলেই আমার সঙ্গে এসো। সেনাপতি সেখান থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং দুর্গ প্রাচীরের দিকে এগুতে থাকে।

মুসলমানরা তাদের সৈন্যবাহিনীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। এক ভাগ ব্যারাকের সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়, দ্বিতীয় ভাগ বুরুজ থেকে বেরিয়ে আসা সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়, তৃতীয় ভাগ শহর থেকে আগত সেই সকল খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালায়- যারা দেশ ও জাতিবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

খ্রিস্টানরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারা অত্যন্ত মনোবল নিয়ে আক্রমণ চালায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। খ্রিস্টানদের যারাই মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে এগিয়ে যেতো, তারাই তলোয়ারের আঘাতের শিকার হতো। খ্রিস্টানদের শক্তি-সাহস কিছুই কাজে আসতো না। মুসলমানরা ব্যাঘ্রের ন্যায় খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং তাদের যবনিকাপাত ঘটাতো।

মুসলমানদের তলোয়ার যেন একেকটি মৃত্যু-দানব, যাদেরই স্পর্শ করতো, তারাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। শত্রুদের রক্তে মুসলমানদের সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন রক্তের নদী থেকে ডুব দিয়ে এসেছে। তারা এমনভাবে ঘোড়া চালাতো যে, যেদিকেই ছুটতো সেদিকেই মৃত্যুর হিড়িক পড়ে যেতো।

স্থানে স্থানে ছিন্ন হাত-পা, মাথা স্তূপাকারে পড়ে আছে, জমে আছে স্তূপীকৃত মৃতদেহ। ইতিমধ্যে ব্যারাকের সকল সৈন্যও বেরিয়ে আসছে এবং মরণপণ যুদ্ধ করছে। কিন্তু তারা ছিল পদাতিক আর মুসলমানরা ছিল অশ্বারোহী; তবে খ্রিস্টানরা ছিল সংখ্যায় অধিক। তা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের ন্যায় শক্তি সঞ্চয় করতে পারছে না। ফলে তারা অধিক পরিমাণে নিহত হচ্ছে।

খ্রিস্টানরা চাচ্ছিল তারা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে অথবা দুর্গ থেকে বের করে দেবে; কিন্তু এটা সাধ্যাতীত। যদিও কিছু মুজাহিদ শহীদ হয়েছে, তবে তা সংখ্যায় অতি নগণ্য। কদাচিৎ কোন মুসলমান শহীদ হতেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা বহুল পরিমাণে নিহত হচ্ছিল আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল। আহতরা আরো জোরে চিৎকার করতো।

তাদের আর্তচিৎকারে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। স্থানে স্থানে জমাটবাঁধা রক্ত। এসব দেখে খ্রিস্টানরা আরো ভীত হয়ে পড়ল।

তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। হৈ-হাঙ্গামা শুনে আশপাশের খ্রিস্টানরা তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে। তারা দৌড়ে সংঘর্ষের স্থানে আসতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের দেখামাত্র দম বন্ধ করে এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অনেক সৈন্য নিয়ে দুর্গের সেনাপতিও এসে যুদ্ধে উপস্থিত হলো। সেনাপতি প্রথমেই মুগীছের বাহিনীর উপর হামলা চালায়। মুসলমানরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং খুব জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলে। তাদের এই ধ্বনি আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে। শত্রুসৈন্যরা তাতে থমকে গেল।

তাকবীর দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তীব্র আক্রমণ চালালেন এবং খ্রিস্টানদেরকে তৃণের ন্যায় কাটতে লাগলেন। মুগীছ দুর্গের সেনাপতির উপর হামলা চালান। মুগীছের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র দু'শ; আর খ্রিস্টান সেনাপতির সৈন্যসংখ্যা ছিল দু'হাজার।

কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপই নেই। বরং তারা অত্যন্ত শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তাঁদের তলোয়ারের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ খ্রিস্টানদের মধ্যে এ জন্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল যে, কোন মুসলমানই মৃত্যুবরণ করছে না এবং দুর্গও ত্যাগ করছে না; বরং নিজ নিজ অবস্থান থেকে একনাগাড়ে যুদ্ধ করছে। যারাই তাদের তলোয়ারের নাগালে এসেছে তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে। খ্রিস্টানদের ইচ্ছে ছিল যে করে হোক মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে দেয়া কিংবা তাদেরকে দুর্গ থেকে বের করে দেয়া কিন্তু তা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। তারা মুসলমানদের তলোয়ারেই যেন মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত শুধু জান বাঁচানোর চেষ্টা করলো।

যেসব মুজাহিদ শহর থেকে আসা খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করছিল তারা যুদ্ধের সমাপ্তি টানার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। খ্রিস্টানরা যদিও তাদের গতিরোধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না।

রক্তের স্রোত বয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে শহরের খ্রিস্টানরা বুঝতে পারলো, আর যদি এক ঘন্টা এভাবে যুদ্ধ চলে তবে মুসলমানরা কোন খ্রিস্টানকেই প্রাণ নিয়ে যেতে দেবে না। সুতরাং তারা অস্ত্র ফেলে দেয় এবং শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করতে থাকে। মুজাহিদদের ইচ্ছা হচ্ছিল সকল খ্রিস্টানকেই শেষ করে দেয়া; কিন্তু প্রধান সেনাপতির আদেশ তাদের মনে পড়ে গেল "তোমরা নিরস্ত্র মানুষের উপর হাত তুলবে না।"

সুতরাং মুজাহিদরা তলোয়ার খাপে পুরে রাখলো। তারা খ্রিস্টানদের বন্দী করতে লাগলো। এই সব খ্রিস্টান ভাবল যে, তাদের সঙ্গে অন্যরাও আত্মসমর্পণ করবে।

বন্দী খ্রিস্টানরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। তাদের কান্নাকাটির শব্দ শুনে ব্যারাক থেকে আগত সৈন্যরাও ভীত হয়ে পড়ল। যুদ্ধ করার মত তাদের আর সাহস রইলো না।

তারা করুণ দৃষ্টিতে মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুসলিম মুজাহিদরা বুঝতে পারলো যে যুদ্ধ করার মত তাদের আর শক্তি নেই। তারা এখন প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় লিপ্ত। অতএব, মুজাহিদরা এবার এক তীব্র আক্রমণ চালালো। এ হামলায় এক হাজার খ্রিস্টান নিহত হলো। রণাঙ্গণ মৃতদেহে ভরে গেল।

এই অবস্থা দেখে অবশিষ্টরাও অস্ত্র ফেলে দিল এবং হাত জোড় করে প্রাণভিক্ষে চাইলো। মুসলমানরা আক্রমণ বন্ধ করে দিল। কিছু কিছু মুজাহিদ বন্দী করার কাজে নিয়োজিত হলো এবং কিছু সৈন্য মুগীছের দলকে সাহায্য করার জন্য সেখানে গেল।

সে দলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তাই তখন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে আরো কিছু মুজাহিদ এসে মুগীছের দলে যোগ দিলেন এবং তীব্র আক্রমণ রচনা করলেন। এক আক্রমণেই বহু খ্রিস্টান নিহত হলো। দ্বিতীয় আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানরা ভয়ে পালাতে লাগলো। সবার আগে পালালো দুর্গের সেনাপতি।

মুজাহিদরা তার পিছু ধাওয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু মুগীছ তাদেরকে নিষেধ করেন এবং একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর সকল মুজাহিদ এক জায়গায় সমবেত হলো।

তের

কর্ডোভা বিজয়

মুসলিম মুজাহিদরা সারারাত ভিজেছিল এবং একনাগাড়ে যুদ্ধ করছিল। তাই মুগীছের ভয় ছিল যে, আরো বেশীক্ষণ ভেজা কাপড়ে থাকলে মুজাহিদরা হয়ত নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। এজন্যে তিনি মুজাহিদদেরকে দুর্গের সেনাপতির পিছু ধাওয়া করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি সকলকে কাপড় বদলে নেয়ার নির্দেশ দেন; কিন্তু সমস্যা এই দাঁড়ালো যে, কারো সঙ্গেই অতিরিক্ত কোন কাপড় ছিল না; কারণ সকলেই তাদের কাপড়-চোপড় তাঁবুতে রেখে এসেছিল।

এ অবস্থা দেখে মুগীছ পাঁচশ মুজাহিদকে তাঁদের তাঁবু থেকে কাপড়-চোপড়সহ সকল জিনিসপত্র নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। বাকী সৈন্যদেরকে গায়ের কাপড় খুলে শুধু সেলওয়ার পরে রৌদ্রে বসে থাকার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সকলেই গায়ের কাপড় খুলে রোদ পোহাতে লাগলো। বাস্তবিকপক্ষে সে সময় এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অনেক মুজাহিদই অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে মুজাহিদদের তাঁবুর সকল জিনিসপত্র নিয়ে আসা হলো। মুজাহিদরা শুকনো কাপড় পরে প্রাচীরের কাছাকাছি তাঁবু ফেলেন। কয়েদীদেরকে তাঁবুতে রাখা হলো এবং দু'শত মুজাহিদকে প্রহরায় মোতায়েন করা হলো। বাকী সকলকে বিশ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মুজাহিদরা তাঁবুতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

সে যুগের মুসলমানদের জীবন-যাপন পদ্ধতিই ছিল বিস্ময়কর। তাদের শোবার ও খাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখনই সময় পেতো শুয়ে পড়তো; আবার যখনই সময় পেতো খেয়ে নিতো। সে যুগের মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ত্যাগ ও ধৈর্য ছিল বলেই তাঁরা সমগ্র বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু আজ আমরা এতই আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছি যে, গ্রীষ্মকালে গরমের ভয়ে আমরা মসজিদে যেতে চাই না, নামায পড়ি না। বর্ষাকালে বৃষ্টির বাহানা করি, শীতে ঠাণ্ডার ওজর দেখাই। আমরা জানি না যে, কিয়ামতের দিন আমাদেরকে নামায সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে।

হাশর তো পরকালে: কিন্তু দুনিয়ার অবস্থা তো সকলেরই জানা। প্রথম যুগের মুসলমানদের সম্মান ছিল, কারণ তাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল। তারা একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করতো। অথচ আমাদের মধ্যে সে নিষ্ঠাও নেই, একাগ্রতাও নেই। তাই আল্লাহ্ও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। আমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত। অসহায়ভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। আমরা যদি নিষ্ঠাবান হতে পারি, একান্ত আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হতে পারি, তাহলে আমরা আবার আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হবো, সমগ্র পৃথিবী আবার আমাদের পদতলে আসবে।

যাক সে কথা, মুজাহিদরা জোহরের সময় ঘুম থেকে উঠলেন এবং নামায পড়ে দুপুরের আহার গ্রহণ করলেন। মুগীছ দুর্গের জিনিসপত্রের হিসাব নেয়ার মনস্থ করেন। ইতিমধ্যে আমামনও দুর্গে ফিরে আসলেন। তিনি তার গৃহের অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন। তার সকল জিনিসপত্র যথাযথই ছিল। আমামন মুগীছকে জিজ্ঞেস করলেন।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

মুগীছ–দুর্গটি ঘুরে দেখতে যাচ্ছি।

আমামন–এখনো একটি স্থান আপনাদের জয় করা হয়নি।

মুগীছ–সেটি কোথায়?

আমামন–গির্জা।

মুগীছ–আমরা তো গির্জা-মন্দিরে হামলা করি না।

আমামন–কিন্তু সেখানে যে শত্রু লুকিয়ে রয়েছে এবং তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মুগীছ–তারা কে?

আমামন–দুর্গের সেনাপতি চারশত সৈন্য নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

মুগীছ–আমরা মনে করেছিলাম যে তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে।

আমামন–গির্জা থেকে তারা যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে।

মুগী–গির্জাটি কোথায়?

আমামন–চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মুগীছ পাঁচশত মুজাহিদসহ গির্জার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং কয়েকটি গলিপথ পেরিয়ে একটি বিরাট গির্জার সামনে এস উপস্থিত হন। গির্জার দেওয়ালগুলো ছিল খুবই উঁচু। তাতে গির্জাটি একটি দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

মুগীছ গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টানদেরকে উচ্চস্বরে বললেন; এটি একটি ইবাদতখানা, এতে লুকানো উচিত হয়নি। তোমরা যেহেতু এতে আশ্রয় গ্রহণ করেছ, আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে সমর্পণ করে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পার। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না।

দুর্গের সেনাপতি প্রাচীরের উপর দাঁড়ির জবাব দিল, আমাদের একজন সৈন্য জীবিত থাকতে আমরা এখান থেকে যাব না। মুগীছ তাতে রাগান্বিত হলেন এবং হামলা চালানোর নির্দেশ দেন।

মুসলিম মুজাহিদরা সামনে অগ্রসর হলে খ্রিস্টানরা তাদের উপর তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। তাতে বহু মুজাহিদ আহত হয়।

এ অবস্থা দেখে মুগীছের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হলো। তিনি এক হাতে পতাকা ও অপর হাতে ঢাল নিয়ে গির্জার দ্বারের দিকে এগুতে লাগলেন। অন্য মুজাহিদরাও অত্যন্ত বীরদর্পে তাঁকে অনুসরণ করলেন। তারা ঢাল আড়াল করে সামনে এগুচ্ছিলেন। খ্রিস্টানরা প্রবলভাবে তীর বর্ষণ করতে লাগলো। তাতে মুজাহিদরা আহত হলো; কিন্তু পিছপা হলো না। তাঁরা গির্জাটির দ্বারের কাছাকাছি এসে গেলেন। মুগীছ বর্শা দিয়ে দ্বারে আঘাত হানেন; কিন্তু এটি ছিল খুবই মজবুত। পরিশেষে ৫০-৬০ জন মুজাহিদ একসঙ্গে দরজায় চাপ দিলে দরজাটি ভেঙ্গে গেল। মুজাহিদরা তলোয়ার উঁচিয়ে গির্জার ভেতরে ঢুকে গেলেন। মুসলমানদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেখে খ্রিস্টানরা প্রাচীরের উপর থেকে নীচে নেমে এলো। তারা ঘোড়ায় চড়ে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্য গির্জার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে গেল। মুসলিমরা তাদেরকে দেখামাত্রই অত্যন্ত প্রবলভাবে হামলা চালালেন।

খ্রিস্টানরাও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুসলমানদের হামলা প্রতিরোধ করেন এবং পাল্টা আক্রমণ চালান। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। মুজাহিদরা যতই আহত হতেন, ততই আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। তাঁরা খ্রিস্টানদের একটি সারি সম্পূর্ণ শেষ করে ফেললেন এবং দ্বিতীয় সারির উপর হামলা চালালেন। খ্রিস্টানরাও মরণপণ যুদ্ধ করতে লাগলো। কোন মুজাহিদকেই হত্যা করতে পারলো না; কিন্তু মুজাহিদরা একাধারে খ্রিস্টানদের হত্যা করে যাচ্ছিলেন। মুগীছ এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর প্রত্যেক আক্রমণেই একজন না একজন খ্রিস্টান নিহত হতো। এইভাবে তিনি অনেক খ্রিস্টান সৈন্য হত্যা করেন। এক সময় দুর্গের সেনাপতির নিকটে এসে পৌঁছলেন। সেনাপতি তাঁকে বলল–মুসলিম নেতা, মৃত্যু তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। মুগীছ তার কথা বুঝতে পারলেন না। তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি কি আশ্রয় চাচ্ছ?

দুর্গের সেনাপতি বলল, তুমি যদি দুর্গ ছেড়ে যাবার অঙ্গীকার করো তবে তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব।

মুগীছ–তাহলে কি তুমি যুদ্ধ করতে চাচ্ছ?

উভয়েই নিজ নিজ ভাষায় কথা বললেন; কিন্তু কেউই কারো কথা বুঝতে পারলেন না। অবশেষে সেনাপতি আক্রমণ চালালো। মুগীছ সে আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁর তলোয়ার সেনাপতির ঢাল ভেঙ্গে শিরে গিয়ে আঘাত হানলো। সেনাপতি এক বিকট চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মুগীছ চারপাশে

তাকিয়ে দেখেন, মুজাহিদরা সকলকেই মেরে সাফ করে ফেলেছে। একজন খ্রিস্টানও আর বেঁচে নেই।

মুগীছ আল্লাহর শুকরিয়া জানান এবং ভেতরে আরো কোন শত্রু লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তা দেখার জন্য ভেতরে প্রবেশ করেন; সেখানে কোন সৈন্য খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি সকল মুজাহিদকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং দুর্গের তাঁবুতে ফিরে আসেন। এভাবে কর্ডোভার অজেয় দুর্গটিও মুসলিম মুজাহিদরা অধিকার করে নিলেন।

চৌদ্দ

অদ্ভুত কৌশল

ইসমাঈল এবং বিলকীস উভয়ে পাহাড় থেকে নেমে খুবই আনন্দিত হলো। ইসমাঈল মাগরিবের নামায শেষ করে বিলকীসকে বললেন, আমরা পাহাড় থেকে কোন্ দিকে নেমে এসেছি, জানা আছে কি?

বিলকীস–আমি বলতে পারব না।

ইসমাঈল–তুমি কি এই এলাকার সঙ্গে পরিচিত নও?

বিলকীস–মোটেও না।

ইসমাঈল–আমাদের হয়ত এখানেই রাত যাপন করতে হবে।

বিলকীস–অন্যথায় রাতে আমরা যাব কোথায়?

ইসমাঈল–কিন্তু এখানে খাবারের কি ব্যবস্থা হবে?

বিলকীস–মুচকি হাসলেন। বললেন, খুবই ক্ষুধা পেয়েছে বুঝি?

ইসমাঈল–বিলকীসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তো আরব। আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারি।

বিলকীস–তবে খাবারের কথা চিন্তা করছেন কেন?

ইসমাঈল–তোমার জন্য।

বিলকীস–হেসে ফেললেন। বললেন, আমার জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না।

ইসমাঈল–তুমি কতই না সুন্দরী। তুমি হাসলে তোমার চেহারা অপরূপ সৌন্দর্যে ভরে উঠে।

বিলকীস মুচকি হেসে বললেন, বড় বাড়িয়ে বলতে পারেন দেখছি।

ইসমাঈল–বাড়িয়ে বললাম কোথায়।

বিলকীস–ক্ষুধার কথা বলতে গিয়ে অন্য আলোচনায় চলে গেলেন কেন?

ইসমাঈল–আল্লাহর কসম, আমি চাই যে, সারা দুনিয়ার শান্তি তোমার জন্য নিয়ে আসি; কিন্তু কেন এমনটি হয়, তা আমি বলতে পারব না।

বিলকীস ইসমাঈলকে দেখল, তিনি তার দিকে অত্যন্ত মায়াবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিলকীস লজ্জা পেল এবং দৃষ্টি নামিয়ে নিল। ইসমাঈল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে বিলকীস?

বিলকীস আনত দৃষ্টিতে বললেন, যেথায় আপনি নিয়ে যাবেন।

ইসমাঈল বিস্ময়ের সুরে বললেন, আমি যেখানেই নিয়ে যাব, সেখানেই যাবে?

বিলকীস লাজ-নম্র ভঙ্গিতে মুখে খানিকটা হাসি ফুটিয়ে বলল, হাঁ সেখানেই যাব।

ইসমাঈল–আমি তো এই স্বর্গীয় পাহাড়েই তোমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম।

বিলকীস–তা হলে নেমে এলেন কেন?

ইসমাঈল–কেবল এইজন্যই যে, আমি এসেছি জিহাদ করতে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারি না।

বিলকীস–আপনি কি তা হলে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবেন?

ইসমাঈল–হাঁ।

বিলকীস–আর আমি?

ইসমাঈল–তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীতে যেতে পারবে।

বিলকীস-কিন্তু আমি চাই, অপনি আর যুদ্ধে না যান।

ইসমাঈল– তা কি করে সম্ভব।

বিলকীস–কেন সম্ভব নয়?

ইসমাঈল–তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন।

বিলকীস–তা হলে আমি নিষেধ করবো না।

ইসমাঈল–রাত তো অনেক হয়ে যাচ্ছে। তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত।

ইসমাঈল–আমার জন্য তো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমি প্রস্তরময় ভূমিতেও নিশ্চিন্তে শুতে পারি।

বিলকীস–আর আমি?

ইসমাঈল–তোমরা তো এতই নাজুক যে, ফুলের বিছানায় শুয়েও তোমাদের ঘুমুতে কষ্ট হয়।

বিলকীস–আচ্ছা, আমিও পাথরের উপরই শুতে পারব, তাহলে আমারও অভ্যাস হয়ে যাবে।

ইসমাঈল–তোমার জন্য কিছু করতে না পারলে আমি মনে শান্তি পাব না।

বিলকীস–বটে, আপনার ইচ্ছা কি?

ইসমাঈল–আমার ইচ্ছা তোমার খিদমত করা।

বিলকীস–আমায় মাফ করুন। আমার খিদমতের কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আপনার খিদমত করার প্রত্যাশী।

এই কথা বলে বিলকীস লজ্জিত হয়ে পড়ল। ইসমাঈল আদরের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার খিদমত? আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। একি স্বপ্ন না বাস্তব?

বিলকীস–স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

ইসমাঈল–তা হলে তো আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।

তারা নিকটস্থ একটি স্থানের ছোট ছোট নরম ঘাসের উপর রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং উভয়েই সেখানে চলে আসেন। ইসমাঈল এশার নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে উযু করে ফজরের নামায পড়তে শুরু করেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে কিরাত পাঠ আরম্ভ করেন। বিলকীসও ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। সে ইসমাঈলের কুরআন পাঠ শুনতে থাকে। ইসমাঈল তার সুললিত কণ্ঠে পাঠ করছেন

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ج رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

“অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। এবং মূসার সঙ্গে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদবাহী সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আমার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।” (৪ : ১৬৪-১৬৫)

বিলকীস অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তার কুরআন পাঠ শুনছিল। ইসমাঈলের নামায শেষ হলে বিলকীস তার কাছে এসে বলল, আপনারা কি হযরত মূসাকেও নবী বলে স্বীকার করেন?

ইসমাঈল–নিশ্চয়ই।

বিলকীস–তা হলে আপনারা ইহুদী হয়ে যান না কেন?

ইসমাঈল–কারণ, হযরত মূসা (আ) যে তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন, বনী ইসরাঈলী পণ্ডিতরা তাতে অনেক রদ-বদল করে ফেলেছে। এই জন্য তাঁর পরে আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা (আ)-কে ইনজীল দিয়ে প্রেরণ করেছেন; কিন্তু মূসা (আ)-এর অনুসারীদের ন্যায় খ্রিস্টানরাও ইনজীলে অনেক রদ-বদল সাধন করে। এইজন্য আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সর্বশেষ নবীরূপে প্রেরণ করেন। অদ্যাবধি তাঁর শরীয়তই জারি রয়েছে।

বিলকীস–আজকে আপনি নামাযে যে অংশটুকু পাঠ করেছেন, তা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ইসমাঈল–তা হলো আল্লাহর বাণী। একে কুরআন বলা হয়। তুমি যদি মুসলমান হয়ে যেতে?

বিলকীস–আমাকে একটু ভাবতে দিন।

ইসমাঈল-নিশ্চয়ই ভাববে। ধর্ম এমন জিনিস নয় যে, বলপূর্বক তা পরিবর্তন করা যায়।

বিলকীস–আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন এখান থেকে যেতে পারি।

ইসমাঈল–আমিও তাই ভাবছি; কিন্তু কোন্ দিকে যাব, তা এখনো ঠিক করতে পারছি না। আমি তো এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত নই।

বিলকীস-আমিও তো তাই।

ইসমাঈল–আমার ধারণা যে, মুসলিম বাহিনী হয়ত রাজধানী টলেডোর দিকে গিয়েছে এবং তা উত্তর দিকে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমাদেরও সেদিকেই যাওয়া উচিত।

বিলকীস–কোন্দিকে আমাদের যাওয়া উচিত, তা হয়ত বলতে পারবা না। তবে অবশ্যই বলব যে, এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত।

ইসমাঈল–তা হলে চলো।

উভয়েই উত্তর দিকে যেতে লাগলেন। সারাদিন পথ চলতেন, রাত হলে যাত্রা-বিরতি করে রাত্রি যাপন করতেন। অতি প্রত্যূষেই আবার পথ চলা শুরু করতেন। পথিমধ্যে ফল বৃক্ষ পেলে তা থেকে ফল আহরণ করে ভক্ষণ করতেন। তারা কোথায় যাচ্ছেন, তা যদিও তাদের জানা ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি তাদেরকে কর্ডোভার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রমাগত কয়েকদিন পথ চলার পর তারা একটি জঙ্গলে এসে উপনীত হলো। সেখানে ছিল প্রচুর বৃক্ষের সমারোহ। তারা সেখানে রাত্রি যাপন করলেন। প্রত্যূষে আবার পথ চলার ইচ্ছে করলে বিলকীস বলল, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার পক্ষে এক মাইল পথ চলাও হয়ত সম্ভব নয়।

উভয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন; কিন্তু দীর্ঘ পথ চলার ফলে বিলকীসই বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ইসমাঈল বললেন, আমি তো তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি কিন্তু কি করব, অঞ্চলটি তো এতই জনশূন্য যে, এখান থেকে বাহন যোগাড় করাও সম্ভব নয়। আমি তোমাকে কোলে নিতে চাইলেও তো তুমি তা পছন্দ করবে না।

বিলকীস–হাঁ, আমি তা পছন্দ করি না।

ইসমাঈল–চলো, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাই, তারপর দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

বিলকীস–চলুন, আমিও চেষ্টা করি, দেখা যাক কতদূর যেতে পারি।

এই বলে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। বহুদূর পর্যন্ত সারি সারি বৃক্ষ। তাঁরা যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন, দেখতে পেলেন যে, একজন খ্রিস্টান একটি ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। ইসমাঈল বিলকীসকে সেখানেই চুপে চুপে থাকতে বললেন এবং তিনি নিজে দ্রুত আরোহীর দিকে ছুটে গেলেন। ঘোড়াটিও ছিল সাধারণ গতিসম্পন্ন। তিনি ঘোড়াটির লেজ চেপে ধরলেন, ফলে ঘোড়াটি থেমে গেল। কিন্তু ঘোড়াটি কেন দাঁড়িয়ে পড়ল আরোহী তা টেরও পেলো না। সে ঘোড়ার পিঠে জোরে চাবুক মারল, কিন্তু ঘোড়া দাঁড়িয়েই রইল। একটুও এগুতে পারল না।

আরোহী হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে যখন দেখতে পেলো যে, একজন ঘোড়ার লেজ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল এবং দৌড়ে পালিয়ে গেল।

আরোহীর দৌড়ে পালানো দেখে ইসমাঈলের হাসি পেল। তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে বিলকীসের কাছে নিয়ে এলেন। বিলকীস চেপে চেপে হাসছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি হাসি চাপাতে পারছিলেন না। তিনি হাসিতে লুটিয়ে পড়েন। তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। চোখ থেকে বিদ্যুৎ ঝরছিল।

ইসমাঈল বললেন, আজকে তোমার এত হাসি পাচ্ছে যে?

বিলকীস হাসি থামিয়ে বলল, আল্লাহ্‌ই জানেন, আরোহী খ্রিস্টান আপনাকে কি মনে করেছে। আপনাকে দেখামাত্রই সে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে পালাল।

ইসমাঈল–মুসলমানদের ক্রমাগত বিজয় খ্রিস্টানদের মনে গভীর ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। এইজন্য সে আমাকে দেখামাত্রই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং পালিয়ে যায়।

বিলকীস–আপনিও তো কম করেননি। ঘোড়ার লেজ ধরে একে থামিয়ে দেন।

ইসমাঈল–তা না করে সামনে গিয়ে ধরার চেষ্টা করলে হয়ত ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যেতো, অথবা আমার উপর হামলা চালাত।

বিলকীস-হাঁ, আপনি যথার্থ কৌশলই অবলম্বন করেছেন।

ইসমাঈল–তোমার সাহসিকতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন এসে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ কর।

বিলকীস–কিন্তু আমি ঘোড়ায় চড়ব, আর আপনি হেঁটে যাবেন, তা কি ঠিক হবে?

ইসমাঈল–আমি তো পুরুষ, আমি হেঁটে যেতে পারব, আমার জন্য কোন চিন্তা নেই।

বিলকীস–আমরা উভয়েই কি চড়তে পারি না?

ইসমাঈল–হাঁ, তা পারা যেতে পারে। আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তখন নিশ্চয়ই উঠব।

বিলকীস–আচ্ছা, তা হলে আমাকে চড়িয়ে দিন।

ইসমাঈল বিলকীসকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলেন এবং ধীরে ধীরে ঘোড়ার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলেন।

পনের

ফরমান

তারিক টলেডোর দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, একই সময়ে মুসলমানরা সমগ্র স্পেনে ছড়িয়ে পড়বে। তাতে খ্রিস্টানদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে আরো ভয়ের সৃষ্টি হবে। তাঁর সেই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হলো। একদিকে যায়দ অভিযান শুরু করেন, অপরদিকে মুগীছ আর-রূমী বিজয়-যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তৃতীয় দিকের অভিযান পরিচালনা করেন তারিক নিজে। যে অঞ্চল দিয়ে তিনি গমন করেন, সে অঞ্চলই জনশূন্য দেখতে পান। জিজ্ঞেস করে জানা যায়, মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকাবাসীরা তাদের ধনসম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী টলেডোর পাহাড়ের নিকট পৌঁছান এবং সেখানে তাঁরা তাবু ফেলেন। সেখানে তারা জোহরের নামায আদায় করেন এবং খাবার তৈরিতে লিপ্ত হন। খাবার গ্রহণ শেষ হলে তারা দেখতে পান যে, আলোরের দিক থেকে একটি সৈন্যদল এগিয়ে আসছে।

মুসলমানরা তাদেরকে দেখে সতর্ক হয়ে পড়েন। তারা ধারণা করেন যে, খ্রিস্টান সৈন্যদল হয়ত টলেডোর অধিবাসীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে। তাদের জানা ছিল, রডারিকের সেনাপতি তাদমীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এও তাদের জানা ছিল যে, দেশে তাদমীরের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে।

মুসলমানরা মনে করেন যে, তাদমীর হয়ত এই সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে আসছে। তারিক সকলকে অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই দলটিও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দলটি নিকটতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদেরকেও দেখা যাচ্ছে। মুসলমানরা দেখতে পেলেন যে, আগন্তুক দলের আরোহীরাও মুসলমান। ইসলামী পতাকা উড়িয়ে তাঁরা এগিয়ে আসছে। মুসলমানরা তাদেরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। আগন্তুক মুজাহিদরাও তাকবীর ধ্বনি করলেন। দলটি খুবই কাছে এসে পড়লে তারিক চিনতে পারেন যে, সে দলের

অধিনায়ক যায়দ, যিনি মুজাহিদদের আগে আগে পতাকা বহন করে সদর্পে এগিয়ে আসছেন।

যায়দ মালাগা জয় করে ইস্তিজার উপর হামলা চালিয়েছিলেন। তাও অধিকার হলে তিনি আলোর আক্রমণ করেন। কিন্তু আলোরের অধিবাবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর যায়দ টলেডোর দিকে যাত্রা করেন। কারণ তারিক তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন সেসব অঞ্চল জয় করে টলেডোয় চলে আসেন। তাহলে উভয়ে মিলে রাজধানী আক্রমণ করবেন।

সুতরাং যায়দ সেসব অঞ্চল জয় করে প্রধান সেনাপতির কথামত টলেডো চলে আসেন। তারিক ও তাঁর সৈন্যদল সেই বিজয়ী বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানান। এক সেনাপতি অপর জনকে জড়িয়ে ধরেন। এক অফিসার অন্য অফিসারকে, এক সিপাহী অন্য সিপাহীকে অভিবাদন জানান এবং সকলে মিলে একাকার হয়ে যান।

আসরের সময় উপস্থিত হওয়ায় তারা প্রথমেই আসরের নামায আদায় করেন। এর পর তারিক যায়দকে নিয়ে নিজ তাঁবুতে চলে যান। তাঁর কাছে যুদ্ধের সব ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। যায়দ তারিকের কাছে মালাগা, ইস্তিজা ও আলোরের সব ঘটনা বর্ণনা করেন।

সবকিছু শুনে তারিক অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সব বিজয়ের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জানান। ইতিমধ্যে অন্যান্য অনেক অফিসারও সেখানে এসে জড়ো হন। এমনি মুহূর্তে একজন অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে এসে তারিককে সালাম জানান।

তারিক সালামের জবাব দিয়ে তাকে বসতে বললেন। আগন্তুক বসে পড়লে তারিক তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোত্থেকে এসেছ?

আগন্তুক বললেন, আমি দূত, কায়রো থেকে এসেছি।

তারিক–কায়রোর সংবাদ ভাল?

দূত–আল্লাহর রহমতে সবই ভাল। কায়রোর সকল মসজিদে আপনাদের বিজয়ের জন্যে দু'আ করা হচ্ছে।

তারিক–মূসা ইবনে নূসায়র ভাল আছেন?

দূত–জী হাঁ, তিনি ভাল আছেন। আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং এই ফরমান পাঠিয়েছেন।

দূত পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে তারিকের হাতে দেন। তারিক চিঠিটি হাতে নিয়ে প্রথমে চুম্বন করেন এবং পরে পড়তে শুরু করেন।

প্রেরক
মূসা ইবন নূসায়র
প্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের শাসক

প্রাপক
তারিক ইব্‌ন যিয়াদ
স্পেনের সেনাপতি

হাম্‌দ ও সালাতের পর সমাচার এই যে, আপনার বিজিত গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আপনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে সমগ্র স্পেন জয় করার শক্তি দান করুন–আমীন। তবে এই প্রথমবারের মত পরাজিত হয়ে খ্রিস্টানরা হয়ত প্রতিশোধ স্পৃহায় অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা হয়ত তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য চারদিক থেকে আপনাদের উপর আক্রমণ রচনা করবে। আপনার অধীনে বর্তমানে যে পরিমাণ সৈন্য রয়েছে, তা দ্বারা খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী অভিযান মুলতবি করে আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই অপেক্ষা করুন। আপনার সাহায্যার্থে আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে আমি নিজেই এগিয়ে আসছি। সকলকে নিয়ে এক সাথে আমরা সামনে অগ্রসর হবো। মুজাহিদদের কাছে আমার ও সকল মুসলমানদের সালাম রইল।[১]

ইতি
মূসা ইব্‌ন নূসায়র
কায়রো

চিঠি পড়ে তারিক দূতকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি থাকতেই কি মূসা রওনা দিয়েছেন? দূত বলল, না, আমি তাঁকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় দেখে এসেছি।

তারিক এরপর চিঠিটি যায়দের হাতে দেন। তিনি চিঠিখানা পড়ে বলেন, মূসা মুসলমানদেরকে ভালবাসেন বলে মুসলমানদের কোনরূপ বিপদের কথা চিন্তা করে তিনি হয়ত তা লিখেছেন।

তারিক–কিন্তু আমাকে তো তাঁর নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে।

যায়দ–খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আপনার যদি কোনরূপ আশংকা থাকে, তবে তো অবশ্যই পালন করবেন।

তারিক–আমার মতে অনুরূপ কোন ভয়ের কারণ নেই।

একজন অফিসার বললেন, এখন মুসলমানদের সম্পর্কে খ্রিস্টানদের মনে ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের সম্পর্কে এখন তারা খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত।

---

১. একজন খ্রিস্টান ঐতিহাসিক লেখেন যে, তারিকের এই অবিশ্বাস্য বিজয়ে মূসার মনে হিংসার উদয় হয়েছিল। তাই তিনি তারিককে আর সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা ঠিক নয়। মূসার ধারণা ছিল, অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্ষিপ্ত খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তারিক হয়ত ঠিক থাকতে পারবেন না। তাতে হয়ত মুসলমানদের জান-মালের ক্ষতি হবে। এই উদ্দেশ্যে মূসা তারিককে আর সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন এবং তা ছিল মুসলমানদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার প্রতীক, হিংসাপ্রসূত নয়–লেখক।

এমতাবস্থায় মুসলমানরা যদি তাদের অগ্রাভিযান বন্ধ করে দেয়, তাহলে খ্রিস্টানরা হয়ত নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করবে।

অপর একজন অফিসার বললেন, এটাই ঠিক। মূসা এখান থেকে অনেক দূরে। এখন অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দিলে মুসলমানদের যে কি ক্ষতি হবে তা হয়ত তিনি জানেন না।

যায়দ বললেন–আমার মতে আমাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করা হয়ত ঠিক হবে না। আল্লাহর রহমতে আমরা জায়লাভ করব।

তারিক–কিন্তু তাতে যে কর্তৃপক্ষের আদেশ লংঘন করা হয়

প্রথমোক্ত অফিসার–আমরা তো কারো ব্যক্তিস্বার্থের জন্য তা করছি না; বরং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থেই করতে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, তাতে কোন দোষ হবে না।

যায়দ–মূসা তাঁর চিঠিতেই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, তার আশংকা হচ্ছে যে, খ্রিস্টানরা হয়ত চারদিক থেকে মুসলমানদেরকে হামলা করতে পারে। বস্তুতপক্ষে এখানে এরূপ কোন আশংকাই নেই।

দ্বিতীয় অফিসার–আমার মনে হয়, আমরা যদি এখন সামনে অগ্রসর না হই এবং মূসা এখানে এসে জানতে পারেন যে, আমরা যদি আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতাম, তাহলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত ছিল, তবে তিনি হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন।

যায়দ–নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন; বরং এটাই ঠিক যে অভিযান অব্যাহত রাখা হোক এবং রাজধানী অধিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

তারিক–আচ্ছা, তাহলে সেটাই হবে।

এশার আযান হলো। মুজাহিদরা সকলেই নামায পড়ে শয্যা গ্রহণ করেন। খুব সকালেই ঘুম থেকে উঠে তাঁরা ফজরের নামায পড়েন। অতঃপর টলেডোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এখন টলেডো তাদের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। সেই তো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেই পাহাড়ের অপর প্রান্তেই রাজধানী টলেডো শহর। ইতিমধ্যে তারা পাহাড়ে পৌঁছে গেছে।

এক রাত তারা পাহাড়ের একটি খোলা উপত্যকায় অবস্থান করেন। সকাল হতেই পুনরায় যুদ্ধের যাত্রা শুরু করেন। কয়েকটি গিরিপথ ও উপত্যকা পেরিয়ে তারা টেগাস নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হন। নদীর অপর তীরেই টলেডো শহর। শহরের কারুকার্যময় ইমারত ও উঁচু প্রাচীরগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।

শহরটি ছিল খুবই সুন্দর ও সুদৃঢ় উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। পাহাড় কেটে শহরের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল এবং টেগাস নদীটি ছিল টলেডোর চারদিক বেষ্টিত। ফলে এটি শহরের চতুর্দিকে প্রাকৃতিক পরিখার সৃষ্টি করে রেখেছিল। খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে দেখতে পেলো। তারা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। তারিক সে দিন তাঁর সৈন্যদলকে নদীর তীরেই অবস্থান করার নির্দেশ দেন। ফলে সৈন্যরা নদীতীরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁবু ফেলে।

ষোল

টলেডো বিজয়

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, টলেডো শহর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এর প্রাচীর ছিল প্রস্তর নির্মিত। টেগাস নদী শহরটিকে বেষ্টন করে অধিকতর নিরাপদ ও সুরক্ষিত করেছিল। শহরবাসীরা তাদের দুর্গতুল্য শহরটির ব্যাপারে এত নিশ্চিত ছিল যে, এখানে মুসলমানরা আসতে পারে– তা কখনো কল্পনাও করেনি। তাই তারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিল। তারিক সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে সেখানে দূত পাঠান। তারা অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে দূতকে ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে তারিক বাধ্য হয়ে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন। নদীর উপর ছিল একটি বিরাট সেতু। কিন্তু সেতুটির উভয় পার্শ্বেই সামরিক চেকপোষ্ট বসান ছিল এবং সেখানে বহু সৈন্যের অবস্থান ছিল। ফলে মুসলমানদের পক্ষে সেতুটি অতিক্রম কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। নদী পার হওয়ার বিকল্প কোন পথও ছিল না। কারণ স্পেনের প্রায় সব নদীই খুব নিচু দিয়ে প্রবাহিত হতো। তাছাড়া এগুলোর উৎস ছিল পাহাড়। ফলে নদীর পাড় ছিল খুবই উঁচু। তদুপরি এগুলো বেশ প্রশস্ত ছিলো। গভীরতাও ছিল যথেষ্ট। তাই সেতু ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নদীটি অতিক্রম করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারিক প্রত্যেক দিন নদীতীরে গিয়ে কোন উপায় বের করার চেষ্টা করতেন; কিন্তু সেতু ছাড়া কোন বিকল্প পন্থা আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরপক্ষে খ্রিস্টান সৈন্যরা প্রতিদিন প্রাচীরের উপর উঠে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করত এবং সদা সতর্ক থাকত। পরিশেষে তারিক সেতুটি আক্রমণ করার মনস্থ করেন। একদিন প্রত্যূষে ফজরের নামায পড়ে দু'হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তিনি সেতুর দিকে অগ্রসর হন। খ্রিস্টান চৌকির সৈন্যরাও মুসলমানদেরকে দেখে বুঝতে পারে যে, তারা সেতু আক্রমণ করবে। তারাও যথাবিহিত সতর্কতা অবলম্বন করে। সেতুর উভয় তীরে ছিল শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি। ঘাঁটি দু'টি ছিল যথেষ্ট উঁচু ও সুদৃঢ়। পাহাড় কেটে ঘাঁটি দু'টির দেয়াল নির্মিত হয়েছিল। উভয় ঘাঁটির চৌকি দু'টো ছিল বুরুজের ন্যায় গোলাকার। প্রত্যেক চৌকিতে দু'হাজার করে সৈন্য মজুত ছিল। প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো হতো। মুসলমানদের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে আরো এক হাজার করে সৈন্য বাড়িয়ে

দেয়া হলো। সেতুটির মধ্যভাগে ছিল লৌহনির্মিত একটি সুদৃঢ় তোরণ। তোরণটি বন্ধ করে দেয়া হলে কারো পক্ষে পারাপার হওয়া সম্ভব হতো না। মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে তোরণটি বন্ধ করে দেয়া হলো। চৌকির প্রহরীরা দেয়ালের উপর আরোহণ করল। তারিক বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা অগ্রসর হলেই প্রহরীরা তাদের উপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তিনি আরো বুঝতে পারেন যে, এমতাবস্থায় যদি অশ্বারোহীদের নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে ঘোড়াগুলো আহত হয়ে যেতে পারে এবং আরোহীরাও তীরবিদ্ধ হয়ে নিচে পড়ে যেতে পারে। এইজন্য তিনি পদাতিক সৈন্যদেরকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। দু'হাজার মুজাহিদদের মধ্যে এক হাজারের নেতৃত্ব দেয়া হলো যায়দের উপর। আর এক হাজারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তারিক নিজে। দু'হাজার সৈন্য একই সঙ্গে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হলে চৌকির দেয়ালের উপর আরোহী প্রহরীদের মধ্যে এত হৈ চৈ শুরু হয় যে, সারা চৌকি জুড়ে তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আগ্রহী শহরবাসীরা যুদ্ধের তামাশা দেখার জন্য দেয়ালের উপর আরোহণ করে।

এদিকে চৌকির সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। মুসলিম মুজাহিদরা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁরা উঁচু টিলাগুলো পেরিয়ে ধীরে ধীরে নিচু টিলায় আরোহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু চৌকির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতেই চৌকির সৈন্যরা তাদের দিকে বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করে।

খ্রিস্টান সৈন্যরা এত বেশী তীর নিক্ষেপ করে যে, অনেক মুসলিম মুজাহিদ তাতে আহত হয়; কিন্তু তাতেও তারা পিছপা হয়নি; বরং এগুতে থাকে। তাঁরা আহত হয়েছে বলে খ্রিস্টান সৈন্যরা যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে।

মুজাহিদরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এগুচ্ছিল। যদিও তাঁরা আহত হচ্ছিল, তথাপি পিছপা হলো না। খ্রিস্টানরা তাঁদের এ বেপরোয়া ভাব দেখে অত্যন্ত অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ল।

প্রথমে খ্রিস্টানরা মনে করেছিল যে, প্রবল তীর ছোঁড়ার মুখে মুসলমানরা এক পা-ও এগুতে পারবে না; তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে; কিন্তু মুসলমানদেরকে রীতিমত এগুতে দেখে তারা বুঝতে বাধ্য হলো যে, তাদের তীর কোন কাজে আসছে না। তাতে তারা আরো ভীত হয়ে পড়ল। ইতিপূর্বে খ্রিস্টানরা শুনেছিল যে, মুসলমানরা এক বিস্ময়কর জীব। আগুন বা পানি তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। অস্ত্রকে তারা কোনরূপ ভ্রুক্ষেপই করেন না। এখন তারা স্বচক্ষে দেখতে পেলো যে, তারা তীর নিক্ষেপ করছে। আর মুসলমানরা তা এড়িয়ে যথারীতি সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তাতে খ্রিস্টানদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাল যে, মুসলমানরা হয়ত চৌকি দখল করে ফেলবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে চৌকির

সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলল, মুসলমানদের উপর তীর কোন কাজ করছে না। তারা যেভাবে এগিয়ে আসছে, হয়ত আমাদেরকে ধরে ফেলবে।

টলেডোর গভর্নরও প্রাচীরের উপর দাঁড়ানো ছিল। সে সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলছে, তোমরা সাহস হারিয়ো না, চেষ্টা চালিয়ে যাও। কিন্তু সৈন্যরা এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে তারা শুরুতে যেভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করেছিল, এখন আর সেভাবে তীর ছুঁড়তে পারছিল না। মুসলমানরা তা বুঝতে পারলেন। ফলে তাঁরা আরেকটু দ্রুত গতিতে এগুতে লাগলেন। তারিক ছিলেন সর্বাগ্রে, মুজাহিদরা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। যাঁরা তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা গা থেকে তীর খুলে ছুঁড়ে মারছিলেন এবং আরো প্রবল বেগে সামনে এগুচ্ছিলেন। এক সময় তাঁরা সেতুর ফটকের নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন এবং তা ভাঙ্গতে শুরু করেন। এ সময় চৌকির সৈন্যরা প্রাণ ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে। তারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে এবং অন্য সৈন্যদেরকে তাদের সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে। কিছুসংখ্যক মুজাহিদ ফটক ভাঙ্গতে থাকে আবার কেউ কেউ প্রাচীরের উপর উঠতে থাকে।

কিন্তু চৌকির সৈন্যরা তাদেরকে দেখতে পেলো না। তারা মুসলমানদের উপর তীর নিক্ষেপও বন্ধ করে দেয়। তারা কেবল ভয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। মুসলিম মুজাহিদদের জন্য তা ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ। ইতিমধ্যে কিছু মুজাহিদ চৌকিতে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়েই তাঁরা খ্রিস্টানদের উপর তলোয়ার চালাতে থাকে এবং তাদেরকে মারতে শুরু করে।

প্রাচীরের পাশ থেকে খ্রিস্টানরা পালিয়ে গেলে একের পর এক মুজাহিদ চৌকিতে প্রবেশ করতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তাঁরা তলোয়ারের আক্রমণ শুরু করতেন। খ্রিস্টানরাও যথাসম্ভব তাঁদের মুকাবিলা করার চেষ্টা করে। মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে তারা নব উদ্যমে আক্রমণ রচনার চেষ্টা করে; কিন্তু মুসলমানরা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, তাঁরা কচুকাটার ন্যায় একের পর এক খ্রিস্টানদেরকে কাটতে লাগলো।

দুর্গের ভেতরের খ্রিস্টানরা তাদের এ অবস্থা দেখতে পেয়ে সাহায্য লাভের আশায় দুর্গের দ্বার খুলে সেতুর দিকে দৌড়াতে লাগল। এদিকে মালাগা ও অন্যান্য অঞ্চলে বিজয়ে যায়দের বিশিষ্ট সঙ্গী মুজাহিদ তাহির একটি উঁচু টিলায় বসে মুসলমানদের অবস্থা অবলোকন করছিলেন। তিনি যখন মুসলমানদেরকে ফটকের নিকট পৌঁছে যেতে দেখেন তখন তিনি তাড়াতাড়ি অন্য মুজাহিদদের কাছে ফিরে আসেন এবং সবাইকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে সে দিকে যেতে থাকেন। তখন যেহেতু কোন তীর নিক্ষেপের ভয় ছিল না, তাই সকলেই ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করেন।

সে সময় প্রায় তিনশ' মুজাহিদ চৌকিতে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা খ্রিস্টানদেরক কতল করে অপর পাশে গিয়ে উপনীত হলো। তারিক ও তাঁর অধীনস্থ মুজাহিদরা সেতুর ফটক ভাঙ্গছিলেন। অবশেষে তারা ফটকটি ভাঙ্গতে সক্ষম হলেন।

যে সময় ফটকটি ভাঙ্গা হলো, ঠিক তখনই তাহির অশ্বারোহীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তারিকের অশ্বটিও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করেন এবং পদাতিক সৈন্যদেরকে সেখানে রেখে অশ্বারোহীদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। ফটকটি পার হয়ে অপর দিকে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, খ্রিস্টান সৈন্যরা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এসব খ্রিস্টান সৈন্য চৌকির সৈন্যদের সাহায্যার্থে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

তারা ছিল পদাতিক। তারিক এবং মুজাহিদরা দ্রুত অশ্ব ছুটালেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের চেহারা দেখা-মাত্র চিৎকার করে পালাতে লাগল। কিন্তু তারা পালাতে পারল না। পেছন থেকে মুজাহিদরা তাদের ধরে ফেলল এবং তলোয়ারের আঘাতে তাদেরকে হত্যা করতে লাগল।

এ সময় দুই স্থানে যুদ্ধ চলতে লাগল। **এক.** চৌকির ভিতরে, **দুই.** সেতুর উপরে। উভয় স্থানেই খ্রিস্টান সৈন্যরা তলোয়ারের আঘাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে লাগল এবং মুসলমানরা তাদের উপর প্রবল অক্রমণ চালালেন।

অল্প সময়ের মধ্যে সহস্রাধিক খ্রিস্টান নিহত হলো। মুজাহিদরা তাদের মারতে মারতে দুর্গের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। খ্রিস্টানরা এতই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে, দুর্গের দ্বার বন্ধ করারও খেয়াল করেনি। খোলা দ্বার দিয়ে মুজাহিদরা দুর্গে পৌঁছে গেলেন এবং চারদিক থেকে খ্রিস্টানদের উপর হামলা চালালেন।

এই সময় খ্রিস্টানদের মধ্যে কোন প্রকার নিয়ম-শৃংখলা বিরাজিত ছিল না। সংখ্যার দিক দিয়েও তারা ছিল মুসলমানদের ছয়-সাত গুণ। কিন্তু তারা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, সকলেই নিজেদের জান বাঁচানোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুজাহিদরা তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতে লাগলেন। সারা দুর্গজুড়ে খ্রিস্টানদের মৃতদেহের স্তূপ পড়ে গেল। অনেক মুজাহিদও আহত হলো; কিন্তু কেউই শহীদ হলো না। অনেক খ্রিস্টান মারা গেল, তারা বুঝতে পারল যে, আর লড়ে লাভ নেই। তারা অস্ত্র ফেলে দিল এবং শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করতে লাগল। তারিক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

অল্প সময়ের ভেতরেই সকল খ্রিস্টান সৈন্যকে গ্রেফতার করা হলো। পাদ্রীদের একটি প্রতিনিধদল তারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। তারিক বলেন, দুর্গটি অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সন্ধির দ্বার খোলা ছিল; কিন্তু আমরা যখন যুদ্ধ করে তা জয় করেছি, তখন সন্ধির প্রস্তাব বাতুলতা মাত্র। একজন পাদ্রী বলল, সন্ধি না করতে চাইলে না করুন, তবে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ তো করবেন। তারিক বললেন, তোমরা এমন জাতি, যারা কারো প্রতি দয়া করতে জান না; কিন্তু আমরা মুসলমান। মুসলমানরা সব সময়ই দয়া করে। তাই আমরাও দয়া করব।

পাদ্রী–তাহলে সেটা হবে আপনার খুবই অনুগ্রহ ও মহানুভবতা।

তারিক–এমন কথা বলা পাপ। অনুগ্রহের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ।

পাদ্রী–তাহলে আপনার মেহেরবানী তো নিশ্চয়ই।

তারিক–হাঁ, তা হতে পারে। তবে এর জন্য কয়েকটি শর্ত মানতে হবে: শহরে যে সব অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তা আমাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে; যার কাছে তা অপছন্দনীয় মনে হবে, সে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে। তবে কোন সহায়-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। যারা এখানে থাকতে চায়, তারা নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে, তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া হবে। উপাসনালয় যথারীতি থাকবে। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না। এ সবের জন্য তাদের কেবল এক প্রকার কর (জিযিরা) দিতে হবে।

পাদ্রী–দেশে কোন্ আইন প্রচলিত থাকবে?

তারিক–কোন প্রকার নতুন আইন প্রবর্তিত হবে না। পূর্বের আইনই বলবৎ থাকবে। খ্রিস্টান ও ইহুদীরাই শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। কেবল উচ্চ আদালতের বিচারক হবেন মুসলমান।

পাদ্রী বিস্ময়ের সুরে বললেন, ইহুদীরাও দায়িত্ব পালন করবে? ইহুদীদের উপদ্রব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন হুযুর।

তারিক–তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তোমরা ইহুদীদের অথবা ইহুদীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পাদ্রী–তাই হোক হুযুর। আমরা আপনার সকল শর্ত মেনে নিলাম।

পাদ্রীরা চলে গেল। তারা অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে লাগল। তারিক কিছু সৈন্যকে তাঁবুতে পাঠিয়ে দেন এবং সকল জিনিসপত্র নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। রাতে তারিক শাহী মহলে গমন করেন। সে সময় মহল ছিল সম্পূর্ণ জনশূন্য। জানা গেল, নাঈলা মুসলমানদের আসার খবর পেয়ে মহল ছেড়ে মারমাটা চলে গেছে। তারিক মহলটি দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। এত বড় ও এত সুন্দর মহল ইতিপূর্বে তিনি আর দেখেন নি। একটি কামরা তিনি নিজের জন্য বেছে নেন এবং তাতে তিনি সেখানে অবস্থান করেন। বাকী কামরাগুলোতে অন্য অফিসারগণ অবস্থান করেন।

সারা দিন কর্মক্লান্ত থাকায় এশার নামায পড়েই তিনি শুয়ে পড়েন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। এক সময় হঠাৎ করে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলেই তিনি তাঁর সামনে এক সুন্দরী রমণীকে দাঁড়ানো দেখতে পান। রমণীটি ছিল অপরূপ সুন্দরী। রূপের ঝলকে তার মুখের দিকে তাকানো যেতো না। সে তার কমনীয় চোখে তারিকের দিকে তাকিয়েছিল। তারিক রমণীকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। তিনি ধারণা করেন যে, তিনি হয়ত স্বপ্ন দেখছেন। এই ধারণা নিয়ে তিনি একদৃষ্টিতে যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সতের

সুন্দরী রাহীল

তারিক দু'চোখ ভরে রমণীর দিকে তাকিয়েছিলেন। রমণীও তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর রমণী বলল, সুবোধ সেনাপতি, আপনি কি ঘুমিয়ে আছেন? যুবতীর শব্দ শুনে তারিক বিশ্বাস করেন যে, তিনি জেগে আছেন এবং জাগ্রত অবস্থায়ই তিনি সুন্দরী যুবতীটিকে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি উঠে বসে পড়েন এবং বললেন:

হে যুবতী! আমি জেগেই আছি। সামনে আস এবং বল, তুমি কে? যুবতী আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তারিকের নিকট গিয়ে দাঁড়াল। সে আফসোসের সুরে বলল, আমি এক দুর্ভাগা সম্প্রদায়ের কন্যা।

তারিক–দুর্ভাগা জাতি কোন্‌টি?

সুন্দরী–ইহুদী।

তারিক–তোমার নাম কি?

সুন্দরী–রাহীল।

তারিক–তুমি কি টলেডোর অধিবাসী?

রাহীল–না, আমি মালাগার অধিবাসী।

তারিক–এখানে কিভাবে এসেছ?

রাহীল–পাপিষ্ঠ রডারিক জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

তারিক–তুমি কি এই মহলেই ছিলে?

রাহীল–জী হাঁ।

তারিক–আমরা যখন মহল অনুসন্ধান করেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

রাহীল–ভূগর্ভস্থ কামরায় ছিলাম হুযুর।

তারিক–বিস্ময়ের সুরে বললেন–ভূগর্ভস্থ কামরায় ছিলে?

রাহীল–জী হাঁ।

তারিক–কেন?

রাহীল–নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্যে।

তারিক–রডারিক কি তোমাকে ভূগর্ভস্থ কামরায় রেখেছিল?

রাহীল–জী না, রডারিক হয়ত সে সম্পর্কে অবহিত ছিল না। আমি নিজেই আমার সতীত্ব রক্ষার্থে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। রডারিক সম্ভবত এ কক্ষটির খবরই জানতো না।

তারিক–আফসোস, রডারিক তোমাদের মত নিষ্পাপ যুবতীদের উপরও জুলুম করেছে।

রাহীল–শুধু আমি কেন হুযুর। অসংখ্য সুন্দরী যুবতী তাঁর পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে।

তারিক–তাহলে খুবই পাপিষ্ঠ ছিল রাজা রডারিক।

রাহীল–পাপিষ্ঠ তো নিশ্চয়ই। সে কি মারা পড়েছে?

তারিক–হাঁ, প্রথম যুদ্ধেই আমরা তাকে হত্যা করেছি।

রাহীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, হাজার হাজার শোক্‌র হে খোদা, তুমি সেই জালিমকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে কত নিষ্পাপকেই না তার জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছ।

এতক্ষণ রাহীল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। তারিক তাকে বললেন, বস রাহীল।

রাহীল–প্রথমে বলুন, আপনি কি সে দলের সেনাপতি, যারা এই শহর জয় করেছে?

তারিক–হাঁ, মানুষ আমাকে তাই মনে করে।

রাহীল–আপনার নাম কি?

তারিক–আমার নাম তারিক।

রাহীল–বিস্ময়কর নাম তো আপনার। আপনি কে?

তারিক–আমি তারিক।

রাহীল–তা তো বুঝলাম। এ ছাড়া আপনার পরিচয়?

তারিক–আমি একজন মানুষ।

রাহীল–আনমনা হয়ে বলল, মানুষ তো সকলেই।

তারিক–মুচকি হেসে বললেন, তুমিও কি মানুষ?

রাহীল–মানুষ তো বটেই।

তারিক–তুমি হয়ত মানুষ নও?

রাহীল নিষ্পাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তাছাড়া আর কি হবো?

তারিক–হয়ত হুর-পরী।

রাহীল লজ্জিত হলো। তারিক তার লাজ-নম্র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, আমাকে মাফ কর। হয়ত কোন খারাপ কথা বলে ফেলেছি।

রাহীল তার যাদুময়ী চোখ তুলে বলল–কই, আপনি তো বললেন না যে, আপনি কে?

তারিক–বললাম তো যে আমি একজন মানুষ, নাম তারিক।

রাহীল–আমি জানতে চাচ্ছি যে, আপনি কোন্ ধর্মের লোক?

তারিক–আমি মুসলমান।

রাহীল–তাহলে কি আরবের অধিবাসী?

তারিক–না, আমার দেশ আরবের বাইরে।

রাহীল–তাহলে আপনি মুসলমান হলেন কি করে?

তারিক–আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাই আমি মুসলমান হ'তে পেরেছি।

রাহীল–তবে কি আরবরা জবরদস্তিমূলকভাবে আপনাকে মুসলমান করেছে?

তারিক–না, আমি নিজেই মুসলমান হয়েছি। মুসলমানরা কাউকে জোর করে মুসলমান করে না।

রাহীল–থাক, আপনি যে-ই হোন। আমাদের প্রতি দয়া করবেন তো?

তারিক–বল, তোমাকে কি করতে পারি।

রাহীল–আমি কি আপনাকে নির্দেশ দিতে পারি?

তারিক-হাঁ, তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পার, আমি যথাসাধ্য তা পালন করতে চেষ্টা করব।

রাহীল–তাহলে আপনি আমাকে মালাগায় পৌঁছে দিন।

তারিক–হাঁ, প্রস্তুত আছি, যখন বলবে নিয়ে যাব।

রাহীল–তাহলে তো আপনি অত্যন্ত ভাল লোক দেখছি।

তারিক–আমরা মুসলমান। মুসলমানরা কখনো কারো উপর অত্যাচার করে না। বরং অত্যাচারিতের সাহায্য করে।

রাহীল–আমি অন্ধকার কামরায় থাকতে থাকতে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

তারিক–এখন তোমাকে অন্ধ কুঠুরীতে যেতে হবে না। এ মহলের যে কামরায় ইচ্ছা তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পার। কেউ তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে না।

রাহীল–আল্লাহ্‌র হাজার শোক্‌র যে, তিনি এক অত্যাচারী রাজার বদলে আপনাদের ন্যায় সদয় ও চরিত্রবান লোক প্রেরণ করেছেন।

তারিক– ঘুমে তোমার চোখ বুঁজে আসছে? তুমি হয়ত এখন পর্যন্ত ঘুমাও নি?

রাহীল–না, মোটেও চোখ বুঁজিনি।

তারিক–তাহলে তুমি এ বিছানায় শুয়ে পড়।

রাহীল–আর আপনি?

তারিক–আমি শুতে পারব।

এই বলে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে গেলেন এবং রাহীলকে শুইয়ে দিলেন।

রাহীল বিছানায় যাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। তারিক মেঝেতে বসে পড়লেন। ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল। তিনি রাহীলের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাহীল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

তারিক মনে মনে ভাবলেন, তাঁর তো রাহীলের চেহারার দিকে তাকানোর কোন অধিকার নেই। সে একাকীই সে গৃহে শুয়ে আছে। অন্য কেউ হয়ত দেখছে না কিন্তু আল্লাহ্ ও ফেরেশতারা তো নিশ্চয়ই দেখছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে ফেলেন এবং মেঝের উপরই শুয়ে পড়েন।

সকালে ফজরের আযানের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়েন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার পর ফজরের আযান হলো। তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যান এবং নামায শেষে ফিরে আসেন।

রাহীল তখনো ঘুমিয়ে ছিল। তারিক এক কোণে বসে আস্তে আস্তে কুরআন তিলাওয়াত করেন। সূর্য সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে এলে তিনি কুরআন তিলাওয়াত শেষ করেন। এই সময় রাহীল পাশ ফিরে উঠে বসল এবং তারিককে দেখতে পেলো। সে নিজেই লজ্জিত হলো এবং বিছানা থেকে উঠে এসে তারিকের কাছে বসল। তারিক বললেন– ঘুম হলো তো?

রাহীল–হাঁ, অনেক দিন পর আজ আরামে একটু ঘুমানোর সুজোগ পেলাম।

তারিক–যাও, হাত-মুখ ধুয়ে সব সেরে আস।

রাহীল চলে গেল। সে দেখতে পেলো যে, মহলে কোন নারী কিংবা বালিকার চিহ্নও নেই। সে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ফিরে এলো।

তারিক বললেন–তুমি কখন দেশে যেতে চাচ্ছ?

রাহীল–কেন, আপনি কি শীঘ্রই আমাকে পাঠাতে চাচ্ছেন?

তারিক–আমার কখনই তোমাকে বিদায় দেয়ার ইচ্ছা নেই; কিন্তু তোমার হুকুম তো পালন করতে হবে।

রাহীল–আরে সুবোধ ব্যক্তি, আমার যখন ইচ্ছে হয়, তখন আমি নিজেই চলে যাব।

তারিক–সেটাই ভাল।

রাহীল–এই কামরার নিচে একটি কামরা আছে। সেখানে বহু মুকুট সংরক্ষিত রয়েছে।

তারিক–কাদের মুকুট।

রাহীল–মৃত রাজ-রাজড়াদের।

তারিক–চল তো দেখি।

রাহীল–চলুন।

উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারিক যায়দ ও তাহিরকেও ডেকে আনেন। তারা রাহীলের সঙ্গে একটি অন্ধকার দরজায় প্রবেশ করেন এবং কামরায় ঢুকে পড়েন।

সেখানে পঁচিশটি মুকুট সংরক্ষিত ছিল। তারা মুকুটগুলোকে তুলে নিয়ে আসেন এবং উপরের কামরায় রাখেন। মুকুটগুলো ছিল বহু মূল্যবান পাথরে খচিত এবং প্রত্যেক মুকুটে রাজাদের নাম লিখিত ছিল। এই সব মুকুট ছিল গথিক রাজাদের। তারা রাজা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই বংশের নিয়ম ছিল, প্রত্যেক রাজার জন্য নতুন নতুন মুকুট বানানো হতো এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেটিতে তার নাম লিখে এই নিচের কামরায় রেখে দেয়া হতো। সেই সময় পর্যন্ত গথিক রাজবংশের ২৫ জন রাজা রাজত্ব করেছিল। অতঃপর তারিক সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন মহলের সকল জিনিসপত্র একখানে এনে জমা করেন। কেউ কেউ রাজভাণ্ডারে প্রবেশ করে। কেউ কেউ প্রাসাদের বিভিন্ন কামরায় প্রবেশ করে মূল্যবান জিনিসপত্র বের করে নিয়ে আসে। এমনি মুহূর্তে পাদ্রীরা এসে উপস্থিত হয়। তারা অশ্ব ও অস্ত্র-শস্ত্রের তালিকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাও জানিয়ে দেয়, কোন লোকই দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। তারা সকলেই তাদের অস্ত্র-শস্ত্র জমা দিয়েছে। জিযিয়া দিতেও তারা রাজী আছে। তারিক যায়দকে পাদ্রীদের কাছ থেকে জিনিসপত্র বুঝে নেয়ার নির্দেশ দেন।

ইতিমধ্যে কোষাগার ও মহলের সকল জিনিসপত্র চত্বরে এনে জড়ো করা হলো। তারিক সকল জিনিসপত্রের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট চার অংশ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। রাহীল যেহেতু মুকুট সম্পর্কে সন্ধান দিয়েছিল, তাই তাকেও এক অংশ দেয়া হলো। তবে মুকুটগুলো খলীফার কাছে প্রেরণের জন্য পৃথক করে রাখা হলো।

কিছুক্ষণ পর যায়দও ফিরে আসেন। তিনি জানান যে, অস্ত্র-শস্ত্র বুঝে নেয়া হয়েছে। এমন সময় একজন আরব এসে উপস্থিত হন। মনে হচ্ছিল যে, সে হয়ত অনেক দূর থেকে এসেছে। সালামের পর সে তারিককে জানাল যে, মূসা ইব্‌ন নূসায়র স্পেনে এসে পৌঁছেছেন। তিনি আপনাকে সামনে অগ্রসর না হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মূসার নির্দেশে তিনি আর অগ্রসর হলেন না। অন্য সৈন্যদেরকেও সেখানেই অবস্থানের নির্দেশ দেন।

রাহীল আর মালাগায় ফিরে যায়নি। মুসলমানদের সঙ্গে সে আপাতত টলেডোতেই থেকে গেল।

আঠার

বিচ্ছিন্নদের পুনর্মিলন

মুসলমানরা এখন কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাদের কোন যুদ্ধ হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কারা জয়লাভ করেছে, এই সব সম্পর্কে ইসমাঈল ও বিলকীসের কিছুই জানা ছিল না। তারা উভয়ই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তারা সে বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছিল।

ভাগ্যক্রমে তারা একটি অশ্ব হস্তগত করেছিল। তাতে বিলকীসের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়েছিল বটে, কিন্তু ইসমাঈল হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিলকীসের জন্য একটি অশ্ব যোগাড় করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। বিলকীস চাইতো যে, ইসমাঈলও অশ্বে আরোহণ করুক; কিন্তু ইসমাঈল তাতে রাজী হতেন না।

তাদের জানা ছিল না যে, তারা কোন্ দিকে যাচ্ছেন। তাদের নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যস্থলও ছিল না। যেন পথ চলাই তাদের লক্ষ্য। তাই তারা শুধু পথ চলছে আর চলছে। এইভাবে চলতে চলতে এক সময় তারা এক উপত্যকায় এসে পৌঁছালো। এখানেই রডারিকের সৈন্যের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল। তখনো স্থানে স্থানে খ্রিস্টানদের মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়েছিল এবং দেহগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। তাদের গলিত দেহগুলো এমন দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছিল যে, সে দিক দিয়ে পথ চলাই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এ সব দেখে ইসমাঈল বললেন, মনে হচ্ছে যে, এখানে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে মুসলমানরা জয় লাভ করেছে।

বিলকীস বলল, খ্রিস্টানদের মৃতদেহ দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে; কিন্তু মুসলমানরাই যে জয় লাভ করেছে তা কি করে বুঝলেন?

ইসমাঈল–কেননা খ্রিস্টানরা জয় লাভ করলে তাদের মৃতদেহ এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকতো না। দেখছ না, একজন মুসলমানের লাশও আমাদের নজরে পড়েনি?

বিলকীস–হাঁ, মুসলমানের কোন লাশ তো দেখিনি।

ইসমাঈল–মুসলমানদের রীতি হলো, তারা তাদের মৃতদেহ দাফন করে রাখে।

বিলকীস–আপনার ধারণা তো ঠিকই মনে হচ্ছে।

ইসমাঈল–হাঁ, আমি তাই বুঝতে পারছি।

বিলকীস–বড় দুর্গন্ধ আসছে যে।

ইসমাঈল–চল, তাড়াতাড়ি সরে পড়ি। নচেৎ হয়ত কোন অসুখ হয়ে যেতে পারে।

বিলকীস–কিন্তু যাব কোথায়? বহুদূর পর্যন্ত লাশ দেখা যাচ্ছে যে।

ইসমাঈল–দ্রুত অশ্ব চালাও। যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।

বিলকীস–কিন্তু আপনি।

ইসমাঈল–আমার ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না।

বিলকীস–কারণ, তুমি পুরুষ তাই তো?

ইসমাঈল–তাই বটে।

বিলকীস–দুর্গন্ধ তো মেয়ে-পুরুষ সবার জন্যই ক্ষতিকর।

ইসমাঈল–তা তো ঠিক; কিন্তু তুমি মহিলা কিনা, তাই তা তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি প্রভাবিত করে।

বিলকীস-এবং আপনার উপরও।

ইসমাঈল–আমি তো বলছি আমার জন্য কোন চিন্তা নেই।

বিলকীস-এটা কি সম্ভব?

ইসমাঈল–আবার অসম্ভব কিসের?

বিলকীস–আপনিও অশ্বের পিঠে আরোহণ করুন।

ইসমাঈল–অশ্ব আমাদের দু'জনকে নিয়ে যেতে পারবে না।

বিলকীস-অবশ্যই পারবে। আমাদের ওজনই বা কত!

ইসমাঈল–তোমার ওজন হয়ত কম, কিন্তু আমার......

কথার ইতি টেনে বিলকীস বলল–আপনার অনেক ওজন রয়েছে–তাই তো?

ইসমাঈল–হাঁ।

বিলকীস-ঠিক আছে, আপনি উঠে পড়ুন। প্রয়োজন হলে আস্তে আস্তে যাব।

ইসমাঈল–না, না, তোমার অসুখ হয়ে যাবে যে।

বিলকীস–আমার অসুখের ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই।

ইসমাঈল–তুমি তো বড় জেদী দেখছি।

বিলকীস–আপনি তো আরো বেশী নন কি?

ইসমাঈল–দেখ, দুর্গন্ধে মাথা বিগড়ে যায় কিন্তু!

বিলকীস–আপনি ঘোড়ায় উঠুন তো।

ইসমাঈল–আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আমি উঠছি।

এই কথা বলে তিনি পেছনে উঠে পড়েন এবং দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে যান। কিছু দূর গিয়ে বিলকীস বললেন, আপনি জেদ ধরেছিলেন যে, আমার সঙ্গে ঘোড়ায় আরোহণ করবেন না, কিন্তু............

ইসমাঈল–কিন্তু জেদের জয় হলো এবং আমি আরোহণ করতে বাধ্য হলাম।

বিলকীস-পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে জিততে পারে না।

ইসমাঈল-তুমি ঠিকই বলছ।

বিলকীস-আপনি আর কখনো জেদ করবেন না তো?

ইসমাঈল-জেদের সুযোগই আসবে না।

বিলকীস-কেন?

ইসমাঈল-কারণ তুমি তো তোমার বাবার সঙ্গে চলে যাবে।

বিলকীস-নিশ্চয়ই যাব।

ইসমাঈল-তাহলে জেদ করার সুযোগ পাব কোথায়?

বিলকিস-তাহলে আপনি কি আমাকে ছেড়ে যাবেন?

ইসমাঈল-আমি তো কখনো ছেড়ে যেতে চাই না।

বিলকীস-কিন্তু....।

ইসমাঈল-কিন্তু তুমি চলে যাবে, তাই তো!

বিলকীস-বিশ্বাস রাখুন, আমি আমার উপর ইহসানকারীকে ছেড়ে যাব না।

ইসমাঈল-তবে কি তুমি আমার সঙ্গে মুসলিম দলে থাকবে?

বিলকীস-আপনি আমাকে নিলে আমি অবশ্যই থাকব।

ইসমাঈল-তোমার বাবা যদি নিষেধ করেন।

বিলকীস-তিনি কখনো নিষেধ করবেন না।

ইসমাঈল-কেন নিষেধ করবেন না?

বিলকীস-কারণ আমাদের সমাজের নিয়ম এই যে....

বিলকীস চুপ হয়ে পড়লেন। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন-কি নিয়ম রয়েছে?

বিলকীস-মেয়েরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে।

এখন তারা গুয়াডাল কুইভার নদীতীরে এস গেল। বিলকীস বললেন, আমরা হয়ত কর্ডোভার নিকটবর্তী এসে গেছি।

ইসমাঈল-কি করে বুঝলে?

বিলকীস-এটা হলো গুয়াডাল কুইভার নদী। এটা আমি চিনি। এর নিকটেই কর্ডোভা শহর।

ইসমাঈল-কর্ডোভা শহরে যদি খ্রিস্টান সৈন্য কিংবা পুলিশ থাকে?

বিলকীস-বিশ্বাস করুন, আমি পথ দেখিয়ে দেব।

ইসমাঈল-আরে বুদ্ধিমতি সুন্দরী, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। যেখানে নিয়ে যাও, সেখানেই যাব।

বিলকীস মুচকি হেসে বলল, আপনি আমার সঙ্গে না আমি আপনার সঙ্গে?

ইসমাঈল-তুমি যদি সারা জীবন আমার সঙ্গে থাকতে!

বিলকীস মুচকি হেসে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কথার কি অর্থ?

ইসমাঈল–অর্থ স্পষ্ট যে, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

বিলকীস চুপ হয়ে গেলেন। ইসমাঈল অশ্বকে নদীর তীরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। এভাবে রাতে বিশ্রাম এবং দিনে পথ চলে তারা কর্ডোভায় পৌছে গেলেন। এখন ইসমাঈল বললেন, বিলকীস বল তো, দুর্গে কি পরিমাণ সৈন্য রয়েছে তা কার কাছ থেকে জানতে পারব? বিলকীস দুর্গের প্রাচীরের দিকে তাকিয়েছিল। সে বলল–দেখ, খ্রিস্টানদের পতাকার পরিবর্তে দুর্গে মুসলমানদের পতাকা উড়ছে।

ইসমাঈল ভালভাবে দেখে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ; চল, এখন আর কোন ভয় নেই।

বিলকীস–মুসলমানদের ব্যাপারে আমারও কোন ভয় নেই।

ইসমাঈল–কোন ভয় নেই।

বিলকীস-কারণ আমি তো আপনার সঙ্গেই রয়েছি।

ইসমাঈল–না, সে জন্যে নয়; মুসলমানরা কোন স্ত্রীলোক, বালিকা অসুস্থ বা ধর্মীয় নেতাদেরকে কিছু বলে না।

বিলকীস–আচ্ছা, তাহলে চলুন।

উভয়েই এগিয়ে গেলেন। আসরের সময় তাঁরা দুর্গে গিয়ে পৌঁছলেন। দরজার মুখেই মুগীছ আর-রূমীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি ইসমাঈলকে দেখেই সালাম জানান এবং গলা জড়িয়ে ধরেন।

ইসমাঈল সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং বললেন, আল্লাহর শোকর যে, আপনি এখানে রয়েছেন।

মুগীছ আর-রূমী গলা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, এটাও আল্লাহ্‌র দয়া যে, তুমি এসে গেছ। তুমি তাদের কাছ থেকে কিভাবে ছুটে এলে?

ইসমাঈল সংক্ষেপে মুগীছ আর-রূমীকে সব ঘটনা খুলে বলেন। মুগীছ আর-রূমী বলেন, এই যুবতী তা হলে তোমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

ইসমাঈল–জী হাঁ।

মুগীছ আর-রূমী– সে সকল মুসলমানের প্রতি ইহসান করেছে।

বিলকীস লাজ-নম্র কণ্ঠে বলল, না তিনিই বরং আমার প্রতি ইহ্‌সান করেছেন। এমন সময় আমামন সেখানে এসে গেলেন। তাকে দেখেই বিলকীস তার দিকে দৌড়ে গেলেন। আমামনও তাকে দেখামাত্রই দৌড়ে এসে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন– মেয়ে আমার, আল্লাহ্‌র লক্ষ কোটি শোকর যে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আনন্দের আতিশয্যে বিলকীসের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিল। আমামন বললেন, কেঁদো না মেয়ে আমার। এখন তো কাঁদার সময় নয়; বরং আনন্দের সময়। সেই জালিমদের হাত থেকে কে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে?

বিলকীস ইসমাঈলের দিকে আঙ্গুল ইশারা করে বললেন, এই সহৃদয় মুসলমান।

আমামন ইসমাঈলের কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনার কাছে বহু কৃতজ্ঞ। আপনি আমার উপর নেহাৎ ইহসান করেছেন।

ইসমাঈল–না, না ইহসানের কি আছে, আমার যা দায়িত্ব ছিল, আমি তা-ই করেছি।

আমামন–আমি সারাজীবন আপনার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রইলাম।

অতঃপর তিনি বিলকীসের দিকে তাকিয়ে বললেন, চল মেয়ে, ঘরে চল। তোমার অভাবে আমার ঘর এখনও শূন্য। বিলকীস লজ্জিত হয়ে বললেন, বাবা, এই সহৃদয় মুসলিম যুবক!

আমামন–আমি তাকে আমার গৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আমি খুবই খুশী হবো।

মুগীছ আর-রূমী–এখন ইসমাঈলকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।

আমামন–আচ্ছা, তাই ভাল।

অতঃপর আমামন বিলকীসকে নিয়ে এবং মুগীছ আর-রূমী ইসমাঈলকে নিয়ে চলে গেলেন।

উনিশ

বিজয়ের বন্যা

মূসা ইবন নূসায়রের পুত্র আবদুল আযীয যখন থেকে স্পেনের একটি সুরক্ষিত দুর্গ, একটি উঁচু সেতু, অদ্ভুত প্রস্তর মূর্তি ও পরমাসুন্দরী মহিলাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন তখন থেকে এসব জিনিস বাস্তবে দেখার জন্য তিনি অত্যন্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। এমন জিনিস বাস্তবেও স্পেনে রয়েছে বলে কাউন্ট জুলিয়ানের প্রত্যয়নের ফলে তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তিনি ভাবছিলেন পিতাকে বলে-কয়ে স্পেনে যাওয়ার অনুমতি লাভ করবেন।

কিন্তু মূসা ইব্ন নূসায়র তারিককে স্পেন অভিযানের নেতা মনোনীত করায় তাঁর সে আশা ভেস্তে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি মনে মনে এই ধারণা পোষণ করছিলেন যে, একদিন না একদিন তিনি জাগ্রত অবস্থায় তা দেখবেনই। তবে কখন এবং কিভাবে তার সে আশা পূরণ হবে, তা জানা ছিল না। তিনি দিন-রাত এ চিন্তাতেই বিভোর থাকতেন। একদিন দেখা গেল যে, তারিকের বিজয় সংবাদ নিয়ে একজন দূত কায়রো এসেছে। তা শোনামাত্রই তাঁর মনে এক বিস্ময়কর অনুভূতির উদয় হলো। তা কি বিজয় বার্তার আনন্দে, না এক অজানা হিংসার প্রতিক্রিয়ায় তা বলা মুশকিল ছিল। এর পর পরই তিনি শুনতে পেলেন যে, মূসা শীঘ্রই তারিকের সাহায্যার্থে অপর একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবেন। তাতে তার মনে আবার আশার আলো দেখা দিল। তিনি পিতার কাছে তাঁর স্পেনে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু পিতা মূসা জানান, তিনি নিজেই তাঁর অপর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও মারওয়ানকে নিয়ে স্পেনে যাচ্ছেন। খোদ আবদুল আযীযকে কায়রোর শাসনকার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হবে।

আবদুল আযীযের ছোট দুই ভাই ছিলেন। একজনের নাম ছিল আবদুল্লাহ, অপর জনের নাম মারওয়ান। মূসা তাদের দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে স্পেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। আবদুল আযীয এই ভেবে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন যে, এইবারও তাঁর ইচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো; কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে বলছিল, তুমি অবশ্যই স্পেনে যাবে এবং তথাকার সব কিছুই তুমি দেখতে পাবে। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন; কিন্তু কখন কিভাবে যাবেন তা তিনি জানতে পারছিলেন না।

পরিশেষে তাঁর পিতা মূসা দশ হাজার অশ্বারোহী ও আট হাজার পদাতিকসহ মোট আট হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পুত্র আবদুল্লাহ ও মারওয়ান ছাড়াও তার সঙ্গে ছিলেন আলী ইব্‌ন রাবী, হায়াত ইব্‌ন তামীমী, ইব্‌ন আবদুল্লাহ আত্‌-তাবীল প্রমুখ খ্যাতনামা নেতা।

মূসা সৈন্যসহ স্পেনের উপকূলে পৌঁছলে কাউন্ট জুলিয়ান ও পাদ্রী স্ক্যাফ তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

মূসা তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হন, তারিক জয়যাত্রায় বিভোর হয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফেলেছে, অথচ তাঁর নির্দেশের কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি।

মূসা কিছুটা রাগান্বিত হলেন। কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন অত্যন্ত সুচতুর ব্যক্তি। তিনি বুঝতে পারেন যে, মূসা তারিকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

মূসা–তারিক আমার নির্দেশ পালন করেনি।

জুলিয়ান–তিনি অবশ্য অগ্রসর হতে চাননি; কিন্তু---------

মূসা–তাহলে আপনি তাঁকে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন?

জুলিয়ান–না।

মূসা–তাহলে কে পরামর্শ দিয়েছে?

জুলিয়ান–তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ।

মূসা–কি কারণে?

জুলিয়ান–কারণ এই ছিল যে, বীর যোদ্ধা তারিক বেকা উপত্যকার নিকটে রডারিককে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে খ্রিস্টানদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হয়। তখন তারিক এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তিনি তাঁর সৈন্যদলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং একটি দলকে কর্ডোভায়, দ্বিতীয় দলকে মালাগায় এবং তৃতীয় দলকে টলেডো প্রেরণ করেন। তাতে খ্রিস্টানরা আরো ভীত হয়ে পড়ে।

মূসা–তাহলে তো তারিক অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

জুলিয়ান–এটা সত্য যে, তারিক বিজয় ও সফলতার এক বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

মূসা–আমি তাঁর বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু----

জুলিয়ান–কিন্তু কিসের হুযুর।

মূসা–আমার নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তার উচিত ছিল।

জুলিয়ান–তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তিনি যদি তাঁর অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দিতেন তবে খ্রিস্টানদের মন থেকে ভয় উঠে যেতো। তারা আবার সংগঠিত হওয়ার প্রয়াস পেতো এবং মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করত।

মূসা–আমি সবই বুঝতে পারছি। আমি জানি যে এই সময়ে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। তবে তার সমস্ত অবস্থা আমাকে অবহিত করানো উচিত ছিল।

জুলিয়ান–এটা অবশ্যই তাঁর ভুল হয়ে গেছে।

মূসা–এ জন্যে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে

জুলিয়ান–এখন আপনার কোন্ দিকে যাওয়ার ইচ্ছে হুযুর।

মূসা–আমি তো এদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনিই বলুন, আমি এখন কোন দিকে যাব?

জুলিয়ান–উত্তর-দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল তারিক জয় করে ফেলেছেন। আপনি বরং পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে পারেন। সেভিল এবং বুস্‌টেনিয়ার ব্যাপক উর্বর অঞ্চল এখনও বিজয় হয়নি।

মূসা–তাহলে সেটাই ঠিক।

জুলিয়ান–আপনার সঙ্গে কি পরিমাণ সৈন্য রয়েছে?

মূসা–আঠার হাজার।

জুলিয়ান–সে অঞ্চলটি জয়ের জন্য সৈন্য সংখ্যা নেহায়েতই কম।

মূসা–কম? কেন, আপনি তারিককে দেখেননি। তাঁর সঙ্গে তো মাত্র বার হাজার সৈন্য রয়েছে।

জুলিয়ান–তা অবশ্য ঠিক। তবে সেভিল অঞ্চলের দুর্গগুলো অপেক্ষাকৃত মজবুত এবং খ্রিস্টানরা সংখ্যায় অধিকতর।

মূসা–চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্‌র উপর আমাদের ভরসা রয়েছে। একমাত্র তিনিই বিজয়দানের মালিক।

জুলিয়ান–ভাল, ঠিক আছে।

দ্বিতীয় দিন মূসা তাঁর সৈন্যদলসহ সেভিলের দিকে অগ্রসর হন। খ্রিস্টানরা ইতিপূর্বেই তারিকের বিজয় কাহিনী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। তারা জেনেছিল যে, মুসলমানরা যে শহরেই আক্রমণ চালায়, তা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হয় না। এইজন্য মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তাই তারা যখন তাদের অঞ্চলে মূসার আগমনবার্তা জানতে পারল, তখন সে অঞ্চলের সকল খ্রিস্টান মূসার সামনে গিয়ে হাযির হলো এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল।

মূসা সহজ শর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্থাপনে রাজী হলেন এবং তাদের সঙ্গে নরম আচরণ করেন। মূসার এই নম্র আচরণে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে খ্রিস্টানরা এসে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়

এভাবে কোন রক্তক্ষয় ছাড়াই সমগ্র অঞ্চলটি মুসলমানদের অধিকারে আসে অঞ্চলটি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মূসা ঈসা ইব্‌ন আবদুল্লাহকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্যে সেখানে দুই হাজার সৈন্য রেখে মূসা নিজে ফারমুনিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হন। মূসা শহরটির নিকটবর্তী হলে দেখতে পান, তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর দুর্গটি খুবই মজবুত ও সুদৃঢ়। মূসা দুর্গ অবরোধ

করেন। পরদিন তিনি ফজরের নামায পড়ে মুজাহিদদেরকে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এই সময় দেখতে পান, দুর্গের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে এবং কিছু লোক সাদা পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

সাদা পতাকা শান্তির প্রতীক রূপে বিবেচিত; এ জন্যে মূসা তাঁর সৈন্যদেরকে আগন্তুকদের হামলা করতে নিষেধ করেন। পতাকাধারীরা মূসার কাছে এসে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। মূসা সেভিলের অনুরূপ শর্তের ভিত্তিতে তাদের সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করেন।

সন্ধির শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. খ্রিস্টানরা মুসলিম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকবে। কখনও বিরোধিতা করবে না অথবা কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না।
২. ধর্মীয় ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।
৩. খ্রিস্টানদের যে আইন প্রচলিত রয়েছে, তা–ই বলবৎ থাকবে।
৪. পুরাতন গির্জাগুলো যথারীতি প্রতিষ্ঠিত থাকবে; তবে নতুন গির্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের অনুমতি নিতে হবে।
৫. মুসলিম বিচারকের আদালতে প্রতিটি মামলার আপীল হবে। তাঁর রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৬. প্রত্যেক খ্রিস্টান স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুর পক্ষ থেকে জনপ্রতি দুই দীনার করে বার্ষিক জিযিয়া দিতে হবে।
৭. কোন খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে অবশ্যই ইসলামী আইন-কানুন পালন করতে হবে। খ্রিস্টান আইনের কোন বিষয় তার উপর প্রযোজ্য হবে না।

উপরোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে মূসা খ্রিস্টানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। এর চাইতে সহজ শর্ত আর কি হতে পারে? তাই খ্রিস্টানরা খুশী হয়ে শর্তগুলো মেনে নেয় এবং সেভিল ও ফারমুনিয়ার অধিবাসীরা নিজ নিজ অঞ্চল ও দুর্গ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দেয়।

মূসা মাত্র আড়াই 'শত' সৈন্যসহ একজন অফিসারকে সেখানে রেখে তিনি নিজে বুসটেনিয়ার দিকে অগ্রসর হন। বুসটেনিয়া ছিল স্পেনের পশ্চিম অঞ্চল। মূসা সে দিকে যেতে থাকেন। সর্বপ্রথমে তিনি সুব্লা শহরে গিয়ে পৌঁছেন।

তিনি সেখানে পৌঁছার আগেই তাঁর সম্পর্কে ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্যে তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শহরবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। মূসা তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন এবং এখানেও কিছু সৈন্য রেখে তিনি আসুনিয়ার দিকে অগ্রসর হন।

আসুনিয়ার দুর্গটিও ছিল খুবই মজবুত ও প্রশস্ত। কিন্তু এর অধিবাসীরা খুবই ভীত ছিল। তাই মূসার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীরা তাঁর কাছে এসে সন্ধির আবেদন

করে তাদের সঙ্গেও সন্ধি স্থাপিত হয়। মূসা সেখানেও কিছু সৈন্য রেখে সেখান থেকে মারতাবিসের দিকে অগ্রসর হন। কোন যুদ্ধ বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হওয়ায় তার বিজয় আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যায়। মূসা মারতাবিসে পৌঁছলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে স্বাগত জানায় এবং সন্ধি স্থাপন করে তাঁর হাতে তাদের দুর্গটি সোপর্দ করে।

মূসা সেখানে কিছু সৈন্য রেখে নিজে বেযাদ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু কিছু সৈন্য রেখে যাওয়ায় তাঁর সৈন্যসংখ্যা অনেক কমে এসেছিল; কিন্তু খ্রিস্টানরা সহজেই সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হওয়ায় অতিরিক্ত সৈন্য তলবের আর প্রয়োজন হয়নি। বেযাদের অধিবাসীরাও সন্ধি স্থাপন করে। অতঃপর মূসা সামনে অগ্রসর হন এবং মেরিডার নিকটে গিয়ে উপনীত হন।

শহরটি ছিল এতই সুন্দর যে, মুসলিম মুজাহিদরা তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। শহরটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এর প্রাচীর যেমন উঁচু তেমনি ছিল মজবুত। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন শহরটির প্রতিষ্ঠাতা বড় বড় পাথর কেটে প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। মেরিডার অধিবাসীরা দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সৈন্যরা প্রাচীরের উপর উঠে এসেছিল। মূসা বুঝতে পারলেন যে সৈন্যরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন। সুতরাং তিনি তাঁর নিজের দলের সৈন্যসংখ্যার হিসেব নেন। এ সময় তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

কাউন্ট জুলিয়ানের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, এই দুর্গে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার খ্রিস্টান সৈন্য রয়েছে। এ অবস্থা দেখে মূসা তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন। তাকে লিখে দেন যে, আবদুল আযীয যেন একটি সৈন্যদল নিয়ে তাঁর সাহায্যার্থে দ্রুত এগিয়ে আসে।

অপরদিকে তিনি মেরিডাবাসীদের কাছে তাদেরকে সন্ধি স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত তাদেরকে সন্ধির পরামর্শ দেয় কিন্তু খ্রিস্টানরা তাতে রাজী হয়নি। তাদের এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলল, তোমাদের দাম্ভিক নেতাকে বলে দাও, সে যেন শহর জয়ের আশা ত্যাগ করে চলে যায়। অন্যথায় সে এবং তাঁর সমস্ত সৈন্যদল লাশ হয়ে প্রাচীরের নিচে পড়ে থাকবে।

দূত বললেন, তোমরা অনর্থক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছ। রাজধানীসহ সমস্ত অঞ্চল আমরা জয় করে ফেলেছি। তোমাদের সকল নেতা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করেছে। এর পরও তোমরা কার ভরসায় যুদ্ধের কথা বলছ?

দুর্গের খ্রিস্টান ব্যক্তিটি জবাব দিল, আমরা দুর্গের দৃঢ়তা ও আমাদের সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের উপর ভরসা করেই বলছি। তাছাড়া রাজা রডারিকের স্ত্রী নাঈলা এখানেই রয়েছেন। তিনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন, আমরা তাঁকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করব।

মুসলিম দূত ফিরে গেলেন। তিনি মূসাকে খ্রিস্টানদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করেন। মূসা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে রাতেই সকল সৈন্যকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। পরদিন মেরিডা আক্রমণ করা হবে তখন পর্যন্ত মুসলমানদের শক্তি পরীক্ষার কোন সুযোগ হয়নি। কারণ তাঁরা যে শহর কিংবা দুর্গে যেত সেখানকার অধিবাসীরা আনুগত্য স্বীকার করত।

কুড়ি

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

মূসা 'এশার' নামায পড়ে শুয়ে পড়েন। শেষ রাতে উঠে উযু করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন। নামায শেষে সিজদায় অবনত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে আরয করেন, হে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে একমাত্র মুসলমানরাই একাগ্রচিত্তে তোমার ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে। তারা সেই জাতি, যারা তোমার হাবীব মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশিত পথে চলার প্রয়াসী। যদিও কে তোমার 'ইবাদত' করছে, কে তোমার নির্দেশের অনুসরণ করছে এবং কে তোমার বাণীর প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত রয়েছে, তুমি তার মুখাপেক্ষী নও, তথাপি মুসলমানরা তোমারই উপর নির্ভরশীল। মুসলমানরা যা করে সব তোমার জন্যেই। অতএব তুমি তাদেরকে সাহায্য কর, অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা কর। তুমি তোমার কালামে ঘোষণা করেছ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী! তুমি যাকে ইচ্ছে ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছে ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর আর যাকে ইচ্ছে তুমি হীন কর। কল্যাণ তো তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩ ২৬)

অবশিষ্ট রাত তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর কাছে দু'আ করে কাটান। প্রত্যূষে ফজরের নামায আদায় করে মুসলমানদেরকে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলমানরা দ্রুত নিজ নিজ তাঁবুতে যান এবং অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা সারিবদ্ধ হচ্ছিলেন।

মুসলিম মুজাহিদরা সারিবদ্ধ হতে না হতেই দুর্গের দ্বার খুলে দেয়া হয় এবং খ্রিস্টান অশ্বারোহীরা স্রোতের ন্যায় বেরিয়ে আসতে থাকে। মূসা এবং মুসলিম মুজাহিদরা

বুঝতে পারেন যে, সংখ্যাধিক্যের উপর তাদের অহঙ্কার রয়েছে। তারা তাদের সাজসরঞ্জামের উপর ভরসা করে অত্যন্ত দম্ভভরে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

মূসা অনেক লম্বা সারি করে মুসলমানদেরকে দাঁড় করিয়ে দেন এবং ডান-বাম ও আগে-পিছে করে সকলকে বিন্যস্ত করে। মুজাহিদরা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

খ্রিস্টানরাও মুসলমানদের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। তাঁদের অধিনায়করা তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়। ইতিমধ্যে অনেক বেলা হয়ে এসেছে, সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে।

মূসা দেখতে পান যে, দুর্গের ফটকে খুবই সুন্দর একটি আসন রয়েছে এবং তাতে কয়েকটি চেয়ার পাতা রয়েছে। একটি চেয়ারে রেশমী পোশাক ও দামী অলংকার পরা একজন সুন্দরী রমণী বসা রয়েছে।

তখন মূসার পাশেই বসা ছিল কাউন্ট জুলিয়ান। মূসা তাকে জিজ্ঞেস করেন, ফটকের দ্বারে বসা সুন্দরী রমণীটি কে?

জুলিয়ান ভালভাবে দেখে বললেন, রমণীটি হচ্ছেন রাজা রডারিকের সুন্দরী স্ত্রী নাঈলা। ইতিমধ্যে খ্রিস্টান সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। এর ভয়ঙ্কর আওয়াজ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

মূসা চোখ তুলে দেখতে পান পঞ্চাশ হাজার খ্রিস্টান সৈন্য তাঁর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং দুর্গের প্রাচীরের উপরও অসংখ্য সৈন্য অপেক্ষা করছে। অল্পক্ষণ পরে খ্রিস্টান সৈন্যরা ধীরে ধীরে সামনে এগুতে লাগল। তা দেখে মূসা তাঁর সৈন্যকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।

মুসলিম মুজাহিদরা উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় সামনে এগুতে লাগলেন। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এখনই শত্রুসৈন্যকে পদদলিত করে তারা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়বে। খ্রিস্টান সৈন্যরাও একই গতিতে সামনে আসতে লাগল। উভয় দলই খুব কাছাকাছি এসে পড়ল। মুসলমানরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন।

উভয় দলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। তৃষ্ণার্ত তলোয়ার মানুষের রক্ত পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং তা থেকে বাঁচার জন্যে ঢাল ব্যবহৃত হতে লাগল।

উভয় দলই তীব্রভাবে যুদ্ধে মত্ত হয়ে পড়ল। একের পর এক হামলা চালাতে লাগল। মানুষের কর্তিত হাত-পা, মস্তক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে লাগল। শুভ্র তলোয়ার রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়ল।

খ্রিস্টান সৈন্যরা জোরে বাজনা বাজাতে লাগল এবং আহত খ্রিস্টানদের আর্ত চিৎকারে সারা ময়দানে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হলো। প্রথম সারিটি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ততদূর পর্যন্ত যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

খ্রিস্টানরা চেষ্টা করছিল যত শীঘ্র সম্ভব মুসলমানদেরকে হত্যা করে জয়লাভ করা; মুসলমানরাও অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ রচনা করছিল।

মুসলিম মুজাহিদরা যে খ্রিস্টানকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাতেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাঁরা ক্ষান্ত হতেন না। মুজাহিদরা খ্রিস্টানদের প্রথম সারিটিকে ইতিমধ্যেই হত্যা করে ফেলল এবং দ্বিতীয় সারির উপর হামলা চালাল। মূসা এক হাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে পতাকা ধরে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে এগুতে লাগলেন এবং শত্রুসৈন্য হত্যা করতে লাগলেন।

তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ। দাড়ি ছিল বরফের ন্যায় সাদা। কিন্তু অন্তরে ছিল যৌবনের উদ্দীপনা; যৌবনের তেজ নিয়ে তিনি শত্রুসৈন্যের মুকাবিলা করছিলেন।

তিনি যে দিকেই অগ্রসর হতেন, সেদিকেই শত্রুসৈন্যকে পিছু হটিয়ে দিতেন। যাদের উপরই আক্রমণ চালাতেন তাদেরকেই মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতেন; তাঁর শুভ্র তলোয়ারের দ্রুত সঞ্চারণে মনে হচ্ছিল, যেন মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

তাঁর আক্রমণের তীব্রতা লক্ষ্য করে অন্য মুজাহিদরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ফলে মুজাহিদদের আক্রমণের গতি তীব্রতর হয়ে উঠল; কিন্তু নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন; তাই কিছু সংখ্যক মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।

খ্রিস্টানদের প্রথম ও দ্বিতীয় সারির প্রায় সব সৈন্য নিহত হলো। মুজাহিদদের প্রথম সারির মাত্র কয়েকজন সৈন্য শাহাদত বরণ করলেন। যেসব খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো, তাদের অশ্বগুলো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। ফলে অন্য অনেক অশ্বারোহীও ধরাশায়ী হলো।

কয়েকজন মুজাহিদ কয়েকটি অশ্বকে পাকড়াও করেন ও বাকী কয়েকটিকে আহত অবস্থায় শত্রুদের দিকে তাড়িয়ে দেন। এই আহত অশ্বগুলো খ্রিস্টানদের মধ্যে এরূপ বিশৃংখলার সৃষ্টি করে যে, সেগুলোকে পাকড়াও করাই তাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

খ্রিস্টানরা যখন সেই ক্ষিপ্ত অশ্বগুলোকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত হলো, সেই মুহূর্তে মুসলিম মুজাহিদরাও তীব্র আক্রমণ চালালেন। ফলে খ্রিস্টানরা দ্বিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হল। একদিকে অশ্বগুলো ছুটাছুটি করে তাদেরকে আহত করতে লাগল, অপরদিকে মুসলিম মুজাহিদরা তাদের হত্যা করে চললেন।

খ্রিস্টানরা ঘাবড়ে গেল। মুজাহিদরাও তাদের দুর্বলতা আঁচ করে ফেললেন এবং আরো তীব্র হামলা চালালেন। তাতে অসংখ্য খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করল; কিন্তু কোন চেষ্টাই কোন কাজে এলো না। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে সবই ভেস্তে গেল। তারা সংখ্যায় এতই বেশী ছিল যে, বিপুল সংখ্যক সৈন্য মৃত্যুবরণ করলেও তাদের সংখ্যায় কোনরূপ ঘাটতি দেখা দিল না। যারা বেঁচে ছিল, তখন পর্যন্ত তারা উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।

যুদ্ধে মুসলমানেরা গভীরভাবে লিপ্ত ছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, এই হয়ত তারা যুদ্ধের সমাপ্তি টানবে; এখনই হয়ত যুদ্ধের চরম ফালসালা হয়ে যাবে।

খ্রিস্টানরা এই ভেবে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল যে, মুসলমানরা সংখ্যায় খুবই কম। তা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে; অথচ মৃত্যুবরণ করছে খুবই কম।

খ্রিস্টান সেনাপতি এই বলে তাদের সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করছে যে, মুসলমানরা সংখ্যায় খুবই কম; অতএব তোমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই; তোমরা আরো জোরে আক্রমণ চালাও। খ্রিস্টান সৈন্যরা কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে যখন সামনে অগ্রসর হতো, মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত, এভাবে একের পর এক খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হতো।

মুসলিম মুজাহিদরা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, তারা খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে; তাদেরকে আত্মরক্ষা করে এগুতে হবে। তাদের সামনে ছিল কেবল একটি প্রতিজ্ঞা–এ লড়াইয়ে জিততে হবে, ইসলামী পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। সে সময় দ্বি-প্রহর হয়ে এসেছিল। মওসুমটা ছিল গ্রীষ্মকাল। গরমে তাদের গা ঘর্মাক্ত হয়ে গেল, কিন্তু কোন দিকেই কোন পরোয়া নেই; রৌদ্রতাপ, পিপাসা সব কিছুকে তারা আজ ভুলে গেছে।

নাঈলা প্রাসাদের দ্বার থেকে যুদ্ধের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি এতই সুন্দরী ছিলেন যে দূর থেকে তাকে চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। মূসাও অত্যন্ত উদ্যম ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি নিজে অসংখ্য শত্রুসৈন্য হত্যা করেছিলেন। তাঁর একপাশে ছিলেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, অপর পাশে মারওয়ান। তাঁরাও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। মূসা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুজাহিদরাও সমস্বরে ধ্বনি তোলেন এবং আরো তীব্রভাবে হামলা চালান। এতে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং দুর্গের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে।

মুসলিম মুজাহিদরা পেছনে ধাওয়া করে খ্রিস্টানদেরকে কচুকাটা শুরু করেন। মুসলমানদের ইচ্ছা ছিল যে, তারা খ্রিস্টানদের সঙ্গেই দুর্গে প্রবেশ করবে। তারা খ্রিস্টানদের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের নিকটে পৌঁছলেন, সে সময় দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হলো। ফলে মুসলিম মুজাহিদরা দুর্গে প্রবেশ করতে পারলেন না। কিন্তু বহুসংখ্যক খ্রিস্টানও দুর্গের বাইরে রয়ে গেল। তাদেরকে মুজাহিদরা নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগলেন। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, একজন খ্রিস্টানও মুজাহিদদের হাত থেকে রেহাই পেলো না।

দুর্গের দ্বারটি ছিল অত্যন্ত মজবুত। সহজে ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। এজন্য মূসা সকলকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং মুসলিম মুজাহিদরা সবাই নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন।

একুশ

শহীদী বুরূজ

বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান মেরিডা থেকে অনেক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রণাঙ্গনে বেরিয়ে এসেছিল। তাতে তারা ভেবেছিল সহজেই মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পারবে অথবা পলায়নে বাধ্য করবে; কিন্তু যখন মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মুকাবিলা হলো, মুসলমানরা কচুকাটার মত তাদেরকে হত্যা করতে লাগল, তখন তারা পরাজিত হয়ে পালালো। এমনভাবে পালালো যে, পেছনে ফেরারও সুযোগ পেলো না। এই যুদ্ধে কমপক্ষে সাত হাজার খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে চার হাজার মুজাহিদ শহীদ হলো।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে খ্রিস্টানরা এমনভাবে ভীত হয়ে পড়ল যে, কখনো মুসলমানদের সামনাসামনি হওয়ারও তাদের সাহস রইল না।

মুসলমানরা প্রত্যেকদিন তাঁবু থেকে বের হয়ে দুর্গের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং খ্রিস্টানদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করতেন। মধ্যাহ্নের পর ফিরে আসতেন। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল; কিন্তু খ্রিস্টানরা দুর্গ থেকে বেরুল না। মুসলিম মুজাহিদরা অপেক্ষা করছিলেন যে খ্রিস্টানরা একবার দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলেই যুদ্ধের চরম ফয়সালা হয়ে যেতো; কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হলো না।

মূসা দেখতে পেয়েছিলেন, দুর্গটি এতই মজবুত যে, আক্রমণ করে তা জয় করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এইজন্য তিনি আক্রমণ না করে অবরোধ করার কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর ধারণা ছিল, দুর্গে সঞ্চিত রসদপত্র ফুরিয়ে গেলে খ্রিস্টানরা এমনিতেই বেরিয়ে আসবে অথবা আত্মসমর্পণ করবে।

অবরুদ্ধ অবস্থায় খ্রিস্টানরাও অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। তাদের মনে আশংকা দেখা দিল এই অবস্থায় বেশি দিন থাকতে হলে তারা ক্ষুধায় মরে যাবে।

এভাবে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হলো; কিন্তু খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হলো না; মূসা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত দুর্গটি আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একদিন ফজরের নামায পড়েই সকল মুজাহিদকে দুর্গ ভাঙ্গার এবং তাতে আরোহণ করার সাজসরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন।

মুজাহিদরাও পর পর কয়েকদিন বসে থেকে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। দুর্গ আক্রমণের কথা শুনে তাঁরা উল্লসিত হয়ে উঠেন। তাড়াতাড়ি তাঁরা তৈরি হয়ে পড়েন এবং নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মূসাও বের হয়ে আসেন। তিনি এসেই ঘোষণা করেন:

মুসলিম ভাইয়েরা, আমরা এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম, খ্রিস্টানরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমাদের মুকাবিলা করবে; কিন্তু আমাদের সম্পর্কে তাদের মনে এতই ভয়ের সঞ্চার হয়েছে যে, দুর্গ থেকে বেরুতেই তারা সাহস পাচ্ছে না।

আমরা এখানে বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করেছি; কিন্তু আর নয়। খ্রিস্টানরা হয়ত মনে করেছে যে, আমরা দুর্গটি জয় করতে পারবো না। তাই আমি চাই আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করব। তোমাদের কেউ কেউ নিকটে গিয়ে দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গতে থাকবে; আবার কেউ কেউ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করবে।

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর মূসা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুজাহিদরাও আওয়াজ তোলেন এবং বিদ্যুৎ বেগে ময়দানের দিকে এগুতে থাকেন।

খ্রিস্টানরা দুর্গপ্রাচীরের উপর দাঁড়ানো ছিল। মুসলমানদের অগ্রসর হতে দেখেই তারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল এবং উপর থেকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। মুসলমানরা ঢাল দিয়ে আড়াল করে নিজেকে ও ঘোড়াকে রক্ষা করে সামনে এগুতে লাগলেন এবং বিস্ময়করভাবে অগ্রসর হলেন।

তাদের সঙ্গে ছিল তলোয়ার, খঞ্জর, তীর ও বর্ম। তাছাড়া তাদের কাঁধে ঝুলানো ছিল তিন তিন শলার সিঁড়ি। এগুলোর অগ্রভাবে ছিদ্র ছিল। তাতে যুক্ত করে প্রয়োজন মতো সিঁড়িগুলোকে বড় করা যেতো।

মুজাহিদরা উভয় হাতের ঢালের সাহায্যে খ্রিস্টানদের পাথর নিক্ষেপ উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হতে থাকে; ইতিমধ্যে খ্রিস্টান সৈন্যরা পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। এতে মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; এতদসত্ত্বেও তারা পিছপা হলো না। মুজাহিদদের কেউ কেউ আহত হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ পরোয়া না করে সামনে এগুতে লাগল। মুজাহিদদের এরূপ বেপরোয়া ভাব দেখে খ্রিস্টানরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল না যে, মুসলিম মুজাহিদরা কিরূপ জীব। তারা আহত হওয়া সত্ত্বেও পিছপা হচ্ছে না, বরং এগিয়েই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা প্রত্যেক যুগেই বিস্ময়ের বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

সেনাপতি মূসা তাঁর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও মারওয়ান এবং অন্য মুজাহিদরা অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগুতে লাগলেন। ততক্ষণে পূর্ব গগনে সূর্যালোক দেখা দিয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যরশ্মি। প্রাতঃকালীন মৃদুমন্দ বাতাসে মুজাহিদদের হাতের ইসলামী পতাকা পতপত করে উড়ছে।

পাথর ও তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে খ্রিস্টানরা কাহিল হয়ে পড়ল। তাদের চিৎকারও বন্ধ হয়ে এলো। তারা ভেবেছিল তীর ও পাথর নিক্ষেপের ফলে মুসলমানরা হয়ত ভীত হয়ে পড়বে, তারা হয়ত দুর্গের কাছেই পৌঁছতে পারবে না; কিন্তু মুসলমানরা যখন কোন কিছুরই পরোয়া না করে দুর্গপ্রাচীরের নিকটে পৌঁছে গেল, তখন খ্রিস্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল।

তারা ঘাবড়ে গেল এবং দেখে দেখে নওজোয়ান খ্রিস্টানদেরকে প্রাচীরের উপর মোতায়েন করল। তারা বড় বড় পাথর ছুঁড়তে লাগল; কিন্তু ততক্ষণে মুজাহিদরা প্রাচীরের একদম নিকটে এসে গেল। ফলে পাথর নিক্ষেপে তাদের কোন অসুবিধা হলো না। নিকটে এসেই তারা সিঁড়ি লাগিয়ে প্রাচীরের উপরে উঠার চেষ্টা করতে লাগল।

মুজাহিদরা প্রাচীরের উপর বুরূজের নিকটে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন খ্রিস্টান সৈন্য তলোয়ারের আঘাতে তাদের মস্তক উড়িয়ে দেয়। এভাবে কয়েকজন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। মুজাহিদরা বুরূজের আশপাশে আরো চার-পাঁচটি সিঁড়ি লাগিয়ে একের পর এক উপরে উঠতে থাকেন, কিন্তু বুরূজের নিকটে পৌঁছলেই উপরে অবস্থানকারী খ্রিস্টানরা তলোয়ারের আঘাতে মুজাহিদদের হত্যা করে ফেলতে থাকে, আর মুজাহিদরাও এরূপ বেপরোয়া ছিল যে, তারা আত্মরক্ষার ব্যাপারে কোন খেয়ালই করতেন না। ফলে খ্রিস্টানদের তলোয়ারের আঘাতে অনেক মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন কিন্তু তাতেও মুজাহিদরা ক্ষান্ত হলেন না; তাঁরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং আরো বেশী পরিমাণ মুজাহিদ উপরে উঠতে লাগলেন।

তাতে অনেক মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। এজন্য এই বুরূজটিকে 'শহীদদের বুরূজ' নামে অভিহিত করা হয়।

মূসা ও অন্য মুজাহিদরা নিচে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের এই পরিণতি লক্ষ্য করছিলেন। পরিশেষে মূসা নিজেই ক্ষিপ্ত হয়ে মুখে তলোয়ার নিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। এক হাতে ঢাল, অপর হাতে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে লাগলেন। ততক্ষণে অন্য মুজাহিদরাও তাঁর অনুসরণে উপরে উঠতে লাগলেন।

মূসা বুরূজের কাছাকাছি পৌঁছলে তাঁর মস্তক দেখামাত্রই খ্রিস্টানরা তাঁকে লক্ষ্য করে তলোয়ারের আঘাত হানে; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ঢাল দিয়ে সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। তিনি হাত দিয়ে একজন খ্রিস্টানকে পা টেনে ধরে নিচে ফেলে দেন। খ্রিস্টানটি নিচে পড়ামাত্রই মুজাহিদরা তলোয়ার দিয়ে তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেন।

এরপর মূসা আরেকজন খ্রিস্টানকে নিচে ফেলে দেন। তারও একই পরিণতি ঘটে। এক সময় মূসা সুযোগ বুঝে বুরূজে উঠে পড়েন এবং তলোয়ার দিয়ে খ্রিস্টানদের হত্যা করা শুরু করেন।

মূসাকে একা দেখে খ্রিস্টানরা চারদিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলে; ইতিমধ্যে আরেকজন মুজাহিদও উঠে পড়েন। তিনিও খ্রিস্টানদের উপর প্রবল আক্রমণ শুরু

করেন। এরপর অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে আরো অনেক মুজাহিদ বুরূজে গিয়ে পৌঁছেন এবং দ্রুত তলোয়ার চালাতে থাকেন। খ্রিস্টানরা দেখতে পাচ্ছিল, মাত্র অল্পসংখ্যক মুজাহিদ বুরূজে উঠে এসেছে। তাই তাদেরকে হত্যা করা সহজ মনে করে অত্যন্ত দ্রুত তলোয়ার চালাতে লাগল।

বুরূজটি ছিল আয়তনে বেশ বড়। তাতে প্রায় এক হাজার খ্রিস্টান ছিল। মুজাহিদরা সংখ্যায় অল্প হলেও শহীদ মুজাহিদদের প্রতিশোধ স্পৃহায় তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তীব্র আক্রমণ চালান। প্রতি আক্রমণেই দলে দলে খ্রিস্টান নিহত হচ্ছিল। মুসলিম মুজাহিদরা সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিলেন। প্রত্যেক মুজাহিদের তলোয়ার যেন মৃত্যুর যমদূত? অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বুরূজে অবস্থানকারী সকল খ্রিস্টান হত্যা করে ফেললেন।

কিন্তু তাদের আগমন ধারা অব্যাহত ছিল; সামনের দলটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নতুন দল এসে হাযির হতো; কিন্তু তাদের মৃতের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল এবং বুরূজের ভেতরে মৃতদেহের স্তূপ পড়ে গেল তখন তারা ঘাবড়ে গেল; সামনে অগ্রসর হওয়ার আর সাহস পেলো না।

তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানরা বুরূজ থেকে বেরিয়ে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হলেই তাদের উপর হামলা চালাবে। ইতিমধ্যে বুরূজের ভেতরে মুজাহিদদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল; অতঃপর মুজাহিদরা প্রাচীর দেয়ালের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁরা বুরূজের দরজার নিকটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলেন নিচ থেকে একদল মুজাহিদ আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছেন।

মুজাহিদরা নিচের দিকে লক্ষ্য করেন। তারা দেখতে পান যে, একটি মুসলিম সৈন্যদল এগিয়ে আসছে। মূসা ও মুজাহিদরা বুঝতে পারেন যে, তাদের সাহায্যার্থে আবদুল আযীয আরেকটি সৈন্যদল নিয়ে এসেছেন।

ঠিক এমনি মুহূর্তে সাহায্যকারী সৈন্যদলটি পেয়ে মুসলিম মুজাহিদরা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁরা প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। প্রাচীর দেয়ালের নিচের মুজাহিদরাও তাদের ধ্বনির সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন।

নতুন সৈন্যদলের আগমন ও মুসলমানদের বিকট আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে খ্রিস্টান সৈন্যরা ঘাবড়ে যায়। মূসা উপরের মুজাহিদদেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রাচীর দেয়ালের দিকে গিয়ে দেখতে পান, খ্রিস্টানরা সাদা পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মূসা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও, এগিয়ে এসো। একজন সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান সামনে এগিয়ে এলো এবং বলল, আমরা সন্ধি করতে চাই।

মূসা–কি কি শর্তে?

খ্রিস্টান–শর্ত পরে নির্ধারণ করা হবে; এখন যুদ্ধ মুলতবি ঘোষণা করা হোক

মূসা–আমরা যেহেতু এই প্রাচীর যুদ্ধ করে অধিকার করেছি, আমরা তা ছেড়ে যাব না।

খ্রিস্টান–ঠিক আছে, প্রাচীর আপনাদের অধিকারেই থাকবে।

মূসা–বুরূজে অবস্থানরত মুজাহিদদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করা হবে?

খ্রিস্টান–আপনি যা ভাল মনে করেন।

মূসা–আমাদের সৈন্যরা প্রাচীরেই অবস্থান করবে।

খ্রিস্টান–আমরা তা মেনে নিলাম।

মূসা–তোমাদের সকল সৈন্য প্রাচীর ছেড়ে চলে যাবে।

খ্রিস্টান–এভাবে তো সমস্ত প্রাচীরটি আপনি অধিকার করতে চাচ্ছেন।

মূসা– না, আমরা কেবল নিরাপত্তা চাচ্ছি।

খ্রিস্টান–তাহলে ভাল।

মূসা–তোমরা তোমাদের সকল সৈন্যকে প্রাচীর থেকে নামিয়ে নাও।

খ্রিস্টান–আচ্ছা, তাই হবে।

খ্রিস্টান ব্যক্তিটি চলে গেল। সে মূসার সঙ্গে তার কথোপকথনের বিষয়বস্তু অন্য নেতাদেরকে অবহিত করল। খ্রিস্টান নেতারা সকল সৈন্যকে প্রাচীর ছেড়ে ভেতরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। নেতাদের নির্দেশমতো সকল খ্রিস্টান সৈন্য ভেতরে চলে গেল।

কয়েকজন খ্রিস্টান নেতা এসে মূসাকে জানালো যে, তারা সকল সৈন্য প্রাচীর থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

মূসা সিদ্ধান্ত নেন, এখন কেবল মাত্র আড়াই শত সৈন্য বুরূজ ও প্রাচীরে রেখে বাকী সকল সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁবুতে চলে যাবেন।

খ্রিস্টান–আপনিই বুঝি মুসলমানদের সেনাপতি?

মূসা–হাঁ, আমার নাম মূসা।

সকলেই তাঁর নাম শুনে থ' হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে একজন বলল, আপনিই বুঝি ইসলামী সাম্রাজ্যের আরব প্রতিনিধি?

মূসা–হাঁ।

খ্রিস্টান–আপনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট শক্তি-সাহসের অধিকারী।

মূসা–মুসলমানরা বৃদ্ধ হলেও যৌবনের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে না।

খ্রিস্টান–এটাই সত্য কথা।

অতঃপর মূসা আড়াইশ' মুজাহিদকে বুরূজ ও প্রাচীরে মোতায়েন করে বাকীদেরকে তাঁবুতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সকল মুজাহিদ বিজয় উল্লাসে কুরআনের বাণী উচ্চারণ করতে করতে চলে গেলেন। মূসা বললেন, এখন আমি যাচ্ছি। তোমাদের বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে আগামীকাল সকালে আমার তাঁবুতে এসো।

খ্রিস্টান–হাঁ, তাই ভাল।

খ্রিস্টানরা সেখান থেকে চলে গেল। মূসা বুরূজ থেকে নেমে তাঁবুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

বাইশ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মুজাহিদদের নতুন সৈন্য দলটি মূসার পুত্র আবদুল আযীযের নেতৃত্বে কায়রো থেকে এসেছিল। তাঁদের সংখ্যা ছিল সাত হাজার। তাঁরা এসেই দুর্গপ্রাচীরের বুরূজে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে খ্রিস্টানদের মনে ভয় সঞ্চারের উদ্দেশ্যে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন।

খ্রিস্টানরা দেখতে পাচ্ছিল, পূর্বের মুজাহিদরাই একটি বুরূজ দখল করে ফেলেছে। সুতরাং নবাগত মুজাহিদরা যদি আক্রমণ চালায় তবে পুরো দুর্গটিই তারা দখল করে ফেলবে, ফলে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়।

তাছাড়া খ্রিস্টানদের মনে সন্দেহ ছিল মুসলমানদের আরো সৈন্য হয়ত নিকটে রয়েছে, তারা যে কোন সময় এসে হামলা চালাতে পারে। এই সব কারণে খ্রিস্টানরা সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তী আলাপ-আলোচনার জন্য তারা আপাতত যুদ্ধ মুলতবির প্রস্তাব পেশ করে। মূসা তাদের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং বুরূজ ও দুর্গ প্রাচীরে আড়াইশ' সৈন্য মোতায়েন করে তিনি তাঁবুতে ফিরে আসেন। তিনি প্রাচীরের নিচে তাঁবু পর্যন্ত কিছু সৈন্য মোতায়েন করেন যাতে প্রাচীরের উপরে মুজাহিদদের উপর খ্রিস্টানরা আক্রমণ করলে নিচের মুজাহিদরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তাঁবুতে সংবাদ দিতে পারে।

কারণ অধিকাংশ খ্রিস্টান তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো। এই জন্য মুসলমানরা তাদের কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারতো না।

মূসা নিচে নেমে এসে নবাগত মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছলে তাঁর পুত্র আবদুল আযীয এসে তাঁকে সালাম জানান।

মূসা বললেন, আমার নয়নমণি, তুমি যথাসময়ে এসে পৌঁছেছ।

আবদুল আযীয–আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি এক মুহূর্তও দেরী করিনি।

মূসা–খুবই ভাল করেছ; তোমার আসার ফলে খ্রিস্টানরা খুবই ভীত হয়ে পড়েছে।

আবদুল আযীয–তারা কি আনুগত্য ঘোষণা করেছে?

মূসা–এখনো পুরোপুরি করেনি। যুদ্ধ মুলতবি হয়েছে মাত্র।

আবদুল আযীয–তাহলে তারা সন্ধিতে রাজী হয়েছে?

মূসা–হাঁ, আগামীকাল তাদের একটি প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য আসবে। এখন তা হলে তোমার সৈন্যদলকে বিশ্রাম নিতে বলো এবং তুমি নিজেও বিশ্রাম গ্রহণ করো।

আবদুল আযীয–তা-ই হবে পিতা।

আবদুল আযীয তাঁর সৈন্যদলকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দেন। সকল সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে তাঁবু খাটাতে শুরু করে। অল্পক্ষণেই তাঁবু খাটানো শেষ হয়ে যায়। সবাই বিশ্রাম করতে থাকেন। আবদুল আযীযও নিজ তাঁবুতে চলে যান। মূসাও ইতিমধ্যে নিজ তাঁবুতে গিয়ে উপনীত হন। কখনো কখনো তিনি দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করতেন। আজকেও কি মনে করে তিনি দাড়িতে খেযাব লাগিয়ে কালো করে ফেলেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল মূসার তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হয়। গতকাল যাদের সঙ্গে মূসার কথাবার্তা হয়েছিল, আজকের প্রতিনিধি দলে তাদের ছাড়া নতুন কিছু লোকও ছিল। তাঁবুতে গিয়ে তারা মূসাকে অভিবাদন জানালো। মূসাও তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে বসতে বললেন। তিনি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত সদাচরণ করেন। তিনি ভেবে আশ্চর্য হন যে, এই খ্রিস্টানরা তো নিজেরাই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তারা তো নাও আসতে পারতো।

কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি জন্য এসেছেন?

আগতদের একজন বললেন, আমরা আপনাদের নেতার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, যার সঙ্গে গতকাল আমাদের কথা হয়েছিল।

গতকাল মূসার সঙ্গে কথা বলেছিল, এমন একজন মূসাকে বলল, আপনিই কি সেই ব্যক্তি?

মূসা–হাঁ।

জনৈক খ্রিস্টান–কিন্তু গতকাল তো আপনার দাড়ি সাদা ছিল।

মূসা মুচকি হেসে বললেন, হাঁ, কিন্তু আজ তো কালো। স্পেনবাসীরা তখন পর্যন্ত খেযাবের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, সাদা চুল কিভাবে কালো করা যায় তা তারা জানতো না। এই জন্যে দাড়িতে খেযাব লাগিয়ে কালো করার ফলে তারা মূসাকে চিনতে পারলো না।

তারা যখন জানতে পারলো যে, তিনিই সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে গতকাল তাদের কথা হয়েছে, তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, যে জাতি নিজেদের বয়স পরিবর্তন করে ফেলতে পারে, যাদের বৃদ্ধরাও ইচ্ছামত যুবক হয়ে যেতে পারে, তাদেরকে কোন জাতি পরাজিত করতে পারবে না।

তার চাইতে বরং এটাই ভাল যে, মুসলমানরা যেসব শর্তারোপ করে, আমরা সেসবই মেনে নেব; সকলেই এ কথায় একমত হলো।

খ্রিস্টানদের একজন বলল, আমরা অনর্থক রক্তপাত করতে চাই না। আমরা চাই এমন সব শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে যাতে আমাদের জাতির কোন ক্ষতি হবে না।

মূসা–আমি তো প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে তোমাদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম। আমি নিজেও আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে রক্তপাত চাই না। অতএব, শর্তও তেমন কঠিন কিছু হবে না।

জনৈক খ্রিস্টান–তাহলে শর্ত বর্ণনা করুন।

মূসা–প্রথম কথা হলো, যারা দুর্গে থাকতে চাইবে, তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া আমাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে। যারা তা করতে রাজী নয়, তাদেরকে দুর্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে তাদের সকল ধন-সম্পদ অবশ্যই রেখে যেতে হবে। যারা এখানে থাকবে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব এবং এজন্যে তাদেরকে এক প্রকার নামমাত্র কর দিতে হবে। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম জিযিয়া।

খ্রিস্টান–শর্ত যুক্তিসঙ্গত, আমরা তা মেনে নিচ্ছি।

মূসা–তা হলে তোমরা এখন যেতে পার। সর্বপ্রথম ঘোড়া ও অস্ত্রগুলো একত্রিত করবে; অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কারো কাছেই যেনো এ দু'টির কোনটিই না থাকে।

খ্রিস্টান–এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমরা আমাদের অঙ্গীকারের কোনরূপ অন্যথা করবো না।

মূসা–এটাই তো সভ্যতার দাবী, এর পর যদি কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় তবে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

খ্রিস্টান–হাঁ, তা-ই হবে। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব জমা করে আপনাদের কাছে উপস্থিত করব।

মূসা–ঠিক আছে।

খ্রিস্টানরা চলে যায়। মূসা নিজ সৈন্যদলকে জানিয়ে দেন যে, আজ যুদ্ধ মুলতবি থাকবে। তাতে অনেকেই মনে মনে ক্ষুন্ন হন; তবে তা প্রকাশ করেনি; তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত হন। সন্ধ্যায় খ্রিস্টানরা তাদের সমস্ত ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। মূসা সেগুলো গুণে গ্রহণ করেন; এরপর তিনি আলী ইব্‌ন রাবী'কে দুর্গটি অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। মূসা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, কোন খ্রিস্টানের সাথে যেন কোনরূপ দুর্ব্যবহার করা না হয়, তিনি আলীকে নির্দেশ দেন, খ্রিস্টানদের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। আলী বিনা বাধায় দুর্গটি অধিকার করেন। এটা ছিল ১লা শাওয়াল, ৯৩ হিজরীর ঘটনা। রাতে মুজাহিদরা খুব নিশ্চিন্তে

ঘুমাল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লেগে গেল। আবদুল আযীযের স্থানটি অত্যন্ত ভাল লাগল। তিনি একটি ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। পাহাড়টির চারদিকে ছিল সবুজের সমারোহ।

আবদুল আযীয এই সবুজ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি মনের অজান্তেই এগুতে থাকেন, যতই এগুতে থাকেন, উপত্যকার রং–বেরঙের ফুলের শোভা তাকে ততই মুগ্ধ করতে থাকে। এভাবে এগুতে এগুতে এক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। আরো কিছুদূর এগিয়ে তিনি একটি মূর্তি দেখতে পান। মূর্তিটি ছিল অত্যন্ত উঁচু। এর মস্তকের দিকে চাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। মূর্তিটি এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তা দেখে রীতিমত ভয় হতো। ইতিপূর্বে আর তিনি এত বড় মূর্তি কখনো দেখেননি। এটি দেখে তাঁর কায়রোর দেখা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি মনে মনে উচ্চারণ করেন, এটি সেই উপত্যকা, সেই ধ্বংসাবশেষ ও মূর্তি–যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম; তা হলে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। তবে সেই সুন্দরী রমণী কোথায়। যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম।

তিনি আবার মূর্তিটির দিকে তাকান; মূর্তিটির প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন; সবকিছুই শিল্পমণ্ডিত। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এতে কোথাও কোন জোড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন বিরাট একটি পাথর কেটে মূর্তিটি তৈরী করা হয়েছে। আবদুল আযীয মূর্তিটির চেহারা দেখার খুবই চেষ্টা করে; কিন্তু উঁচু হওয়ার দরুন তিনি দেখতে পাননি।

তাঁর দৃষ্টি ফুলের উপর থেকে আরো দূরে প্রসারিত হলো। এর কিছু পরে তিনি কয়েকজন সুন্দরী রমণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। তাদের পরনে ছিল দামী পোশাক; তারা নানা প্রকার অলংকারে সুশোভিত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সর্বাধিক সুন্দরী এক মহিলা; তার পরনে ছিল মহা-মূল্যবান পোশাক। গলায় ছিল অতি মূল্যবান মোতির হার; অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিল মহামূল্যবান অলংকারাদি।

গলার হারটি ছিল মহামূল্যবান মণিমুক্তা খচিত; এটি এতই উজ্জ্বল ছিল যে, চোখ তুলে তাকানো যেতো না। এই হারটি তার চেহারায় এনে দিয়েছিল বিদ্যুতের ঝলক। তার চেহারা থেকে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল; আবদুল আযীয একদৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তেইশ

মোহময়ী নারী

ইসমাঈলের আগমনে মুগীছ আর-রূমী ও অন্য মুজাহিদরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ইসমাঈল নিজেও সকলের সাক্ষাৎ পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন। মুগীছ আর-রূমী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজের অবস্থানের প্রাসাদে চলে আসেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ইসমাঈলকে তাঁর বন্দী হওয়া ও মুক্তিলাভের কাহিনী শোনানোর অনুরোধ করেন। ইসমাঈল তাঁর বন্দী হওয়া ও বন্দীদশা থেকে পালানোর ঘটনা থেকে শুরু করে পাহাড়ে আরোহণ করা মূল্যবান পাথর ও রৌপ্যখনির সাক্ষাৎলাভসহ যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করেন। মুগীছ আর-রূমী ও অন্য সবাই অত্যন্ত আগ্রহভরে তাঁর কাহিনী শোনেন। তাঁর বর্ণনা শেষ হলে মুগীছ আর-রূমী বললেন, তুমি তো বিস্ময়কর কাহিনী শোনালে। যে পাহাড়ে মূল্যবান পাথর ও রৌপ্যখনি দেখেছিলে, সেখানে কি এখনো যেতে পারবে?

ইসমাঈল–জী হাঁ, আমার ধারণা আমি সেখানে যেতে পারব।

মুগীছ আর-রূমী–তা ভুলে যাও, কখনো আর সেখানে যাওয়ার চিন্তা করো না।

ইসমাঈল–আমি নিজে তো কখনো সেখানে যাব না।

মুগীছ আর-রূমী–তা-ই ঠিক। মনে রেখো, ধন-সম্পদ মানুষকে আল্লাহ ও পরকালের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আমাদের মহানবী (সা) এজন্যেই কখনো সম্পদ লাভে আগ্রহী হননি। অথচ তিনি যদি চাইতেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য সোনা-রূপার পাহাড় দিয়ে দিতেন। আমরা সেই মহানবীর অনুসারী মুসলমান। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

ইসমাঈল–এখন তাহলে আপনি আমাকে জিহাদের কাহিনী শোনান।

মুগীছ আর-রূমী রডারিকের সৈন্যদলের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ এবং কর্ডোভা জয়ের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেন।

ইসমাঈল অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তিনি উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

মুগীছ আর-রূমী–অনুতপ্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমি তো জিহাদ করতেই দেশ ত্যাগ করেছিলে; কিন্তু অনিচ্ছাকৃত কারণে জিহাদে শরীক হতে পারলে না; তা

সত্ত্বেও আল্লাহ্ হয়ত তোমাকে একজন মুজাহিদের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবেন। তাছাড়া এখনো তো অনেক অঞ্চল অবিজিত রয়েছে। অতএব দুঃখের কোন কারণ নেই।

ইসমাঈল–তাদমীরের কি হলো?

মুগীছ আর-রূমী–সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে।

ইসমাঈল–আল্লাহ চাহে তো, আমি অবশ্যই তাকে খুঁজে বের করব।

মুগীছ আর-রূমী–আল্লাহ চাহে তো তা-ই হবে; এখন একটি কামরা বেছে নিয়ে তাতে আরাম করো।

ইসমাঈল–আচ্ছা।

এই বলে তিনি উঠে যান, তিনি নিজের জন্য একটি প্রশস্ত কামরা বেছে নেন। তাতে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করেন; এ ক'দিনে কখনো বিলকীসের কাছে যাওয়ার কথা মনে করেননি।

কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে, যতদিন বিলকীস সফরে ছিল, ততদিন পর্যন্ত তার নিরাপত্তার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এখন সে তার পরিবার-পরিজনদের কাছে পৌঁছে গেছে। এখন আর তাঁর প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া ইসমাঈল এও মনে করেছিলেন যে, বিলকীস হয়ত তার গৃহে যাওয়া পছন্দ করবে না; এইজন্য তিনি কখনো বিলকীসের গৃহে যাওয়ার চিন্তা করেননি। অপরদিকে বিলকীস প্রতিমুহূর্তে তার কথা মনে করতো। সে ইসমাঈলকে ভুলার জন্য যতই চেষ্টা করত তাঁর স্মৃতি তাকে তত বেশী পীড়া দিত।

কর্ডোভায় মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে তাঁদের অবস্থানের আর প্রয়োজন রইল না। মুগীছ আর-রূমী মুজাহিদদেরকে টলেডোর দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মুজাহিদরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ইসমাঈলও কর্ডোভা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর মনে অজানা ভাবনার উদয় হলো। তিনি চিন্তা করলেন, বিলকীসের সঙ্গে শেষবারের মত সাক্ষাৎ করবেন; কিন্তু সাহস হলো না; তিনি টলেডো যাত্রার জন্য তৈরি হতে থাকেন। একদিন দুপুরে নিজ কামরায় তিনি বিষণ্ন মনে বসেছিলেন। এমনি সময় পায়ের হালকা শব্দ শুনতে পান। চোখ তুলে তাকান। তিনি দেখতে পান বিলকীস তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে; বিলকীসকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি পূর্ণচন্দ্র, যার আগমনে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়; ইসমাঈল তাকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান, বিলকীস কাছে এসেই ইসমাঈলকে লক্ষ্য করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বললেন; হে কাপুরুষ, ভীরু! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ইসমাঈল অভিবাদন গ্রহণ করে বিলকীসকে বসতে ইঙ্গিত করেন। বিলকীস বসে পড়ে। ইসমাঈল বললেন, আমি কাপুরুষ, ভীরু! মনে হচ্ছিল সুন্দরী বিলকীস ইসমাঈলের প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট কিংবা ক্ষুব্ধ ছিল। সে বলল, জী-না, আপনি কেন হবেন!

ইসমাঈল–আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, তুমি হয়ত কখনও আমাকে দোষারোপ করতে পার। বিলকীস ভালবাসামিশ্রিত ক্ষোভের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। সে বলল, যতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন, ততক্ষণ তো বানিয়ে কোন কথা বলেন নি।

ইসমাঈল–আমি বানিয়ে কথা বলছি?

বিলকীস–না, আমি বলছি!

ইসমাঈল–তুমি রাগ করছ কেন?

বিলকীস–আপনার মনকে জিজ্ঞেস করুন।

ইসমাঈল–আমার মনে যদি কোন কথা থাকত, তাহলে....

বিলকীস-তাহলে কি হতো?

ইসমাঈল–তাহলে মনকে জিজ্ঞেস করতাম।

বিলকীস–আপনার মন পাথর কিনা, তাই.....

ইসমাঈল–আর তোমার?

বিলকীস–আমার! আচ্ছা, এসব এখন থাক। এখন বলুন আপনিও কি চলে যাবেন, না এখানেই থাকবেন?

ইসমাঈল–ও মা, আমি এখানে থাকব কিভাবে?

বিলকীস–তা তো আমি আগেই জানতাম।

ইসমাঈল–তুমি কি জানতে?

বিলকীস–আমি জানতাম, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই আপনি চলে যাবেন।

ইসমাঈল–আমি বহুবার তোমার গৃহে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি; কিন্তু...

বিলকীস–কিন্তু ফুরসত হয়নি, তাই তো?

ইসমাঈল–না-বরং.....

বিলকীস–আমার ঠিকানা জানা নেই?

ইসমাঈল–তুমি তো আমাকে বলতেই দিচ্ছ না।

বিলকীস–তাহলে বলুন।

ইসমাঈল–সাহস পাচ্ছিলাম না।

বিলকীস–কেন?

ইসমাঈল–কারণ আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি হয়ত আমার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, কিংবা তোমার পিতা তা ভাল চোখে দেখবে না।

বিলকীস–আহা, তা কেমনে হতে পারে, ইসমাঈল!

আজকেই প্রথমবারের মত বিলকীস ইসমাঈলকে নাম ধরে সম্বোধন করল। সে একদৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে রইল; বলল, তুমি সে চিন্তায় বসে ছিলে, আর আমি ভেবেছি, তুমি একটা ভীরু, কাপুরুষ। এই জন্যেই একবারের জন্যও আসনি।

ইসমাঈল–তুমি তাহলে রাগ করোনি।

বিলকীস–না, তবে....

ইসমাঈল–তবে কি?

বিলকীস–তুমি এখান থেকে যেয়ো না।

ইসমাঈল–তা কি করে সম্ভব?

বিলকীস–কেন?

ইসমাঈল–মুগীছ আর-রূমী আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

বিলকীস–তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

ইসমাঈল–তোমার পিতা কি তাতে সম্মত হবেন?

বিলকীস–আমি তাকে সম্মত করেছি।

ইসমাঈল–আচ্ছা, তাহলে আমি আজকে মুগীছের অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করি।

বিলকীস-আজকে নয়, বরং এখনই।

ইসমাঈল–আচ্ছা, তাহলে তুমি বস, আমি অনুমতি নিয়ে আসছি।

বিলকীস–যাও।

ইসমাঈল চলে গেলেন। বিলকীস একাকী বসে রইলেন। বসে বসে তিনি কি যেন ভাবছিলেন; এমনি মুহূর্তে ইসমাঈল ফিরে এলেন। তিনি বললেন, মুগীছ আর-রূমী নিজে তো অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু তিনি বললেন, তোমার পিতার অনুমতি অপরিহার্য।

বিলকীস-আমি তো তাকে রাজী করেছি।

ইসমাঈল–তিনি কি তোমাকে আমাদের সঙ্গে টলেডো যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন?

বিলকীস–নিশ্চয়ই, তোমার প্রতি তিনি খুবই কৃতজ্ঞ; এইজন্য আমি একটু বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

ইসমাঈল–তাহলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে আমি তো অনর্থক ইতস্তত করেছি।

বিলকীস–তিনি নিজেই বলেছেন, ইসমাঈল তো দেখছি একজন কাপুরুষ। সে তো একবারও তোমাকে দেখতে এলো না।

ইসমাঈল–তাহলে তো দেখছি, আমি ভুল বুঝেছি।

বিলকীস-আচ্ছা এখন তাহলে অনুমতি দিন। আমাকেও প্রস্তুতি নিতে হবে।

ইসমাঈল–ঠিক আছে।

বিলকীস চলে গেল। ইসমাঈল তার সরলতার জন্য বেশ কিছুক্ষণ আফসোস করলো। এই সব আলোচনার তৃতীয় দিন দু'শ মুসলমানকে কর্ডোভায় রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে মুগীছ আর-রূমী টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমামন ও তার সুন্দরী কন্যা বিলকীসও তাঁদের সঙ্গে চললেন।

চব্বিশ

হৃদয়ের আকর্ষণ

আবদুল আযীয সুন্দর হার পরিহিতা রমণীকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রমণীটি ছিল অপরূপ সুন্দরী; তদুপরি তার পরনে ছিল মূল্যবান পোশাক; অঙ্গে ছিল নানা রকমের মূল্যবান অলংকার, গলায় ছিল মহামূল্যবান উজ্জ্বল হার। এরূপ সাজসজ্জায় তাকে আরো সুন্দরী মনে হচ্ছিল। তিনি ছিলেন রাজা রডারিকের স্ত্রী রানী নাঈলা। আরব ও খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা তাকে 'স্পেনের হুর' এবং মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাকে 'স্পেন সুন্দরী' নামে অভিহিত করেছেন।

আবদুল আযীয নাঈলার দিকে এবং নাঈলা আবদুল আযীযের দিকে তাকিয়ে ছিলেন; কিছুক্ষণ পর নাঈলা এক আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সামনে এগুতে লাগলেন। তিনি কিছুটা এগিয়ে এসে আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

নাঈলা আরবী জানতেন; তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলছিলেন। আবদুল আযীয বললেন, আমি নামবিহীন এক ব্যক্তি। নাঈলা হাসলেন। বললেন, আপনি কি নামবিহীন না আপনার নামই রাখা হয়নি?

আবদুল আযীয–আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন?

নাঈলা–আপনি আরবের অধিবাসী?

আবদুল আযীয –হ্যাঁ, তা-ই।

নাঈলা–মুসলিম গভর্নর কি আপনার আত্মীয়?

আবদুল আযীয–হ্যাঁ তিনি আমার পিতা।

নাঈলা–সাহায্যকারী এই সৈন্যদল কি আপনিই নিয়ে এসেছেন?

আবদুল আযীয–হ্যাঁ, আমি নিয়ে এসেছি।

নাঈলা–আপনি এখানে কি জন্যে এসেছিলেন?

আবদুল আযীয–আপনি শুনতে চাইলে আমি বলতে পারি।

নাঈলা–হ্যাঁ, আমি শুনছি, আপনি বলুন।

আবদুল আযীয–কিছুদিন আগে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম।

নাঈলা–একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন?

আবদুল আযীয–হাঁ।

নাঈলা–কি দেখেছিলেন?

আবদুল আযীয–এখন যা দেখছি।

নাঈলা–এখানে কি আপনি ইতিপূর্বেও এসেছিলেন?

আবদুল আযীয–না, কখনো না।

নাঈলা–তাহলে স্বপ্ন দেখলেন কি করে?

আবদুল আযীয–আমি বলতে পারব না; কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ, এই বিরাটকায় মূর্তি ও এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আপনি।

নাঈলা তা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি বললেন, আমাকেও কি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন?

আবদুল আযীয–হাঁ।

নাঈলা–এ তো দেখছি এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

আবদুল আযীয–আরও বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যখন আমি আমার স্বপ্ন বর্ণনা করছিলাম, সে সময় সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান ও সেভিলের পাদ্রী স্ক্যাফ আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন।

নাঈলা আরো বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, তারা দু'জন সেখানে কেন গিয়েছিল?

আবদুল আযীয–রাজা রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিন্ডার সতীত্ব হরণ করেছে, তারা এই অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিল।

তা শুনে নাঈলা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন ঠিক আছে; এই বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন; তার চেহারায় এক লজ্জার আভা ফুটে উঠল; কিন্তু তাতে তাকে আরো সুন্দরী মনে হচ্ছিল।

আবদুল আযীয বললেন, কাউন্ট জুলিয়ান আমাকে বলেছিলেন যে, মহামূল্যবান হার পরিহিতা সুন্দরী মহিলা স্পেনের রানী নাঈলা।

নাঈলার চেহারায় লজ্জার আভা আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল; তিনি মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্ভবত সে সময়ের কথা মনে পড়েছিল যখন তিনি ছিলেন স্পেনের একক সম্রাজ্ঞী; স্পেনের সকল মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখতো; কিন্তু পাপিষ্ঠ স্বামী তার অপকীর্তির জন্যে সে নিজে মৃত্যুবরণ করল এবং নাঈলাকে আত্মরক্ষার জন্যে রাজধানী ছেড়ে মারীটায় পালিয়ে আসতে হলো।

আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি নাঈলা?

নাঈলা–জী হাঁ, আমিই সেই অভাগা নাঈলা।

আবদুল আযীয–আপনি অভাগা হবেন কেন? বরং আপনি হচ্ছেন সেই ভাগ্যবতী নারী, যার জন্য সারা দুনিয়া গর্ববোধ করে।

নাঈলা–আহা, আমি তো আমার সম্পর্কে জানি....

তিনি এতই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, সব কথা শেষ করতে পারলেন না। আবদুল আযীয তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনি যা বলবেন, আমি তা-ই করব।

নাঈলা–আমি কি নির্দেশ দিতে পারি? আমি তো একজন কয়েদী।

আবদুল আযীয–আপনি কয়েদী নন।

নাঈলা–আমার জাতি আপনাদের দাস এবং আমি আপনাদের দাসী।

আবদুল আযীয–না, না, আপনি দাসী নন, বরং স্বাধীন এসব ভেবে খামাখা মনকে কষ্ট দেবেন না।

নাঈলা–ভাগ্যের লেখা ফলবেই, আমাকে এর কষ্ট অবশ্যই মাথা পেতে নিতে হবে; কিন্তু এই কষ্টের কোন সুফল নেই।

আবদুল আযীয–আপনি অনর্থক দুঃখ করবেন না; বরং বলুন, আপনি কি চান।

নাঈলা–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি শুনেছি যে, মুসলিম গভর্নর টলেডো যাচ্ছেন?

আবদুল আযীয– হাঁ।

নাঈলা–আপনিও কি চলে যাবেন?

আবদুল আযীয–অবশ্য, আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

নাঈলা–আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারব?

আবদুল আযীয–হাঁ, এটা তো আনন্দের কথা।

নাঈলা–তা হলে আমাকে অনুমতি দিন।

আবদুল আযীয–এটা তো আমারও কামনা।

নাঈলা–আমারও।

আবদুল আযীয অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি তাঁর ভাগ্যের জন্য গর্ব করতে লাগলেন। নাঈলা ছিলেন যেমনি সুন্দরী, তেমনি বচন-বাচনও ছিল তার অভিনব। আল্লাহ তাকে রূপ-গুণ উভয়ই দান করেছিলেন। তিনি বললেন, আমার জন্য আপনার গর্বের কি আছে?

আবদুল আযীয–এই জন্যে যে, আপনার আকর্ষণই আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। অন্যথায়–

নাঈলা–অন্যথায় কি হতো?

আবদুল আযীয–আমি তো সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম।

নাঈলা–কেন?

আবদুল আযীয–স্পেনে যখন সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো, তখন আমাকে পাঠানোর জন্য আমি পিতার কাছে আবেদন করেছিলাম; কিন্তু তিনি তাতে সম্মত

হননি; আমার পরিবর্তে তারিককে পাঠানো হলো। দ্বিতীয়বার পিতা আমাকে রেখে তিনি নিজেই এসে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো যে, আমাকেও আসতে হলো। আর তাই আপনার সাক্ষাৎ হলো।

নাঈলা–কিন্তু আপনি যদি না আসতেন?

আবদুল আযীয–তাহলে কি হতো?

নাঈলা–তাহলে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো না এবং...

আবদুল আযীয–এবং কি হতো?

নাঈলা–আমার মনে হয়ত আপনাদের সঙ্গে যাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হতো না।

আবদুল আযীয–এটাই আমার জন্য গৌরবের বিষয়।

নাঈলা–কিন্তু....

আবদুল আযীয–কিন্তু কি?

নাঈলা–আপনি কতদিন আমার পাশে থাকবেন?

আবদুল আযীয–আমি সর্বদা আপনার পাশে থাকব।

নাঈলা–সব সময়!

আবদুল আযীয–হাঁ, সব সময়।

নাঈলা–বুঝে-শুনে ওয়াদা করবেন।

আবদুল আযীয–আমি বুঝে-শুনেই বলছি।

নাঈলা–আপনি কি চিরদিনই এ দেশে থাকতে চান।

আবদুল আযীয–হাঁ।

নাঈলার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে আপনার ওয়াদায় ঠিক রাখুন।

আবদুল আযীয–আমি মুসলমান। মুসলমানদের ওয়াদা সুদৃঢ় হয়।

নাঈলা–আমিও তা শুনেছি।

আবদুল আযীয–আপনি কি সব সময় আমার সঙ্গে থাকতে প্রস্তুত?

নাঈলা অভিমানের ভঙ্গিতে আবদুল আযীযের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি প্রস্তুত না থাকলে আপনাকে এসব জিজ্ঞেস করব কেন?

আবদুল আযীয–কিন্তু......

নাঈলা–কিন্তু কিসের?

আবদুল আযীয–এটা মনে রাখবেন যে, আপনি একজন রানী এবং আমি একজন গভর্নরের পুত্র।

নাঈলা–কিন্তু এখন তো আমি রানী নই।

আবদুল আযীয–এখনো আপনি রানী। সকল খ্রিস্টান এখনো আপনার পায়ে মস্তক অবনত করতে প্রস্তুত।

নাঈলা–যাক, আমি যে-ই হই না কেন, আপনি আপনার অঙ্গীকার মনে রাখবেন।

আবদুল আযীয–আমি আমার কথা অবশ্যই মনে রাখব। তবে আমাকে একটি কথা বলবেন কি?

নাঈলা–বলুন, কি সে কথা।

আবদুল আযীয–আপনি কি আমাকে আগে দেখেছিলেন?

নাঈলা–না, একমাত্র আজকেই।

আবদুল আযীয–আপনি তো আমাকে দেখতে আগ্রহী ছিলেন।

নাঈলা–নিশ্চয়ই। আজকে যখন আপনাকে এদিকে আসতে দেখলাম তখনই আমি আমার দাসীদের নিয়ে এখানে আসলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আপনি হয়ত সেই মূর্তিটি দেখতে যাচ্ছেন।

আবদুল আযীয–কিন্তু আমার জানাও ছিল না যে, মূর্তিটি কোথায়। একান্ত আকস্মিকভাবেই আমি এখানে এসে পড়লাম।

নাঈলা লজ্জার সুরে বললেন, এটা তো আমারই হৃদয়ের আকর্ষণ।

আবদুল আযীয–না, এটা ছিল আমার হৃদয়ের আকর্ষণ। এই আকর্ষণই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

নাঈলা–যাহোক, এটা ছিল আমাদের উভয়ের হৃদয়ের আকর্ষণ, যা পরস্পরকে টেনে নিয়ে এসেছে।

আবদুল আযীয–এটাই ঠিক।

নাঈলা–এখন আমাদের যাওয়া উচিত।

আবদুল আযীয–তাহলে চলুন।

উভয়েই যেতে লাগলেন। পশ্চাতে দাস-দাসীরা আসতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে নাঈলা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে সঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে আপনার পিতার সম্মতি নেবেন কিভাবে?

আবদুল আযীয–নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অবশ্যই সম্মতি নেব।

নাঈলা–তা-ই ভাল।

তারা উভয়েই ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। এক সময় মারীটা দুর্গে গিয়ে পৌছলেন। নাঈলা অভিবাদন জানিয়ে দুর্গের ভেতরে চলে গেলেন এবং আবদুল আযীয মুজাহিদদের কাছে ফিরে গেলেন।

পঁচিশ

নতুন সিদ্ধান্ত

মূসা ইবন নূসায়র কর্তৃক মারীটা বিজয়ের পর স্পেনের পশ্চিমাঞ্চলের খ্রিস্টানরাও ভীত হয়ে পড়েছিল। ফলে মারীটার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শহর থেকে দলে দলে লোক এসে সন্ধি করতে লাগল। এইভাবে পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতেও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মূসা টলেডো যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সৈন্যদের মধ্যে প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল। আবদুল আযীয নাঈলাকে সঙ্গে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিন্তু পিতার সম্মতি ছাড়া তা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই কিভাবে সম্মতি নেয়া যাবে এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। দেখতে দেখতে যাত্রার দিন নিকটে এসে গেল, কিন্তু তখন পর্যন্ত আবদুল আযীয কোন কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেননি।

আবদুল আযীয অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি পিতার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁর কাছে আরও কয়েকজন মুসলিম নেতা উপস্থিত ছিলেন। আবদুল আযীয সালাম দিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। মূসা বললেন, স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল আমরা জয় করেছি। আর মাত্র অল্পসংখ্যক এলাকা বাকী রয়েছে।

আবদুল আযীয বললেন–তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু....

মূসা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু কি, তোমার কি ধারণা?

আবদুল আযীয–বিজিত শহরগুলোতে আমরা যেভাবে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম মুজাহিদ রেখে যাচ্ছি, আমার সন্দেহ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় খ্রিস্টান অধিবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে মুজাহাদিদদের আত্মরক্ষার কোন পথ থাকবে না।

জনৈক নেতা আলী বলেন, খ্রিস্টানরা সাহসই পাবে না।

মূসা–কিন্তু আবদুল আযীযের সন্দেহ যুক্তিযুক্ত।

অপর এক মুজাহিদ নেতা হায়াত বললেন, আমারও তা-ই সন্দেহ হচ্ছে।

আবদুল আযীয–আজ কয়েকদিন থেকে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে... তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কয়েকজন মুজাহিদ নেতা হন্তদন্ত হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং সালাম জানিয়ে বসে পড়লেন।

মূসা তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এ-কি। তোমাদের অবস্থা এরূপ কেন? একজন বললেন আল্লাহর রহমত ছিল বলে হয়ত এভাবেও আসতে পেরেছি। মূসা বিস্মিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমরা কোত্থেকে এসেছ?

একজন জবাব দিলেন-আসুনিয়া থেকে।

মূসা-আসুনিয়ার খ্রিস্টানরা কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

ঐ ব্যক্তি-হাঁ, তারা গাদ্দারী করেছে।

মূসা-একটু বুঝিয়ে বলো, কি হয়েছে।

ঐ ব্যক্তি-ঘটনা এই যে, যেহেতু আমরা অনেক দিন ধরে সেখানে অবস্থান করছিলাম। তাই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, খ্রিস্টানরা হয়ত আর কোনরূপ গাদ্দারী করবে না। কিন্তু একদিন রাতে আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় তারা অতর্কিতে আমাদের উপর হামলা চালায়। আমাদের ঘুম ভাঙ্গার আগেই বিশজন মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।

মূসা উত্তেজিত হয়ে বললেন-বিশজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছে।

ঐ ব্যক্তি-জী হাঁ।

মূসা-তারপর কি হলো?

ঐ ব্যক্তি-আমরা ক'জন কোনমতে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে এসেছি।

আবদুল আযীয-আমি যা আশংকা করেছিলাম তা-ই হলো।

মূসা-খ্রিস্টানরা আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। আমরা আর তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না। আসুনিয়ার খ্রিস্টানদেরকে তাদের গাদ্দারীর জন্যে অবশ্যই সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

আলী-অবশ্যই।

মূসা-আবদুল আযীযকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আসুনিয়া অভিযানের নেতৃত্ব দেবে এবং তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে টলেডো ফিরে আসবে।

আবদুল আযীয-ভাল, আপনি কি এখান থেকে টলেডো যাওয়া মনস্থ করেছেন?

মূসা-হাঁ।

আবদুল আযীয--আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আসুনিয়ার খ্রিস্টানদের দেখাদেখি অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিস্টানরাও বিদ্রোহ করতে পারে।

মূসা-আমারও অনুরূপ ভয় হচ্ছে।

আবদুল আযীয-মারীটার ন্যায় যেসব দুর্গ আমরা বহু কষ্টে জয় করেছি সেগুলোর নিরাপত্তার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

মূসা-তুমি ঠিকই বলেছ। এর জন্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

আলী-প্রত্যেক দুর্গে আরো বেশী পরিমাণ সৈন্য রাখা উচিত, যাতে খ্রিস্টানরা বিদ্রোহের সাহসই করতে না পারে।

আবদুল আযীয–তাতে তো আমাদের সৈন্যসংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যাবে এবং আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব।

মূসা-তা সম্পূর্ণ ঠিক।

আলী–তাহলে আমরা কি করব?

আবদুল আযীয–এমন কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে আমাদের বেশি সৈন্যও রেখে যেতে না হয় এবং বিদ্রোহেরও আশংকা না থাকে।

আলী–তাহলে খ্রিস্টানদেরকে গির্জায় নিয়ে শপথ করাতে হবে।

মূসা-তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ তাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস করা যায় না।

আবদুল আযীয–আমার একটি কৌশল মনে এসেছে।

মূসা–কী সেটি?

আবদুল আযীয–প্রত্যেক বিজিত শহর বা দুর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেব এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে, যদি কোন দুর্গ বা শহরের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে, তবে তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হবে এবং সেই সকল অঞ্চল জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

মূসা আনন্দিত হয়ে বললেন, তোমার কৌশলটি খুবই উপযোগী

আলী–খুবই উত্তম কৌশল। এর চাইতে উপযোগী কৌশল আর কোনটিই হতে পারে না।

আবদুল আযীয–প্রত্যেক স্তরের একজন একজন করে প্রতিনিধি যামিন হিসেবে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেব।

মূসা–এর উদ্দেশ্য কি?

আবদুল আযীয–এর ফলে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ ছাড়া পাদ্রীরাও যামিন হিসেবে আমাদের সঙ্গে থাকবে।

মূসা–ঠিক আছে, তাই হবে।

আবদুল আযীয–এই মারীটা থেকে আমরা কাকে কাকে সঙ্গে নেব?

মূসা–যারা আমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে সকল স্তরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদেরকে সঙ্গে নিলেই চলবে।

আবদুল আযীয–তা-ই ঠিক, কিন্তু....

মূসা–কিন্তু কিসের?

আবদুল আযীয–তাদের ছাড়া আরো একজন ব্যক্তিত্ব রয়েছে।

মূসা–সে কে?

আবদুল আযীয–রডারিকের স্ত্রী নাঈলা।

মূসা-ও হাঁ, ঠিক বলেছ। তার কথা আমার একদম মনে ছিল না। তাকে অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে।

আবদুল আযীয-আপনার কি সেই স্বপ্নের কথা মনে আছে, যা আমি কায়রোয় দেখেছিলাম?

মূসা-আমার তো মনে পড়ছে না।

আবদুল আযীয-আমি যে সবুজাভ ধ্বংসস্তূপে একটি বিরাটকায় প্রস্তরমূর্তি দেখেছিলাম?

মূসা-হাঁ, আমার মনে পড়েছে।

আবদুল আযীয-সে স্থানটি ছিল এটাই।

মূসা বিস্মিত হয়ে আবদুল আযীযের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেটি এখানেই?

আবদুল আযীয-হাঁ, এখানেই। আমি সেই প্রতিমা ও স্থানটি দেখেছি। মূসা মুচকি হেসে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই হার পরিহিতা স্ত্রীলোকটিও?

আবদুল আযীয-তাকেও সেখানে দেখেছি।

মূসা-সে স্ত্রীলোকটি কে?

আবদুল আযীয-সে নাঈলা।

মূসা-তার সঙ্গে তোমার কোন কথা হয়েছে?

আবদুল আযীয-হাঁ, হয়েছে।

মূসা-আমাদের সঙ্গে যাওয়ায় সে অপমান বোধ করবে না তো?

আবদুল আযীয-সে নিজেই আমাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে।

মূসা-তাহলে তুমি প্রস্তুত হও। দু'হাজার মুজাহিদ তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

আবদুল আযীয-তাহলে আজকেই আমি রওয়ানা হয়ে পড়ি।

মূসা-আজ নয়, আগামীকাল। আমিও টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

আবদুল আযীয-তাহলে তা-ই হবে।

মূসা তৎক্ষণাৎই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আগত লোকদেরকে ডেকে পাঠান। তারা আসলে তিনি বললেন, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, আসুনিয়ার খ্রিস্টানরা সন্ধি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং বিশজন নিরপরাধ মুজাহিদকে হত্যা করেছে। ফলে আমরা সকল খ্রিস্টানের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। আমরা আগামীকালই টলেডো যাত্রা করব। আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, প্রত্যেক দুর্গ থেকে নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। তারা আমাদের কাছে যামিন হিসেবে থাকবে। যদি কোন দুর্গের লোকেরা সন্ধি ভঙ্গ করে তবে সেই দুর্গের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হবে। তারা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মূসার কথা শ্রবণ করেন। অতঃপর তারা বলল, এক স্থানে নির্বোধ খ্রিস্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সকলকে অত্যন্ত বিপদে ফেলে দিয়েছে। আমরা একথা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, আপনার মত ন্যায়বান শাসক

আমাদের মধ্যেও কেউ ছিল না; অতএব আপনার উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনি যামিন হিসেবে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে নিতে পারেন।

মূসা–আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তোমরা সকলে এবং রডারিকের স্ত্রী নাঈলা আমাদের সঙ্গে যাবে।

একজন খ্রিস্টান–তা-ই ভাল।

মূসা–আমরা আগামীকালই যাত্রা করব। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। তোমাদের সব কিছুর দায়-দায়িত্ব এখন আমাদের উপর।

ঐ খ্রিস্টান–খুবই ভাল কথা।

খ্রিস্টানরা সেখান থেকে চলে গেল। পরের দিন সকলেই তৈরি হয়ে একত্রে এসে জড়ো হলো। নাঈলাও এসে উপস্থিত হলেন। মূসা সকলকে নিয়ে টলেডো যাত্রা করলেন।

অপরদিকে আবদুল আযীয দু'হাজার মুজাহিদ নিয়ে আসুনিয়া যাত্রা করলেন।

ছাব্বিশ

মহান বিজয়ীর অপসারণ

মূসার দূত ইতিমধ্যে তারিকের কাছে পৌঁছে গেল। তিনি সকল মুজাহিদকে আমীরের নির্দেশ পাঠ করে শোনান। তারিক বাধ্য হয়ে আর অগ্রসর না হয়ে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি রাহীলের পিতাকে জানিয়ে দেন যে, তার কন্যা মুসলমানদের হিফাজতে রয়েছে। এখন তার দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সে যদি কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় তবে যেন শীঘ্রই এসে সাক্ষাৎ করে। তারিক জানতে পেরেছিলেন, মুগীছ আর-রূমী কর্ডোভা ও এর পার্শ্ববর্তী দুর্গগুলো জয় করে টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি এও শুনেছিলেন যে, মূসা সেভিলের সমগ্র অঞ্চল জয় করে ফেলেছেন। তিনিও জিহাদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ায় আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু মূসার নির্দেশের কথা মনে করে তিনি অনেক কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেন। কয়েকদিন পরই মুগীছ আর-রূমী সেখানে ফিরে আসেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, সারা দেশের খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এখন যে দিকেই এগোনো যাবে, সে অঞ্চলই মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করবে। এভাবে সমগ্র স্পেনেই মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর এই পরামর্শের ভিত্তিতে তারিক সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং কিল্‌আ, কিস্‌তা ইত্যাদি অঞ্চল জয় করে একটি পাহাড়ী নদীর নিকটবর্তী হন। খ্রিস্টানরা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মুসলমানরা যেদিকেই যেতো খ্রিস্টানরা সে অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতো। তারিক সে নদীটি অতিক্রম করে পর্বতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। এই পর্বতশ্রেণী ফ্রান্স পর্বতের দক্ষিণ থেকে স্পেনের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি এই পবর্তমালা অতিক্রম করে ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে খাজা শহরে উপনীত হন।

সম্মুখবর্তী পথ ছিল খুবই দুর্গম। তদুপরি মূসার টলেডো আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে তারিক টলেডো ফিরে আসেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। এর কয়েকদিনের মধ্যেই মূসার আগমন–বার্তা শোনা গেল। তারিক কয়েকজন নেতা ও কিছু সৈন্য নিয়ে মূসাকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্যে যাত্রা করেন; পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ শহর তালাওয়ার নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। তারিক মূসার চেহারা দেখেই অনুধাবন

করেন, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অসন্তুষ্টির কারণও তাঁর জানা ছিল; কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁদের কোন কথা হলো না। বরং উভয়েই একে অপরকে নিজ নিজ বিজয়ের কাহিনী শোনান। তারিক মূসার, মূসা তারিকের গুণকীর্তন করেন। অতঃপর তাঁরা সবাই টলেডো চলে আসেন। তারিক সেখানে পৌঁছে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন জিনিস-পত্রের বর্ণনা দেন এবং সেখানে যেসব বিরল জিনিসপত্র তাঁর হস্তগত হয়েছিল, সেগুলো মূসার সামনে উপস্থিত করেন। এ প্রসঙ্গে হীরা-মুক্তা খচিত একটি সিংহাসন তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়।

সে আসনটিতে বড় বড় মণি-মুক্তা যুক্ত ছিল। মূসা সেগুলো দেখে তারিকের বীরত্বের প্রশংসা করেন; কিন্তু তিনি এও বলেন যে, আমি এজন্য আনন্দিত যে, তুমি তোমার বীরত্ব দ্বারা সকল খ্রিস্টানদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছ; তবে তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে মুসলমানদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সামনে অগ্রসর হয়েছ।

তারিক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই আমার ভুল হয়েছে হুযুর। আমি তো আপনারই অনুগত একজন গোলাম এবং........

মূসা তাঁর কথার ছেদ টেনে বললেন, এখন আর তুমি গোলাম নও, স্বাধীন, বরং একটি প্রদেশের গভর্নর।

তারিক–তা হয়ত ঠিক। তবে আমি যখন আমার দেশ থেকে এসেছিলাম তখন একজন গোলাম–ই ছিলাম। এখন আপনার অনুগ্রহে আমি এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছি।

মূসা–না, বরং একান্ত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তোমার নিজ যোগ্যতার জন্য তুমি এই মর্যাদায় সমাসীন হয়েছ।

তারিক–তা হয়ত ঠিক, কিন্তু আমি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, কেননা আপনিই আমাকে আযাদ করেছেন এবং আপনার বদৌলতেই আমি আজ এই মর্যাদায় পৌঁছতে পেরেছি।

মূসা–এতে সন্দেহ নেই যে, তুমি গোলাম ছিলে; কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তুমি আমার ও অন্য মুসলমানদের ভাইরূপে পরিগণিত হয়েছ। আমি যা কিছু করেছি, তা একজন মুসলমান হিসেবেই করেছি।

তারিক–নিশ্চয়ই, আমি এ জন্যে চিরকৃতজ্ঞ।

মূসা–আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। তাতে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন প্রয়োজন নেই।

তারিক–তা আপনার সততা ও উদারতা।

মূসা–আমি যখন তোমাকে এই অভিযানে প্রেরণ করেছিলাম, তখন তোমার উপর বার হাজার সৈন্যের ভাগ্য ন্যস্ত করেছিলাম।

তারিক-জী, হাঁ।

মূসা-তোমার একটু পদস্খলন হলে সকল সৈন্য অত্যন্ত বিপদে পতিত হতো।

তারিক-নিশ্চয়ই, এ ব্যাপারে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম। তদুপরি আল্লাহ্‌র রহমতে মুসলিম মুজাহিদদের কোনরূপ অসুবিধা হয়নি।

মূসা-তা হয়ত ঠিক, কিন্তু বিপদের সমূহ আশংকা ছিল।

তারিক-অনুরূপ আশংকা থাকলে আমি হয়ত সামনে এগুতাম না।

মূসা-না, তুমি সেদিকে লক্ষ্য করনি। জিহাদী উদ্দীপনা ও বিজয় উল্লাসে তুমি সে-সবকে পাশ কেটে গেছ।

তারিক-তা ঠিক নয় হুযুর।

মূসা-তাহলে-

তারিক-খ্রিস্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে মুসলমানদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই আমি মনে করেছিলাম, যতটা সম্ভব এ সুযোগে সামনে এগিয়ে দেশ জয় করে ফেলবো। আর এটাই সহজতর ছিল।

মূসা-কিন্তু আমি তো তোমাদের বিপদের সম্ভাবনায় তোমাকে আর সামনে যেতে নিষেধ করেছিলাম।

মুগীছ আর-রূমী-হুযুর, অবস্থা এই ছিল যে, ক্রমাগত বিজয়লাভের ফলে খ্রিস্টানদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, সে সময় সামনে না এগুলে হয়ত সে ভয় দূর হয়ে যেতো, নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তারা হয়ত মুসলমানদের মুকাবিলার চেষ্টা করত। তাতে বরং অধিকতর বিপদের আশংকা ছিল।

মূসা-আল্লাহ্ না করুক, মুসলমানরা যদি এতে পরাজিত হতো, তাহলে?

মুগীছ-তাহলে আমরা সকলেই এ জন্য দায়ী হতাম।

মূসা-কিন্তু সেনাপতি তো ছিল তারিক।

মুগীছ-তা অবশ্যই, তবে তিনি নিজের একক মতে কিছুই করেননি।

মূসা-তা হলে?

মুগীছ-তিনি যা করেছেন, সবই সকলের পরামর্শের ভিত্তিতেই করেছেন।

মূসা-সকলের পরামর্শ কি ছিল?

মুগীছ-অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা।

মূসা-সে পরামর্শ কি সঠিক ছিল?

মুগীছ-আমরা যে ফল পেয়েছি, তাতে তো তাই মনে হয় যে, পরামর্শ সঠিক ছিল।

মূসা-আমি আবার বলছি যে, পরাজিত হলে মুজাহিদদের কি অবস্থা হতো।

মুগীছ-খুবই ভয়াবহ।

মূসা-তার জন্যে কে দায়ী হতো?

মুগীছ-আমরা সকলেই, যারা পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

মূসা–না, তারিক যেহেতু এই অভিযানের নেতা, সুতরাং তাঁকেই জবাবদিহি করতে হতো

মুগীছ–তা হয়ত ঠিক, কিন্তু তিনি যা করেছেন, সব আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করেছেন।

মূসা–আমি তা স্বীকার করছি। তবে আমার এও ভাল করে জানা আছে সে একজন আত্মহারা, আবেগময়ী বীর যুবক সে তাঁর বীরত্ব ও আবেগের বশবর্তী হয়ে বার হাজার মুসলিম সৈন্যকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল।

মুগীছ–কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা তো বিপদ কাটিয়ে উঠেছি।

মূসা–হাঁ, এটা আল্লাহ্‌র একান্ত রহমতই বলতে হবে, কিন্তু তারিক যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, তাতে বুঝা যায় যে, সে সেনাপতির দায়িত্বের উপযুক্ত নয়।

সেখানে সকল মুসলিম নেতা উপস্থিত ছিলেন। মূসার কথাবার্তা দ্বারা তারা বুঝতে পারেন যে, তিনি তারিককে অপসারণ করতে চাচ্ছেন। অতঃপর আলী বললেন–আমি তো মনে করি যে, তারিক কোন অদূরদর্শিতার পরিচয় দেননি।

হায়াত–আমারও তা-ই ধারণা। কারণ তারিক সে সময় অগ্রযাত্রা অব্যাহত না রাখলে হয়ত খ্রিস্টানরা পাল্টা আক্রমণ করত।

মূসা–এই সবই আমি স্বীকার করি। তবে একথা তোমাদের মানতেই হবে যে, তারিক আমার নির্দেশের অনুসরণ করেনি।

মুগীছ–তা হয়ত ঠিক, তবে সে সময়ের অবস্থাই এরূপ ছিল।

মূসা–সে যাই হোক, আমি তারিককে বরখাস্ত করছি।

তারিক–আচ্ছা। তা-ই হোক, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই; আমি হযরত খালিদের ন্যায় একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবেই জিহাদ করতে চাই।[১]

মূসা–আমি তোমাকে কয়েদখানায় পাঠাচ্ছি। তুমি কয়েদীর শাস্তি ভোগ করবে।

তারিক–তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ একজন মুসলমান হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে, যা কিছু হয়, সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। হয়ত আল্লাহ্‌র কাছে আমি কোন অন্যায় করেছি, তাই তিনি আমাকে জেলখানায় পাঠাচ্ছেন, অথবা কোনরূপ পরীক্ষায় ফেলেছেন।

মুগীছ–একজন বীরযোদ্ধার মনে এভাবে আঘাত দেয়া হয়ত উচিত হবে না।

তারিক–মুচকি হেসে বললেন–না, তাতে আমি কোন দুঃখ পাচ্ছি না। আমার মনে হয় সম্মানিত আমীর কোন ভাল উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

---

১. মহাবীর খালিদকে হযরত আবূ বকর (রা) সিরিয়া অভিযানের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) খলীফা হয়ে মনে করেন যে, খালিদ অত্যন্ত যৌবনদীপ্ত। এইজন্য তিনি তাঁকে পদচ্যুত করেছিলেন। খালিদ তাতে কোনরূপ ক্ষুণ্ন হননি বরং তিনি মুচকি হেসে বললেন, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, তিনি আমার কাঁধের বোঝা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে জিহাদ করেন। –লেখক

মূসা–অবশ্য তারিকের সঙ্গে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।

তারিক–আমি তা ভাল করেই জানি।

মূসা–আমি খলীফার কাছে তোমার সমস্ত ঘটনা লিখে চিঠি দিচ্ছি। সেখান থেকে জবাব আসলেই তদনুসারে আমি তা পালন করব।

সেই সময়ই কয়েকজন সৈন্যের প্রহরায় তারিককে কয়েদকখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। মূসা সমস্ত ঘটনা খলীফাকে লিখে পাঠালেন। এই ঘটনা দ্বারা খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা মূসাকে সঙ্কীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা লিখেছেন, মূসা তারিকের বিজয়ে হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে পদচ্যুত করেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ তিনি এরূপ হিংসাপরায়ণ হলে তারিককে সেনাপতি মনোনীত করতেন না। তাছাড়া তাঁর মনে আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, কোন কারণে মুসলমানরা পরাজিত হলে এর ফল হতো অত্যন্ত ভয়াবহ। তাছাড়া তাঁর অনুসরণে আমীরের নির্দেশ অমান্য করতে অন্যরাও হয়ত প্রয়াস পেতো। সে কারণেই মূসা হয়ত তারিককে পদচ্যুত করেছিলেন।

সাতাইশ

বিদ্রোহের শাস্তি

আবদুল আযীয দু'হাজার মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে আসুনিয়া যাত্রা করেছিলেন। আসুনিয়ার খ্রিস্টানরা ঘুমন্ত মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বিশজন মুজাহিদকে শহীদ করেছিল। তাতে আবদুল আযীয অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আসুনিয়ার খ্রিস্টানরাও বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলমানরা বসে থাকবে না। তারা অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে।

খ্রিস্টানরা দুর্গপ্রাচীর পুনঃ মেরামত করে। তারা প্রাচীরের উপর চৌকিগুলোতে অধিক সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে। দুর্গের সবগুলো দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল; কিন্তু প্রস্তুতি শেষ হতে না হতেই একদিন আসরের সময় তারা মুসলমানদেরকে দুর্গের দিকে আসতে দেখতে পেলো। দূর থেকেই ইসলামী পতাকা তাদের আগমন-বার্তা ঘোষণা করছিল। খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে দেখার জন্যে প্রাচীরের উপর উঠে এলো; তারা যখন দেখতে পেলো যে, মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল; তাদের সাহস আরও বেড়ে গেলো।

খ্রিস্টান সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সুতরাং তারা ধরে নিল যে, অতি সহজেই তারা মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। দুর্গের অনতিদূরে মুসলিম মুজাহিদরা তাঁবু ফেললেন। রাত হয়ে আসায় সেদিন আর যুদ্ধ হলো না। মুজাহিদরা সারা রাত ধরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ভোর হলে ফজরের নামায আদায় করে প্রাচীরের কাছাকাছি গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। খ্রিস্টানরা প্রাচীরের উপর থেকে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। তারা পরিকল্পনা নেয় যে, মুসলমানরা প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেই তারা তীর নিক্ষেপ করবে এবং পাথর ছুঁড়ে তাঁদের গতিরোধ করবে।

আবদুল আযীয ঘোড়ায় চড়ে মুজাহিদদের সারির মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়ান এবং উচ্চস্বরে বলেন, মুসলিম ভাইসব, খ্রিস্টানদের মনে অহমিকা রয়েছে যে, তারা সংখ্যায় অনেক এবং তাদের দুর্গটি অত্যন্ত মজবুত। তারা মনে করছে, আমরা দুর্গের কাছেও যেতে পারব না। তারা জানে না মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করে।

খ্রিস্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশজন মুসলমানকে শহীদ করেছে। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হবো না, যতক্ষণ না এর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাই আমি চাই, আজকেই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাক। আজকেই দুর্গের উপর ইসলামের পতাকা স্থাপিত হোক।

তোমরা সকলেই উপরে উঠার সিঁড়িসহ প্রাচীর ভাঙ্গার সকল যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে নাও এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে হামলা চালাও। মুজাহিদরা আগেই সকল সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলেন। আবদুল আযীযের কথায় তাঁরা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আবদুল আযীয জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোললেন। মুজাহিদরাও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি দিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন। মুসলমানদের এগুতে দেখে খ্রিস্টানরা তাদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা তীর-ধনুক এবং প্রস্তর টুকরা নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। দু'হাজার মুজাহিদ বন্যার বেগে এগুতে লাগলেন। প্রাচীরের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিস্টানরা তীর ছুঁড়তে থাকে। একই সঙ্গে প্রবলভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে।

মুসলমানরা আগে থেকেই এ সবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা ঢাল দিয়ে আড়াল করে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। খ্রিস্টানরা বিকট চিৎকারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানরা এসবের কোনরূপ পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তা দেখে খ্রিস্টানরা আরো বেশি করে প্রস্তর ও তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। এতে কিছু কিছু মুজাহিদ আহত হলেন; কিন্তু কোনমতেই পিছপা হলেন না। আহত সিংহ যেমন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানরাও আহত হয়ে আরো ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া হয়ে সামনে এগুতে লাগলেন। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকে এগুতে দেখে খ্রিস্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলো এবং বিহবল হয়ে পড়ল।

মুসলমানরা এগুতে এগুতে এক সময় প্রাচীরের নিকটে চলে গেলেন এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কেউ সিঁড়ি লাগাতে লাগলেন, আবার কেউ প্রাচীর ভাঙ্গতে শুরু করলেন। খ্রিস্টানরা প্রাচীরের উপর থাকায় নিচের সঠিক অবস্থা দেখতে পেলো না; কিন্তু হাতুড়ির আওয়াজ শুনে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলমানরা প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করছে।

আল্লাহ তা'আলা কারো উপর অসন্তুষ্ট হলে তার বুদ্ধিও তিনি লোপ করে দেন। খ্রিস্টানদের অবস্থাও ছিল তা-ই। হাতুড়ির শব্দ শুনে অফিসাররা বেশির ভাগ সৈন্য প্রাচীরের উপর থেকে নিচে দুর্গে পাঠিয়ে দেয়। নিচে এসে তারা অপেক্ষা করতে থাকে; প্রাচীর ভেঙ্গে মুসলমানরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আক্রমণ করবে। তারা ধারণাও করেনি যে, মুসলমানরা সিঁড়ি দিয়ে প্রাচীরে উঠতে পারবে। ফল এই দাঁড়ালো, মুসলমানরা সিঁড়ি দিয়ে অতি দ্রুত উপরে উঠতে থাকেন। প্রাচীরটি ছিল প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। ফলে মুসলমানরা মুখে তলোয়ার গুঁজে এক হাতে ঢাল

ধরে অপর হাতে অতিকষ্টে উপরে উঠে গেলেন। মুসলমানরা ভেবেছিলেন যে, খ্রিস্টানরা হয়ত তলোয়ার নিয়ে প্রাচীরের উপর বসে আছে। তাই তারা মাথায় ঢাল নিয়ে এগুচ্ছিলেন; কিন্তু খ্রিস্টানরা অসতর্কভাবে অন্যমনস্ক থাকায় মুসলমানরা সহজেই উপরে উঠতে সক্ষম হলেন।

মুসলমানরা প্রাচীরের উপর উঠেই দ্রুত উপরস্থ খ্রিস্টানদের ধাওয়া করেন। খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে প্রাচীরের উপর দেখামাত্রই জ্বিন এসে গেছে, জ্বিন এসে গেছে বলে চিৎকার করে দৌড়াতে লাগল।

খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে জ্বিন বলে মনে করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, মুসলমানরা যখন যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যেতে পারে। অতএব, তারা যখন মুজাহিদদেরকে প্রাচীরের উপর দেখতে পেলো, তখন তাদের এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হলো যে, মুসলমানরা জ্বিন বলেই সিঁড়ি ছাড়া উপরে উঠে এসেছে। মূলত এটা ছিল তাদের নির্বুদ্ধিতা। তারা যদি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করতো, তাহলে মুসলমানরা যাতে সিঁড়ি বা অন্য কিছুর সাহায্যে উপরে উঠে আসতে না পারে সেজন্য কিছু সৈন্যকে প্রাচীরে উপর সতর্ক রাখতো। কিন্তু তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি; ফলে মুসলমানরা অতি সহজে উপরে উঠে গেলেন।

মুসলমানরা প্রাচীরের উপর উঠে দৌড়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ চালান। তারা এত ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালিয়েছিলেন যে, খ্রিস্টানরা পাল্টা প্রতিরোধের কোন সুযোগই পেল না। অনেক খ্রিস্টান মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। খ্রিস্টানরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। তারা ঘাবড়ে গিয়ে অনেকে প্রাচীরের উপর থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে লাগল। এভাবে অনেক খ্রিস্টান আহত হলো।

প্রাচীরের উপর খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তাই মুসলমানরা অতি সহজেই তাদেরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। সিঁড়ির সংখ্যা খুব কম থাকায় তখনো যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান উপরে উঠতে পারেনি; কিন্তু যারা উপরে উঠে গিয়েছিল, তারা এতই ক্ষিপ্ত ছিল যে, প্রাচীরের উপরের খ্রিস্টানদেরকে হত্যা করে দুর্গের ভেতর নামতে শুরু করল।

দুর্গের ভেতরের খ্রিস্টানরাও প্রাচীরের উপরের হৈ চৈ শুনতে পেয়েছিল। তাছাড়া অনেককে উপর থেকে নিচে পড়ে মরতেও তারা দেখতে পেলো। ফলে তারাও অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে ঘোড়ার লাগামের সাহায্যে নিচে নামতে লাগল। খ্রিস্টানরা দেখামাত্রই তাদের দিকে দৌড়াল এবং তাদের পথ রোধ করার চেষ্টা করল; কিন্তু মুসলমানরা জিহাদী প্রেরণায় এতই উদ্দীপ্ত ছিল যে, খ্রিস্টানদেরকে আসতে দেখলেই সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। দুর্গের অভ্যন্তরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। উভয় পক্ষ একে অপরের উপর হামলা চালাল। তলোয়ারের দ্রুত উঠানামা দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুৎ

চমকাচ্ছে। চারদিকে রক্তের বন্যা বইতে লাগল। খ্রিস্টানরা হৈ চৈ করে সারা দুর্গ তোলপাড় করে তুলেছিল।

যারা আহত হলো, তাদের চিৎকার ধ্বনি চারদিকে মথিত করে তুলেছিল। কিন্তু মুসলমানরা ছিল সম্পূর্ণ নীরব। তারা শুধু দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। তাদের প্রতিটি তলোয়ার যেন জমদূতে পরিণত হয়েছিল। যারাই তাদের তলোয়ারের নাগালে আসতো মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকতো না।

খ্রিস্টানরাও প্রবল বেগে হামলা চালাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল মুসলমানদেরকে হয় হত্যা করে কমাবে নতুবা দুর্গ থেকে বের করে দেবে। কিন্তু মুসলমানদের তলোয়ার ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। খ্রিস্টানদেরকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিত। এদিকে বীরবিক্রমে মুসলিম মুজাহিদরা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ক্রমাগত আসতেই লাগল। তাদের লক্ষ্য ছিল দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দুর্গের দ্বার খুলে দেয়া। এজন্য তাঁরা এত তীব্রভাবে আঘাত হানছিল যে, খ্রিস্টানদের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নানাদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে লাগল; কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে খ্রিস্টানরা তখন পর্যন্ত এই ধারণায় ছিল যে, তারা মুসলমানদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে আবদুল আযীযও ভেতরে এসে গেছেন। তাঁর আগমনে মুজাহিদরা আরো মরণপণ আক্রমণ চালালেন এবং খ্রিস্টানদের সারির পর সারি খতম করতে লাগলেন।

যারাই মুসলমানদের সামনে আসতো, তারাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। এভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকটা ভীতি ও হতাশার সঞ্চার হলো। মুসলমানরা এ সুযোগে আরো জোরে হামলা চালালেন। ফলে খ্রিস্টানরা পেছনে হটে গেল। অতঃপর ৫০ জন মুসলমান দুর্গের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

খ্রিস্টানরা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু মুজাহিদরা সকল বাধা অতিক্রম করে দরজার নিকটে পৌছান। দ্বাররক্ষীরা তাদের বাধা দেয়ার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুসলমানরা দুর্গের দ্বার খুলে দেন।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বন্যার বেগে মুসলিম মুজাহিদরা দুর্গে প্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দুর্গের অভ্যন্তরে, আনাচে-কানাচে যুদ্ধ চলতে থাকে। খ্রিস্টানদের সংখ্যা বহু থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে প্রতিরোধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে। বাকীরাও অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। তারা অস্ত্র ত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

আবদুল আযীয বিদ্রোহীদের নেতাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং কয়েদীদেরকে জিযিয়ার বিনিময়ে ছেড়ে দেন। দুর্গের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিম্মি হিসেবে নিজের সঙ্গে নিয়ে নেন। তিনি সেখানে দু'দিন অবস্থান করেন। তৃতীয় দিন দু'শ মুজাহিদকে দুর্গে রেখে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আটাইশ

স্পেনের শাসক

সকল মুসলমান ও খ্রিস্টানরা তারিককেই স্পেন বিজয়ী মনে করতো। তারিক জাহাজে অবস্থানকালে এক রাতে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মুসলমানরা সবাই তা জানতো। সে স্বপ্নে তারিক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হুযুর তাঁকে স্পেন বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন। তাছাড়া তারিককে স্পেন বিজয়ী মনে করার আরো কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত তিনি একজন সৎচরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি একজন সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তৃতীয়ত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। চতুর্থত তিনি স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল জয় করে ফেলেছিলেন। এই জন্য সকল মুসলমান তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতো, সম্মান করতো। তাঁকে কয়েদ করায় সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হন। অপরদিকে মূসাকেও তারা অহিংস, অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি মনে করতো। তাই তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তারিককে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কয়েদ করেননি; বরং কোন কল্যাণকর লক্ষ্যেই তাঁকে কয়েদ করেছেন। এইজন্য সকলেই এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন। এ ব্যাপারে সর্বাধিক ব্যথিত হন রাহীল। তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেন। কিভাবে তারিককে মুক্ত করবেন, তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। একদিন তিনি তারিকের কয়েদখানায় গিয়ে উপস্থিত হন। কয়েদখানায় যেতে কারো কোন বাধা ছিল না। তাই রাহীলকেও কেউ বাধা দেয়নি।

তিনি গিয়ে দেখেন, যিনি ছিলেন স্পেন বিজয়ের নেতা, যার নামে সমগ্র স্পেনের খ্রিস্টানরা কেঁপে উঠত, যার তলোয়ারের ভয়ে সমগ্র স্পেনবাসীদের মধ্যে এক প্রকার ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মহান নেতা একটি চাটাইয়ের উপর অবনত মস্তকে বসে আছেন।

কয়েদখানায় প্রবেশ করেই উভয়ে উভয়ের দিকে অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘক্ষণ পর রাহীল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন এবং আফসোসের সুরে বললেন, সিংহ-হৃদয় বিজেতা.............

দুঃখ ব্যথায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে এলো, তার মুখ থেকে আর কোন কথা বেরোল না।

তারিক বললেন, মাধবী কন্যা, তুমি এই দুঃখ ব্যথায় আমার কাছে এলে কেন?

রাহীল–আপনাকে দেখতে এলাম।

তারিক–এ সমবেদনার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

রাহীল–আপনাকে বিনা কারণে মূসা এই কয়েদখানায় পাঠালো, এটাই আমার দুঃখ।

তারিক–এতে মূসার কোন দোষ নেই।

রাহীল–তাহলে কার দোষ?

তারিক–আমার ভাগ্যের।

রাহীল–আমার তো ধারণা, মূসা আপনার খ্যাতির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আপনাকে অপমান করেছে।

তারিক–না, এটা ঠিক নয়। আমার বিশ্বাস, হয়ত কোথাও আমার ভুল হয়েছে অথবা কোনরূপ অহংকার প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই শাস্তি দিচ্ছেন।

রাহীল–আপনার প্রতি মূসার কোন হিংসা নেই?

তারিক–নিশ্চয়ই না, একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানের প্রতি কখনো হিংসা পোষণ করতে পারে না।

রাহীল–আপনি কি জানেন, মুসলমানরা আপনার কল্যাণকামী?

তারিক–নিশ্চয়ই জানি।

রাহীল–আপনি চাইলে তারা আপনাকে মুক্ত করে দিতে পারে।

তারিক–না–না, তা হতে পারে না।

রাহীল–কেন?

তারিক–কোন মুসলমান কখনো তার আমীরের নির্দেশ অমান্য করতে পারে না।

রাহীল–তাহলে এটা ঠিক যে, আপনার প্রতি তাদের কোনরূপ সমবেদনা নেই।

তারিক–এটাও ঠিক নয়।

রাহীল–তা হলে আপনি মুক্তি পেতে চান না?

তারিক–নিশ্চয়ই চাই।

রাহীল–তা হলে আমি জেলরক্ষীদেরকে তোষামোদ করি, হয়ত তারা আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজী হবে। তারপর আমরা এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যেখানে দুনিয়ার কোন মানুষই আমাদের খোঁজ পাবে না।

তারিক–আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কিন্তু আমি এরূপ মুক্তির প্রত্যাশী নই।

রাহীল–তা হলে কিরূপে চাও?

তারিক–আমীর নিজে যখন আমাকে ছেড়ে দেবে।

রাহীল–আমার ধারণা, তিনি কখনো আপনাকে মুক্তি দেবেন না।

তারিক–আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই তিনি আমাকে ছেড়ে দেবেন।

রাহীল–তাহলে আমি তাঁর কাছে আবেদন জানাবো?

তারিক–হাঁ, তা হয়ত করা যায়।

রাহীল–আপনার কি কোনরূপ কষ্ট হচ্ছে?

তারিক–না।

রাহীল–তা হলে আমি চলি?

তারিক–আল্লাহ হাফেজ।

রাহীল–আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

রাহীল সেখান থেকে চলে গেলেন। পরদিন মূসার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। মূসা জানতেন, রডারিক রাহীলকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল। মূসা এও জানতেন এই মেয়েটিই তারিককে পঁচিশ জন গথিক রাজার শিরস্ত্রাণের সন্ধান দিয়েছিল। তাছাড়া এটাও তার জানা ছিল, তারিকের প্রতি তার সহানুভূতি রয়েছে। রাহীল তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্য এসেছ এখানে?

রাহীল বললেন, তারিকের সম্পর্কে কিছু আরয করতে।

মূসা–যা কিছু বলার নির্দ্ধিধায় বলো।

রাহীল–আপনি তো জানেন, তারিক একজন সুহৃদয়বান ব্যক্তি, মুসলিম জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আপনার অত্যন্ত অনুগত।

মূসা–নিশ্চয়ই জানি।

রাহীল–আপনি তো এটাও অবগত আছেন, তারিক অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্পেন জয় করেছে।

মূসা–হাঁ, নিশ্চয়ই জানি।

রাহীল–তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব ও আনুগত্যের এই কি প্রতিদান?

মূসা–আরে মেয়ে, তাঁকে কয়েদ করার কারণ হলো, আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে আমার নির্দেশ সে অমান্য করেছে।

রাহীল–তা অবশ্য ঠিক, তবে এরও কারণ ছিল।

মূসা–তাও আমি জানি; কিন্তু তাঁর উপর বার হাজার মুসলমানের জীবনের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যদি কোন বিপদ হতো, তবে তাদের সব কিছুর দায়-দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হতো। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকে জবাবদিহি করতে হতো।

রাহীল–মুসলমানরা কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হলে তিনি তো আর এগুতেন না।

মূসা–তা অবশ্য ঠিক। তাহলে তুমি কি বলতে চাও?

রাহীল–আমার আরয, আপনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিন।

মূসা–আমি নিজেও চাচ্ছি যে, তাকে শীঘ্রই মুক্তি দিয়ে দেব।

রাহীল–সেটাই হবে আপনার মহানুভবতা।

মূসা আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। এমনি মুহূর্তে মুখে শশ্রুমণ্ডিত একজন মুসাফির এসে সালাম জানালো। সালামের জবাব দিয়ে মূসা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোত্থেকে এসেছো? আগন্তুক জবাব দিল, দামিশ্‌ক থেকে।

মূসা–তুমি কি খলীফার দরবার থেকে এসেছ?

আগন্তুক– জী হাঁ।

মূসা–কোন ফরমান নিয়ে এসেছ?

আগন্তুক–জী হাঁ, মহামান্য খলীফা নিজে এই ফরমান লিখে দিয়েছেন।

একথা বলে লোকটি জামার পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে মূসার হাতে দিলেন। মূসা চিঠিখানা নিয়ে প্রথমে চুমু খেলেন। অতঃপর খুলে পড়তে লাগলেন–

হতে,
ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক
মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা।

প্রতি,
মূসা ইব্‌ন নূসায়র
মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাচ্যদেশীয় গভর্নর।

হাম্‌দ ও ছানার পর সমাচার এই যে, স্পেন অভিযানে সফলতাদানের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জানাচ্ছি। তিনি তাঁর অশেষ কৃপায় স্পেন থেকে অন্যায়, অবিচার ও প্রতিমা পূজা দূর করে সেখানে তাওহীদের বাণী পৌঁছানোর জন্য আমাদিগকে সুযোগ করে দিয়েছেন। তারিক যা করেছে, তা কেবল জিহাদী প্রেরণায়ই করেছে। এটা তার কোনরূপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। সে একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের একজন অতীব হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁকে শীঘ্রই যথার্থ সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দাও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তাঁকে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত করলাম। তাঁকে তাঁর দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও এবং যথার্থ সম্মান দেখাও। যেসব মুজাহিদ বীরত্বের সঙ্গে জিহাদ করে এ সফলতা অর্জন করেছে, আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ তাঁদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা অটুট রাখুন এবং তাদেরকে হিফাযত করুন। সকলের প্রতি আমার সালাম রইল।

ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক
দামিশ্‌ক

মূসা চিঠিখানা পড়ে মুচকি হাসলেন। তিনি সকল নেতৃস্থানীয় মুজাহিদকে ডেকে পাঠালেন। সকলে এসে উপস্থিত হলে তারিককেও ডেকে আনালেন। অতঃপর তিনি

বললেন, মুসলিম ভাইসব। আমি তারিককে এইজন্য কয়েদ করেছিলাম যে—আমি ধারণা করেছিলাম, আবেগের বশবর্তী হয়ে তারিক যেভাবে এগুচ্ছিল তাতে হয়ত কোন অঘটন ঘটতে পারতো। মুসলমানদের খুবই ক্ষতি হতো। এ ব্যাপারে আমার কোনরূপ আক্রোশ বা হিংসা কিছুই ছিল না।

আজই খলীফার চিঠি এসেছে। আমি তা পাঠ করে শোনাচ্ছি। এই বলে তিনি খলীফার চিঠিটি পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর তারিককে বললেন, আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, আমায় ক্ষমা কর।

তারিক বললেন, আপনার ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও আমার পক্ষ থেকে মাফ করে দিচ্ছি। আল্লাহ্ও মাফ করুক। অতঃপর উভয়েই উভয়কে আলিঙ্গন করলেন। মূসা স্পেনের গভর্নর হওয়ার জন্যে তারিককে স্বাগত জানান। অন্য মুসলমানরাও তাঁকে মোবারকবাদ জানান। তারিকও সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান। সেদিন থেকে তারিক স্পেনের আমীররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঊনত্রিশ

প্রতারক খ্রিস্টান

আবদুল আযীয আসুনিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে মুজাহিদদেরকে নিয়ে টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আসুনিয়া ছিল মারশিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। আবদুল আযীয সে শহরটি অধিকার করে সামনে এগুতে লাগলেন। তিনি যে শহরেই উপনীত হতেন, সে শহরের অধিবাসীরাই তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করতো। এইভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবদুল আযীয দ্রুত টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পাহাড়ী টিলা পেরিয়ে তাদের পথ চলতে হচ্ছিল। একদিন পাহাড়ী একটি খাদ পেরোনোর সময় তিনি দেখতে পেলেন, কয়েকজন খ্রিস্টান আরোহী একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুসলমানদেরকে দেখামাত্রই তারা পালিয়ে গেল। আবদুল আযীয কয়েকজন মুজাহিদকে তাদের পিছু ধাওয়ার নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মুজাহিদ তাদের পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু বহুদূর গিয়েও তাদের কোন হদিস পাওয়া গেল না। অবশেষে মুসলমানরা ফিরে এলেন।

আবদুল আযীয বুঝতে পারলেন যে নিকটেই হয়ত কোথাও খ্রিস্টান সৈন্যরা আত্মগোপন করে রয়েছে। তিনি সকল মুজাহিদকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন।

মুজাহিদরাও অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গেলেন এবং খ্রিস্টানদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখলেন। সন্ধ্যায় একজন খ্রিস্টানের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মুজাহিদরা তাকে ধরে নিয়ে এলেন এবং আবদুল আযীযের সামনে উপস্থিত করেন। আবদুল আযীয একজন দোভাষীর সাহায্যে তার জবানবন্দী শুরু করেন।

আবদুল আযীয–তুমি কে?

খ্রিস্টান–আমি একজন খ্রিস্টান।

আবদুল আযীয–তুমি কোথায় থাক?

খ্রিস্টান–উরবোলা শহরে।

আবদুল আযীয–শহরটি এখান থেকে কতদূর?

খ্রিস্টান–নিকটেই।

আবদুল আযীয–দুর্গাধিপতির নাম কি?

খ্রিস্টান–তাদমীর।

আবদুল আযীয জানতে পেরেছিলেন যে, তারিকের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়েছিল তাদমীরের সঙ্গে এবং সে ইসমাঈলকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদমীর কি দুর্গের ভেতরে রয়েছে?

খ্রিস্টান–জী না।

আবদুল আযীয–তবে কোথায়?

খ্রিস্টান–সেই পাহাড়ের উপর।

আবদুল আযীয–সৈন্যরাও তার সঙ্গেই রয়েছে।

খ্রিস্টান–জী হাঁ।

আবদুল আযীয–সে কি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়?

খ্রিস্টান–সে সম্মুখযুদ্ধে আসতে চায় না।

আবদুল আযীয–তাহলে?

খ্রিস্টান–তার ইচ্ছা, পাহাড়ের আড়াল থেকে অতর্কিতে আপনাদের উপর হামলা চালাবে অথবা আপনাকে------------

আবদুল আযীয–অথবা আমাকে মেরে ফেলবে, তাই তো?

খ্রিস্টান–জী হাঁ।

আবদুল আযীয–তার সৈন্যসংখ্যা কত হবে?

খ্রিস্টান–তিন-চার হাজার হতে পারে।

আবদুল আযীয–তাহলে আমাদের কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে আছে।

খ্রিস্টান–ওরা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই এগুচ্ছে।

আবদুল আযীয–এসব জানানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

খ্রিস্টান–হুযুর কি আমার নিরাপত্তা দিচ্ছেন?

আবদুল আযীয–হাঁ, তোমাকে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি।

খ্রিস্টান–আমি হুযুরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আবদুল আযীয–তুমি এখন কি করতে চাও?

খ্রিস্টান–আপনারা এখন যে পথ দিয়ে যাচ্ছেন, তা অত্যন্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর।

আবদুল আযীয–কিরূপ ভয়ঙ্কর?

খ্রিস্টান–এই পথটি এতই নিচু ও ঢালু যে, এর উভয় পার্শ্বে রয়েছে উঁচু পাহাড়।

আবদুল আযীয–তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে?

খ্রিস্টান–তাদমীর নিজ সৈন্য দল নিয়ে টিলার উপর বসে আছে। সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা আপনাদেরকে পরাভূত করবে।

আবদুল আযীয–তাহলে এ ছাড়া আর কোন বিকল্প রাস্তা আছে কি?

খ্রিস্টান–জী হাঁ।

আবদুল আযীয–তুমি চিন তো?

খ্রিস্টান–নিশ্চয়ই চিনি।

আবদুল আযীয–তাহলে দয়া করে তুমি আমাদেরকে নিয়ে চলো।

খ্রিস্টান–তাহলে চলুন।

খ্রিস্টান লোকটি আগে আগে এগিয়ে চলল। মুজাহিদরা তার পেছনে পেছনে যেতে লাগল। যে পথ দিয়ে তারা যাচ্ছিল, সে পথটি অত্যন্ত কষ্টকর। তাছাড়া পথটি ছিল খুবই সংকীর্ণ ও সমতল। সে পথ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগোনো খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আবদুল আযীয ধারণা করেছিলেন যে, সামনের পথ হয়ত সমতল ও প্রশস্ত হবে; কিন্তু যতই সামনে যাচ্ছিলেন, ততই দুর্গম পথের সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

আবদুল আযীযের মনে কিছুটা সন্দেহের উদয় হলো। তিনি খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করলেন; রাস্তা তো দেখছি ক্রমেই দুর্গম ও সংকীর্ণ হচ্ছে।

খ্রিস্টান–আর একটু সামনে গেলেই আমরা প্রশস্ত রাস্তা পাব।

আবদুল আযীয–সে রাস্তা আর কত দূরে?

খ্রিস্টান–বড়জোর এক মাইল।

আবদুল আযীয–তাহলে কয়েকজন মুজাহিদ পাঠিয়ে দেখে নেই, তারপর.....

খ্রিস্টান–তাঁর কথা শেষ না হতেই বলল, তার কি প্রয়োজন।

আবদুল আযীয–তার চোখে চোখ রেখে বললেন, এজেন্যেই যে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে? খ্রিস্টান লোকটি কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। তার মুখের অবস্থা দেখে আবদুল আযীযের মনে সন্দেহ আরো গাঢ় হলো। তিনি বললেন, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমাদেরকে প্রতারণা করার জন্য এদিক নিয়ে এসেছ। শুনে রাখ, প্রকৃতপক্ষেই তুমি যদি আমাদেরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এসে থাক, তাহলে তোমার শেষ মুহূর্ত অতি নিকটে। তুমি নিজেই নিজেকে বিপদ জালে জড়াচ্ছ। খ্রিস্টান আরো ঘাবড়ে গেল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনাকে প্রতারণা করে আমি কি মৃত্যুকে ডেকে আনব? আপনি বিশ্বাস রাখুন, আমি প্রশস্ত রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছি।

আবদুল আযীয–আচ্ছা, আমি বিশ্বাস করলাম।

খ্রিস্টান–পথ দেখার জন্য কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

আবদুল আযীয–এটা আমার দায়িত্ব। আমি আমার সৈন্যদলকে আর এককদমও এগুতে দিতে পারি না।

তিনি সৈন্যদলকে থামতে নির্দেশ দেন এবং কয়েকজনকে রাস্তা দেখার জন্য পাঠিয়ে দেন। তাঁরা যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টানটি অত্যন্ত ঘাবড়ে যায় এবং পালানোর চেষ্টা করে। আবদুল আযীয আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কয়েদ করার নির্দেশ দেন। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে

দেখতে পাচ্ছে। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে সে বলল, আমাকে দয়া করুন হুযুর। আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বীকার কর যে, আমাদের সঙ্গে তুমি প্রতারণা করছ।

খ্রিস্টান–জী হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, কিন্তু কেন যে এমন করলাম!

আবদুল আযীয–কেন এমন করলে?

খ্রিস্টান–তাদমীর আমাকে লোভ দেখিয়েছিল।

আবদুল আযীয–সে তোমাকে কি বলেছিল।

খ্রিস্টান–সে বলেছিল, আমি যদি মুসলমানদেরকে প্রতারণা করে উঁচু টিলার নিচে নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাকে উরবোলা শহরের পরিদর্শক বানাবে।

আবদুল আযীয তা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি বললেন, দুর্ভাগা খ্রিস্টান, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ নিজেই মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। দুনিয়ার কোন শক্তিই মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারে না।

খ্রিস্টান এটা আমার নির্বুদ্ধিতা হুযুর। আমায় দয়া করুন হুযুর।

আবদুল আযীয তখন আর কিছু বললেন না। ইতিমধ্যে পথ দেখার জন্য যাদেরকে পাঠান হয়েছিল, তারাও ফিরে এলো। তারা জানান, পথ অত্যন্ত কষ্টকর। টিলার উপর খ্রিস্টান সৈন্যরা ঘুরাঘুরি করছে। খ্রিস্টান লোকটি বলল, আমি নিকটবর্তী একটি পথের সন্ধান জানি হুযুর। আবদুল আযীয অত্যন্ত কর্কশ সুরে বললেন, এখনো কি আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

খ্রিস্টান–আমি আর ধোঁকা দেব না হুযুর।

আবদুল আযীয–তাহলে নিয়ে চল।

খ্রিস্টান লোকটি সকলকে নিয়ে একটি পাহাড়ে উঠে এলো। পাহাড়টি যদিও খুব উঁচু ছিল, কিন্তু এর ঢালু পথ বেয়ে চলা তেমন কষ্টকর ছিল না। সেখান থেকে তাঁরা দেখতে পেলেন, অপর আর একটি টিলায় খ্রিস্টান সৈন্যরা পাথরের উপর বসে আছে।

খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে দেখা মাত্রই টিলার অপর পার্শ্বে লুকিয়ে গেল। মুসলমানরা অপর পথ বেয়ে একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে উপনীত হলেন; এমন সময় সন্ধ্যা হয়ে এল।

মুসলমানরা মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তাঁবু ফেলে রাতের খাবার তৈরি করতে লাগলেন। এশার নামায পড়ে রাতের খাবার গ্রহণ করেন। কিছুসংখ্যক মুজাহিদকে পাহারায় মোতায়েন করে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েন। এক সময় তারা কিছু শব্দ শুনতে পান। মুজাহিদরা সে শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়েন এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়েন।

ত্রিশ

অপর এক বিজয়

এই সময় সুবহে সাদেক হয়ে এসেছিল। কিন্তু দিনটি ছিল মেঘলা। আকাশে ঘন কালো মেঘ। প্রবল বেগে বাতাস বইছে। সে সময় মুজাহিদরা ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তখন তারা কিছু অশ্বের পায়ের শব্দ শুনতে পান। প্রহরীরা এসে জানালেন, খ্রিস্টান সৈন্যরা এসে গেছে; কিন্তু তাদের সংখ্যা কত বোঝা যাচ্ছে না। আবদুল আযীয বললেন, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখ, তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমে নিকটবর্তী হতে লাগল। বাতাসের গতিও কিছুটা বেড়ে গেছে। মুসলমানদের ঢিলে-ঢালা জুব্বা ও মাথার পাগড়ী বাতাসে উড়ছে। কখনো কখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এখন মুজাহিদরাও ধীরে ধীরে শব্দের দিকে এগুতে লাগলেন।

কিছুদূর এগুতে না এগুতেই খ্রিস্টান সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। সবার আগে ছিল তাদমীর। সে উচ্চস্বরে বলল, হে মুসলিমগণ! তোমরা যদি তোমাদের মঙ্গল চাও, তবে অস্ত্র ফেলে দাও। আবদুল আযীয তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন–যারা প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাদের আবার বাহাদুরী?

তাদমীর–আমার সৈন্যদলের দিকে তাকিয়ে দেখ। এই বলে সে তার বিরাট সৈন্যদলের প্রতি ইঙ্গিত করে। তার সৈন্যের সারি ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যেন দূরবর্তী পাহাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। সকল মুসলমান সে বিরাট সৈন্যদলকে দেখতে পেয়েছিলেন। আবদুল আযীয বললেন, সৈন্যের আধিক্যের উপর গর্ব করো না। তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হলো সন্ধি করা।

তাদমীর–জীবন থাকতে সন্ধি করবো না।

আবদুল আযীয–তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

তাদমীর–কার মৃত্যু আসছে, এখনই তা বুঝতে পারবে।

একথা বলেই সে পেছনে চলে গেল এবং সৈন্যদেরকে আক্রমণের নির্দেশ দিল। তাদমীরের নির্দেশে তার সৈন্যরা তলোয়ার বের করল। মুসলমানরাও তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন। শুরু হলো মরণপণ যুদ্ধ। প্রকৃতি নীরব, নির্বাক। ধীরে ধীরে

শোরগোল বাড়তে লাগল। যুদ্ধ ক্রমে উত্তপ্ত হতে লাগল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে লাগল মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তখন অনেকটা ভোর হয়ে এসেছিল। প্রত্যেকেই একে অপরকে দেখতে পেলো। খ্রিস্টানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল চার হাজারের অধিক। অপরপক্ষে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র পৌনে দুই হাজার। মুজাহিদদের সৈন্য সংখ্যা কম দেখেই তারা যুদ্ধে উৎসাহিত হয়েছিল। এইজন্য অত্যন্ত উৎসাহভরে তারা হামলা চালাচ্ছিল এবং দ্রুত তলোয়ার সঞ্চালন করছিল। মুসলমানরাও অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে হামলা চালাচ্ছিলেন। তাদের আক্রমণের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তারা যেন খ্রিস্টানদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করছে না। তারা চেষ্টা করছে, যথাশীঘ্র সম্ভব শত্রুদের নিপাত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করবে।

তাঁরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। উভয় দলের মধ্যে তখন পর্যন্ত আবেগ উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকায় তুমুল লড়াই চলছিল। তলোয়ারের আঘাতে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল, ঘোড়ার পায়ের আঘাতে সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এখন পূর্বাকাশে সূর্য উঠে গেছে। কিন্তু আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকায় তখনো কিছুটা অন্ধকার বিদ্যমান ছিল। যুদ্ধের গতি প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। একদল অন্যদলের মধ্যে ঢুকে গেছে এবং যুদ্ধও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে শুধু তলোয়ারের ঝন্‌ঝনানি শব্দ এবং দ্রুত উঠানামার দৃশ্য। খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদেরকে হত্যা করার এ এক নিদারুণ প্রয়াস। খ্রিস্টানরা এত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। জীবনকে বাজি রেখে তারা যুদ্ধ করে চলল; কিন্তু অগ্রগতি হতাশাব্যঞ্জক। মুসলমানদের সামনে তারা কিছুতেই যেন টিকতে পারছিল না।

খ্রিস্টানরা যদিও হৈ চৈ-এ অভ্যস্ত ছিল; কিন্তু আজকে ছিল সম্পূর্ণ নীরব। তবে কখনো কখনো তাদের জাতীয় শ্লোগান দিচ্ছিল। আহতরা আহাজারি করছিল এবং ভয়ঙ্কর শব্দে চিৎকার করে মৃত্যুবরণ করছিল। তাদের এই চিৎকার ধ্বনি অদূরবর্তী পাহাড়ে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হতো। সে সময় বাতাসের গতি আরো বেড়ে যায়। মনে হচ্ছিল, হয়ত কোথাও বৃষ্টিপাত হচ্ছে; কিন্তু সৈন্যদের সেসবের কোন পরোয়া নেই। তারা শুধু লড়েই চলেছে। তাদমীর পাহাড়ী খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধে নিয়ে এসেছিল। তারা ছিল অত্যন্ত সাহসী ও বিলাস-বিমুখ। তারা কেবল প্রতিরোধই করছিল না, বরং পাল্টা আক্রমণও রচনা করেছিল। যদিও বহুল পরিমাণে তারা মৃত্যুবরণ করছিল, কিন্তু অনেক মুসলমানও শাহাদত বরণ করেছিলেন। মুসলমানরা মনে করেছিলেন যে, সাধারণ খ্রিস্টানদের ন্যায় তাদেরকেও সহজেই পরাজিত করা যাবে; কিন্তু সাহসিকতা দেখে মনে হলো যে, তাদেরকে পরাজিত করা সহজসাধ্য নয়। তাই তাঁরা অত্যন্ত বীরবিক্রমে হামলা চালালেন; কিন্তু খ্রিস্টানরাও একই গতিতে যুদ্ধ করছিল। আবদুল আযীয এক হাতে ঢাল, অপর হাতে তলোয়ার এবং বাহুতে পতাকা গুঁজে বীরবিক্রমে

যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যেদিকে ধাবিত হতেন, সে দিকে মৃতদেহের স্তূপ পড়ে যেতো। যে সারিতে প্রবেশ করতেন তা সাফ করে ফেলতেন। তাঁর তলোয়ার ছিল অত্যন্ত ধারালো ও বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন। যে ঢালের উপর আঘাত হানতো তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিতেন, যে বর্শায় আঘাত করতেন, তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতেন। যেন এক বিদ্যুৎসম মৃত্যু দানব যেদিকেই যায় তাঁর সংহার ক্রিয়া সেদিকই পরিচ্ছন্ন করে দেয়।

আবদুল আযীযের ধারণা ছিল, সকল মুসলমানই তাঁর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ করছে; কিন্তু তিনি যখন দেখলেন মুসলমানরা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে, তখন সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিম ভাইসব! একি ভীরুতা যে, তোমরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছ না, তোমরা কেন যুদ্ধকে দীর্ঘতর করছ? এগিয়ে যাও, বীরবিক্রমে যুদ্ধ কর, শত্রুদের খতম কর। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে নব উদ্দীপনায় হামলা চালালেন। অন্য মুজাহিদরাও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ চালান। এ আক্রমণে দেখা গেল, প্রত্যেক মুজাহিদ কমপক্ষে একজন খ্রিস্টানকে হত্যা করেছে। ফলে খ্রিস্টানদের বহু সৈন্য মারা গেল। এতে খ্রিস্টানদের মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। আবদুল আযীয আবার বললেন, মুসলিম মুজাহিদগণ, আরেকবার অনুরূপ আক্রমণ রচনা কর, যেমনটি ইতিমধ্যে করেছ। বীরত্বের সঙ্গে হামলা চালাও। আর একটি আক্রমণেই তাদেরকে নির্মূল করে দাও। এবারেও মুজাহিদরা প্রবল আক্রমণ রচনা করল; কিন্তু খ্রিস্টানরাও তা প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করল। তারা ঢাল দিয়ে মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাতকে বাধা দেয়ার প্রয়াসী হলো; কিন্তু অবস্থা এরূপ হলো যে, অনেকেরই ঢাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে মস্তকে গিয়ে তলোয়ারের আঘাত হানলো। এতে তারা আহত হয়ে এমনভাবে নিচে পড়ে গেল যে আর উঠতে সক্ষম হলো না। অনেকে বাঁচার জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেল; কিন্তু ঘোড়ার পায়ের আঘাতে তারাও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ফলে পর পর দু'টি আক্রমণে এত বেশী সংখ্যক সৈন্য নিহত হলো যে, কয়েক ঘন্টার যুদ্ধেও অনুরূপ হয়নি। অতএব খ্রিস্টানদের মনে এরূপ ভয়ের উদয় হলো যে, তারা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তাদের সামনে দেখতে পেলো। ফলে তাদের আর যুদ্ধ করার সাহস রইল না; কিন্তু তখন পর্যন্ত তাদের নেতা যুদ্ধরত থাকায় তারাও কোনমতে আক্রমণ প্রতিরোধ করে চলল। এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টান নিহত হলো। তাদের মৃতদেহ এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রইল। মাটি প্রস্তরময় বিধায় নিহতদের রক্ত মাটিতে শোষিত হলো না। ফলে রক্তের বন্যা বইতে শুরু করলো। সারা মাঠ লালে লাল হয়ে গেলো।

মুসলিম মুজাহিদরা তৃতীয়বার আরেকটি হামলা করলেন। এটা ছিল প্রথম দু'টির চাইতে আরো তীব্রতর। মুসলমানরা শশা ও খিরার ন্যায় তাদেরকে কাটতে লাগলেন। তাদের মৃতদেহে স্তূপ হয়ে গেল। রক্তের স্রোত বইতে লাগল। অবস্থা এরূপ দাঁড়াল

যে, মুসলমানরা ধীরে ধীরে তাদেরকে হত্যা করতে লাগলেন। খ্রিস্টানরা হতভম্ব হয়ে যাওয়ায় তারা সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ল। অতঃপর দেখা গেল, কেবল দু'শ খ্রিস্টান সৈন্য অবশিষ্ট রয়েছে। তারা দ্রুত ডিঙ্গিয়ে পালালো। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করল। ফলে আরো একশত নিহত হলো। বাকীরা কোনমতে আত্মরক্ষা করে পাহাড়ের বিভিন্ন গর্তে গিয়ে আত্মগোপন করল। তাদমীরও পালিয়ে গেল।

মুসলমানরা ফিরে এলেন। তাদের কেউ কেউ মৃত খ্রিস্টানদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে লিপ্ত হলেন। আর কেউ কেউ তাঁবু তুলে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রটি 'লোকতরাস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই যুদ্ধের জন্য স্থানটি আজো ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানরা অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র গুটিয়ে টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পূর্বের ধৃত খ্রিস্টানটি তাদেরকে পথ দেখিয়ে উরবোলা দুর্গে নিয়ে গেল। এই দুর্গটি সে অঞ্চলের রাজধানী। সেখানে তাদমীর অবস্থান করত। আবদুল আযীয বুঝতে পেরেছিলেন; তাদমীর সে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে হয়ত দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলিম সৈন্যদল সেখানে গিয়েই দুর্গটি অবরোধ করেন। যেহেতু সারা দিন মুজাহিদরা যুদ্ধ করেছে এবং তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত, তাই দুর্গের চারদিকে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকেন।

একত্রিশ

সুন্দরীদের আনন্দ

তারিককে কয়েদ করার সংবাদ শুনে মানুষ যত ব্যথিত হয়েছিল, তাঁর মুক্তির সংবাদ শুনে তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হলো। প্রায় সকলেই তাঁর মুক্তির সংবাদে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারিক যেমনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, তেমনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তিনি সকলেরই সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এ জন্যে সকলেই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কয়েদ করে মূসা প্রাসাদের যে কামরায় তাঁকে থাকতে দিয়েছিলেন, মুক্তি পেয়েও তিনি সেখানেই ফিরে গেলেন।

তারিক ছিলেন বার্বারের অধিবাসী। মূসা সেখানে সৈন্য প্রেরণ করলে তারিক স্বদেশের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন; সে যুদ্ধেও অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন; কিন্তু বার্বার বাহিনীর পরাজয়ের পর তারিক মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তিনি মূসার দাস রূপে নীত হন। কিছুদিন পর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মূসা তাঁকে আযাদ করেন এবং সামরিক বাহিনীতে অফিসার নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে নিজের যোগ্যতাবলে তিনি তান্‌জা'র গভর্নর নিযুক্ত হন। পরে স্পেনে অভিযান প্রেরণের প্রয়োজন হলে তাঁকে সে অভিযানের নেতা নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় নিজ বীরত্ববলে তিনি স্পেন জয় করতে সক্ষম হন। অতঃপর মূসা কর্তৃক বন্দী হয়ে আল্লাহ্‌র এক পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তবে হয়ত আল্লাহ্‌র প্রতি অভিযোগ করতেন অথবা মূসাও মুসলমানদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে মুরতাদ হয়ে যেতেন; কিন্ত কারো প্রতি তিনি কোন অভিযোগ করেন নি। বরং নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্পেনের গভর্নর বানিয়ে দিয়েছেন। যিনি একজন সাধারণ সেনাপতি রূপে স্পেনে এসেছিলেন, তিনি আজ সে দেশের গভর্নরের মহাসম্মানে ভূষিত। আসরের নামায পড়ে তিনি কামরার বাইরে এসে বসলেন। অল্প সময় পরই রাহীল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তার পরনে ছিল অনেক মূল্যবান পোশাক। তিনি মুচকি হাসছিলেন। তারিকের নিকটে এসেই তিনি বললেন, সালাম হে স্পেনের গভর্নর। তারিক তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন,

রাহীল হাসছে। তার সমস্ত চেহারায় গভীর আনন্দের ছাপ। তার উজ্জ্বল চোখ দুটো ছলছল করছে। এ সময় রাহীলকে আরো সুন্দরী দেখাচ্ছিল। তারিক তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, এসো হে সুন্দরী, এখানে বস। রাহীল তার পাশে বসতে বসতে বললেন, আমি কি সুন্দরী?

তারিকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি একদৃষ্টিতে রাহীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একে তো রাহীল পরমা সুন্দরী, দ্বিতীয়ত তার পরনে রয়েছে অনেক মূল্যবান পোশাক ও নানা প্রকার অলংকার, তৃতীয়ত তার পরিধেয় কাপড়ে এমন সব মূল্যবান সুগন্ধি ছিটানো হয়েছিল, যেন তার সমস্ত শরীরটিই একটি সুগন্ধি বস্তু। এসব কারণে তাকে সুন্দরের একটি সাক্ষাৎ প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল। তারিক তাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কোন কথাই যেন তাঁর কানে যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রাহীল জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছেন এমন করে?

তারিক তার দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ্‌র কুদরতের তামাশা দেখছি। রাহীল আড়নয়নে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, এখানে তামাশার কি হলো?

তারিক–আমি হয়ত ভুল করে তামাশা বলে ফেলেছি।

রাহীল হেসে ফেললেন; বললেন–আপনি এমন বেঁহুশ হয়ে গেলেন কি করে?

তারিক–তোমার মত সুন্দরীকে দেখে কারো কি হুঁশ থাকতে পারে?

রাহীল লজ্জা পেলেন। লজ্জায় আনত চোখ দু'টি আরো সুন্দর মনে হলো।

তারিক বললেন, তুমি যেরূপ সুন্দরী। তোমাকে দেখে কারো পক্ষেই ঠিক থাকা সম্ভব নয়।

রাহীল চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারিক আবার বললেন, তোমাকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রাহীল তার লাজ-নম্র মুখখানা তুলে বললেন, কেন?

তারিক–কারণ কয়েদী অবস্থায় তুমি আমাকে সমবেদনা জানিয়েছিলে।

রাহীল হঠাৎ বলে ফেললেন, কেন আমি কি সমবেদনা জানাতে পারি না ....একথা বলে তিনি লজ্জিত হলেন।

তারিক বললেন–তুমি কেন সমবেদনা জানিয়েছিলে?

রাহীল-মানবতার খাতিরে.....

তার কথা শেষ হতে না হতেই তারিক বললেন, কেবল মানবতার খাতিরে?

রাহীল–তাছাড়া আপনি আর কি বুঝেছেন?

তারিক–আমি বুঝেছি, এক বিদেশীর প্রতি তোমার ভালবাসা রয়েছে।

রাহীর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন–ভালবাসা! তারিক আদরের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁ। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, আমার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

রাহীল–আমার প্রতি কি আপনার ভালবাসা রয়েছে?

তারিক–হাঁ, আমি তা স্বীকার করছি।

রাহীল–তা কি অটুট থাকবে?

তারিক–ইনশাআল্লাহ।

রাহীল–আপনি কি আমাকে এর যোগ্য মনে করেন?

তারিক–তোমার প্রথম দৃষ্টিই আমার হৃদয় মনকে উজাড় করে নিয়েছিল। রাহীলের চেহারা খুশীতে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ্র বহুত শুকরিয়া।

তারিক–কিসের জন্য আল্লাহ্র শুক্রিয়া জানাচ্ছ?

রাহীল–এইজন্য যে, এক ইহুদী নারীর প্রতি আপনার ভালবাসা রয়েছে।

তারিক আবেগ আপ্লুত হয়ে বললেন, হাঁ ভালবাসি। মৃত্যু পর্যন্ত এ ভালবাসা অটুট থাকবে।

রাহীল-তা আমার জন্যও।

তারিক–তুমিও কি আমায় ভালবাস রাহীল?

রাহীল–হাঁ।

রাহীল আবার লজ্জায় চোখ নামালেন। তারিক কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন।

এমনি সময় তাদের কানে এলো কিছু শব্দ....

"ভালবাসার স্বীকৃতি হলো সারা

তুমি তার এবং সে তোমার।"

উভয়ে চোখ তুলে দেখতে পেলেন যে, নাঈলা ও বিলকীস এদিকে আসছে। পাঠকের হয়ত মনে আছে, নাঈলা মূসার সঙ্গে এবং বিলকীস ইসমাঈল ও মুগীছের সঙ্গে টলেডো এসেছিল। তখন পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করছিল। এ-দু'জন রমণীর সঙ্গে ইতিপূর্বেও রাহীলের পরিচয় ছিল। তাই তিনি তাদেরকে জানতেন। কিন্তু তারিক তাদেরকে চিনতেন না। রাহীল তাদেরকে দেখে লজ্জিত হলেন। তারা উভয়েই তারিকের সামনে রাহীলের পার্শ্বে গিয়ে বসলেন।

নাঈলা তারিককে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার মুক্তির জন্য আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিলকীস মুচকি হেসে বললেন, আমিও।

তারিক–আমি উভয়কেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রাহীল মাথা তুলে চিত্তাকর্ষক দৃষ্টিতে তারিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তাদের উভয়ের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তিনি হচ্ছেন স্পেনের রানী, রাজা রডারিকের স্ত্রী নাঈলা আর ইনি হচ্ছেন কর্ডোভার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমামনের সাধ্বী কন্যা বিলকীস।

তারিক–আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি হচ্ছেন সুন্দর হার পরিহিতা রমণী।

রাহীল–হাঁ, সারা দেশে তিনি এ নামেই পরিচিতা।

তারিক–আর ইনি হচ্ছেন সেই কুমারী, যাকে ছাড়াতে গিয়ে ইসমাঈল নিজেই তার সঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন।

নাঈলা-হাঁ, তিনিই সেই কুমারী।

তারিক–তিনি ইসমাঈলকে কোথায় রেখে এসেছেন?

নাঈলা–একটু মুচকি হেসে বললেন, তাকেই জিজ্ঞেস করুন।

বিলকীস–তিনি টলেডোয়ই আছেন।

তারিক–আল্লাহ্‌র বহুত শুক্‌রিয়া। তোমরা কিরূপে ছাড়া পেলে?

নাঈলা ছাড়া পাওয়ার সব ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। তাতে তারিক অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি বিলকীসকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি টলেডো আসলে কেন? বিলকীস কিছু না বলে লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। বিলকীস বললেন, ইসমাঈলের প্রতি তার হৃদয়ের টান তাকে এখান পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছে। অতঃপর নাঈলার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন–আমি তো শুনেছিলাম, আপনি মারিডায় চলে গেছেন। এখন এখানে আসলেন কি করে?

এখন নাঈলা লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। বিলকীস তৎক্ষণাৎ বললেন, আবদুল আযীযের প্রতি তাঁর হৃদয়ের আকর্ষণ তাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই তিনি এখানে চলে এসেছেন।

তারিক–তাহলে তো বলতেই হবে যে....

রাহীল তাঁর দিকে তাকাতেই তারিক কথা বন্ধ করে ফেললেন। রাহীল বললেন ঠিক আছে, আপাতত চুপ থাকুন। অন্যথায় তারা আমাদের সম্পর্কেও বলবে। নাঈলা মুচকি হেসে বললেন, স্পেনের শাসককে তো খুব করে শাসাচ্ছ।

রাহীল তারিককে বললেন, আপনি শোনলেন তো?

বিলকীস হেসে বললেন, বাড়িয়ে তো কিছু বলেননি।

সূর্য ডুবে গেল। অতএব তারিক মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন দয়া করে রাহীলকে ক্ষেপাবেন না।

নাঈলা এবং বিলকীস হেসে ফেললেন। নাঈলা বললেন, আল্লাহ্‌র কি কুদরত যে আপনাকে তার! তারিক মুচকি হেসে চলে গেলেন। অতঃপর এই তিন রমণী খোশ গল্পে মত্ত হলেন।

বত্রিশ

তাদমীরের চালাকি

আবদুল আযীয ও মুসলিম মুজাহিদরা খুব আরামে রাত যাপন করেন। খ্রিস্টানরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে যাতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে না পারেন তার জন্য আবদুল আযীয পাহারা মোতায়েন করেছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে সকলে ফজরের নামায আদায় করেন। অতঃপর অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। মুজাহিদরা প্রাচীরের নিকটবর্তী হতে না হতেই খ্রিস্টান সৈন্যরা প্রাচীরের উপর এসে জড়ো হয়। তখনো মুসলমানরা প্রাচীর থেকে অনেক দূরে ছিল। আবদুল আযীয ভেবে পান না যে, এত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তাদমীর এত অল্প সৈন্য নিয়ে কেন যুদ্ধে গিয়েছিল। প্রাচীরের চারদিক জুড়ে যেসব সৈন্য দেখা যাচ্ছে তাতে খ্রিস্টান সৈন্যের সংখ্যা দশ-পনেরো হাজারের কম হবে না। এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার যে, খ্রিস্টান সৈন্যরা হাতে তীর-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আক্রমণ করছে না। মুসলিম মুজাহিদরা এইজন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন যে, খ্রিস্টান সৈন্যরা আক্রমণের সূচনা করবে; কিন্তু খ্রিস্টান সৈন্যদের আক্রমণের কোন ভাব লক্ষ্য করা গেল না। মুজাহিদরা ভাবলেন, হয়ত তাঁরা সামনে অগ্রসর হলেই খ্রিস্টানরা উপর থেকে প্রস্তর ও তীর নিক্ষেপ শুরু করবে। কিছুক্ষণ পর আবদুল আযীয তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরাও তাকবীর দিলেন। চারিদিকে মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মুজাহিদরা চারদিক দিয়ে একই গতিতে এগুতে লাগলেন। আবদুল আযীয দুর্গের সদর দরজার দিকে এগুচ্ছিলেন, যা উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল, দক্ষিণদিকে ছিলেন উসমান। পশ্চিম দিকে হাবীব ইবন উবায়দা এবং পূর্বদিকে ইদরীস ইবন মায়সার। এ তিনজন ছিলেন অসীম সাহসী ও বিচক্ষণ যোদ্ধা। তাঁরা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করেছিলেন। আবদুল আযীয চাচ্ছিলেন, তিনি সর্বপ্রথম প্রাচীরের নিকটে পৌঁছবেন। তাই তিনি সকলের আগে আগে এগুচ্ছিলেন। খ্রিস্টানরা তা দেখে হৈ চৈ শুরু করে দেয়; কিন্তু কোন আক্রমণ করল না। মুসলমানরা সম্ভাব্য আক্রমণের মুকাবিলায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুতে লাগলেন। প্রত্যেক মুজাহিদ ঢাল দিয়ে নিজেকে ও স্বীয় বাহনকে আড়াল করে সামনে যেতে লাগলেন।

আবদুল আযীয ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন। তাঁর এক হাতে ছিল ইসলামী পতাকা, অপর হাতে তলোয়ার। তাঁর পেছনে পেছনে সকল মুজাহিদ সারিবদ্ধভাবে এগুচ্ছেন। আবদুল আযীযের দৃষ্টি ছিল প্রাচীর দ্বারের প্রতি নিবদ্ধ। তার চিন্তা ছিল যে, দ্বারের কাছে গিয়ে তা ভাঙ্গার চেষ্টা করবেন; কিন্তু দুর্গের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। পাদ্রীর পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধ সাদা পতাকা হাতে বেরিয়ে এলো।

মুসলমানরা বুঝতে পারলেন, পাদ্রীটি দুর্গবাসীদের দূত। তাকে দেখেই আবদুল আযীয থেমে যান। তাঁকে থামতে দেখে অন্য মুজাহিদরাও থেমে গেলেন। বৃদ্ধ দূত ঘোড়ায় চড়ে সাদা পতাকা তুলে এগিয়ে আসছিল।

লোকটি আবদুল আযীযের কাছে এসে আরবী ভাষায় বলল, আমি একজন দূত। আপনাদের নেতা আবদুল আযীযের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

আবদুল আযীয বললেন, আমি আপনার সামনেই উপস্থিত। বলুন কি বলতে চান।

দূত–আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

আবদুল আযীয–আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

দূত–মনে হয়, আপনি মুসলিম সৈন্যদলের নেতা। যার নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যরা দুর্গ ঘিরে রেখেছে।

আবদুল আযীয–হাঁ, তোমার ধারণা সত্য।

দূত–মেহেরবানী করে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ও আপনার মধ্যে আলোচনা চলে আপনার সৈন্যদলকে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে বলুন।

আবদুল আযীয–হাঁ, তাই হবে।

দূত-তাহলে মেহেরবানী করে সৈন্যদলকে নির্দেশ দিন।

আবদুল আযীয তৎক্ষণাৎ তিনজন মুজাহিদকে এই বলে পাঠান, প্রত্যেক সৈন্য যেখানে আছে, সেখানেই যেন অপেক্ষা করে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন সামনে কিংবা পেছনে না যায়। অতঃপর তিনি দূতকে বললেন, বল, তুমি কি বলতে চাও?

দূত-সর্বপ্রথম আরয এই যে, দুর্গবাসীদের পক্ষে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে এসেছি। আমাকে সন্ধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যেসব শর্ত আমাদের জন্য উপযোগী মনে করব, সেসবের ভিত্তিতে আমি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করব।

আবদুল আযীয–তাহলে তো তাদমীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

দূত–তাদমীর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি অহেতুক রক্তপাত এড়াতে চান।

আবদুল আযীয–অহেতুক রক্তপাত আমাদের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। একমাত্র অনন্যোপায় হয়েই মুসলমানরা অস্ত্র পরিচালনা করে।

দূত–তা ঠিক। আমার আরয, সন্ধির শর্তাবলী এমন হওয়া উচিত যাতে বীর মুজাহিদ যোদ্ধাদের বীরত্ব অক্ষুণ্ন থাকে এবং জেনারেল তাদমীরেরও সম্মান রক্ষিত হয়।

আবদুল আযীয–সে ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমরা কোনরূপ অসম শর্তাবলী আরোপ করব না।

দূত–তাহলে বলুন, কি কি শর্তের উপর সন্ধি হতে পারে।

আবদুল আযীয বললেন, সর্বপ্রথম কথা হলো, তাদমীর তার সকল সৈন্যসহ মুসলমান হয়ে যাবে। তাহলে তারা আমাদের তথা সকল মুসলমানদের ভাইরূপে গণ্য হবে। মুসলমান হিসেবে আমরা যেমন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি, তারাও সেসব সুযোগ-সুবিধা পাবে।

দূত-মাফ করুন। এটা অসম্ভব।

আবদুল আযীয–তাহলে ইসলামী সাম্রাজ্যের আনুগত্য ঘোষণা করতে হবে এবং নিজেদের নিরাপত্তাদানের জন্য মুসলিম সরকারকে জিযিয়া দিতে হবে।

দূত–এই শর্ত মেনে নিলে আমাদের উপর আর কোন প্রকার অত্যাচার হবে না তো?

আবদুল আযীয–নিশ্চয়ই না।

দূত–আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে তো?

আবদুল আযীয–তোমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

দূত–গির্জা নিরাপদ থাকবে তো?

আবদুল আযীয–অবশ্যই থাকবে।

দূত-জিযিয়ার পরিমাণ কি হবে?

আবদুল আযীয–পরিমাণ অতি নগণ্য। তাদমীর এবং অন্য অফিসাররা বার্ষিক এক দীনার এবং সাধারণ মানুষ অর্ধেক হারে জিযিয়া দেবে।

দূত–আমরা তা গ্রহণ করলাম।

আবদুল আযীয–সকলকে এ কথার উপর অঙ্গীকার করতে হবে যে, সর্বদা মুসলমানদের অনুগত থাকবে, মুসলমানদের কোন শত্রুদেরকে তারা কোনরূপ সহায়তা বা আশ্রয়দান করবে না। যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে তাদেরকে জুলুম করবে না।

দূত–আমরা সেসবের অঙ্গীকার করব এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকব।

আবদুল আযীয–একজন অফিসারসহ দু'শ মুসলিম মুজাহিদ তোমাদের দুর্গে অবস্থান করবে। তাদের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের বহন করতে হবে।

দূত–আমরা তা গ্রহণ করলাম।

আবদুল আযীয–তাহলে সন্ধিপত্র লেখা হোক।

দূত-তা-ই হোক।

আবদুল আযীয–সন্ধিপত্র লেখা হোক এবং ইতিমধ্যে তাদমীরকে ডেকে নিয়ে আস। কারণ সন্ধিপত্রে তাকেই স্বাক্ষর করতে হবে।

দূত–আপনি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করুন। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসব।

আবদুল আযীয–তা হলে আমার সঙ্গে এসো।

আবদুল আযীয দুর্গের কাছ থেকে চলে আসেন। সকল মুজাহিদও নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন। আবদুল আযীয নিজ তাঁবুতে বসে সন্ধিপত্র প্রস্তুতে লিপ্ত হন। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে এ সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আমরা এখানে এর সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করছি:

আবদুল আযীয ইবন মূসা ইবন নূসায়র ও তাদমীর ইব্ন ওয়াদ-এর মধ্যকার সন্ধির শর্তাবলী:

আল্লাহ্ তা'আলার নামে আবদুল আযীয এবং তাদমীরের মধ্যে এ সন্ধি সম্পদিত হচ্ছে। তাদমীরের শাসন পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদমীর এ চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ মুসলিম সরকার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। তার প্রজাদের ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলিম সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। তাদের গির্জার কোনরূপ অবমাননা করবে না। তাদমীর ও তার প্রজাদেরকে নিম্নলিখিত শর্তাবলীর উপর অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

১. আমাদের শত্রুদেরকে কোনরূপ সহায়তা বা আশ্রয়দান করা চলবে না।
২. শত্রুদের সম্বন্ধে কোন তথ্য গোপন করা যাবে না।
৩. সর্বদা মুসলিম সরকারের অনুগত থাকতে হবে।
৪. প্রতি বছরই জিযিয়া আদায় করতে হবে।
৫. মুসলমানদের কোন ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।
৬. কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা চলবে না।
৭. মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা দিতে হবে এবং মসজিদ নির্মাণে কোনরূপ বাধা প্রদান কিংবা কোনরূপ অসম্মান করা চলবে না।
৮. যে সকল মুসলমান দুর্গে অবস্থান করবে, তাদের সঙ্গে কোনরূপ শত্রুতা কিংবা ধোঁকাবাজি করা চলবে না।

চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে আবদুল আযীয বললেন, এখন তাদমীরকে ডেকে আনা যায়। কারণ তাকে শর্তাবলী পাঠ করে তারপর সই করতে হবে।

দূত–ঠিক আছে, প্রথমে আপনি সই করুন। তার পর আমি তাকে ডেকে আনব।

আবদুল আযীয–আমার দস্তখত তখনই দেব, যখন তাদমীর এসে তা পাঠ করবে।

দূত–তৎক্ষণাৎ তার লম্বা দাড়ি ও লম্বা জুব্বা টেনে খুলে ফেলল।

আবদুল আযীয ও অন্যান্য মুজাহিদ লক্ষ্য করলেন, দূতই যে স্বয়ং তাদমীর। অতএব সকলেই অবাক বিস্ময়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তেত্রিশ

তাদমীরের বুদ্ধিমত্তা

সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থেই তাদমীরের সে বুদ্ধিমত্তার কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টান ও আরব ঐতিহাসিকগণ বিস্তারিতভাবে এর বিবরণ দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদমীর অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেননা শত্রুদের মধ্যে এভাবে বেরিয়ে আসা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসা তার জন্যে একটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ ছিল।

আবদুল আযীয তাকে লক্ষ্য করে বললেন–তাদমীর, এতে সন্দেহ নেই যে, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একটি অনন্যসাধারণ সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছ; তবে তুমি কিছু নির্বুদ্ধিতার কাজও করেছ।

তাদমীর–সেটা কিরূপ?

আবদুল আযীয–তোমার তো জানা আছে যে, সর্বপ্রথম তুমিই মুসলমানদের মুকাবিলা করেছিলে। মুসলমানরা তা এখনো ভুলেনি।

তাদমীর–হাঁ, আমার মনে আছে।

আবদুল আযীয–তুমিই ইসমাঈলকে বন্দী করেছিলে।

তাদমীর–জী হাঁ।

আবদুল আযীয–এর পর রডারিকের সঙ্গে একত্রিত হয়েও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ।

তাদমীর–জী হাঁ, করেছি।

আবদুল আযীয–আমার সঙ্গেও যুদ্ধ করেছ।

তাদমীর–জী হাঁ, সেটা তো গতকালকের ঘটনা।

আবদুল আযীয–এসব কথা মনে করে তোমার কি মনে হয় না যে, আমরা তোমার রক্ত-পিয়াসী?

তাদমীর–হাঁ, নিশ্চয়ই মনে হয়।

আবদুল আযীয–তা জেনেও এ-ভাবে শত্রু পরিমণ্ডলে বেরিয়ে আসা তোমার কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে?

তাদমীর–কেন এমন করেছি, তা কি আপনি জানেন?

আবদুল আযীয–না।

তাদমীর–তা হলে শুনুন, আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, মুসলমানরা সত্যবাদী এবং প্রতিজ্ঞাপূর্ণকারী। তারা যা ওয়াদা করে, কখনো তার খেলাফ করে না। তাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আত্মপ্রকাশ করি নি; কিন্তু যখন সন্ধিপত্র সম্পাদিত হলো তখনই আমি আমার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলাম।

আবদুল আযীয–মুসলিম না হয়ে যদি অন্য কোন জাতি হতো?

তাদমীর–তাহলে তাদেরকে বিশ্বাস করতাম না।

আবদুল আযীয–তাহলে এখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কর।

তাদমীর তাতে স্বাক্ষর করে বললেন, দয়া করে আমাকে এর একটি অনুলিপি দিন।

আবদুল আযীয–ঠিক আছে।

এই বলে সন্ধিপত্রটির একটি অনুলিপি প্রস্তুত করে তাকে দেয়া হলো।

তাদমীর বললেন, আমি আপনাকে দাওয়াত জানাচ্ছি।

আবদুল আযীয–আমি গ্রহণ করছি, কিন্তু তুমি যদি কোনরূপ প্রতারণা কর?

তাদমীর–বিশ্বাস করুন আমি প্রতারণা করতেই পারি না।

আবদুল আযীয–কেন?

তাদমীর–আপনি দুর্গে গিয়েই কারণ বুঝতে পারবেন।

আবদুল আযীয–কেবল এক শর্তে আমি দুর্গে যেতে পারি।

তাদমীর–কোন্ শর্তে?

আবদুল আযীয–তোমাকে দুর্গের সকল দ্বার খুলে রাখতে হবে।

তাদমীর–আমি আজকেই সকল দরজা খুলে দেব।

আবদুল আযীয–তাহলে আমি দাওয়াত গ্রহণ করলাম।

তাদমীর উঠতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খবর এলো যে, খাবার প্রস্তুত রয়েছে।

আবদুল আযীয খাবার নিয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং তাদমীরকেও খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

তাদমীর বললেন, তা-ই হোক।

অল্পক্ষণের মধ্যে খাবার নিয়ে আসা হলো। তা ছিল অত্যন্ত সাধারণ ধরনের। দু'জনই দু'বন্ধুর ন্যায় একত্রে আহার গ্রহণ করলেন। আহার সেরে তাদমীর উঠে দাঁড়ালেন এবং অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। তার যাবার পরপরই আবদুল আযীয উসমান, হাবীব এবং ইদরীসকে ডেকে পাঠান। তাদের জানিয়ে দেন তাদমীরের সঙ্গে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছে। অতএব সকলেই নিজ নিজ তাঁবুতে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

সন্ধি হয়ে যাওয়ায় সকলেই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেন এবং আহার সেরে ময়দানে গিয়ে জামায়েত হন। দশজন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারা মাঠের সবুজ ঘাসে বসে পড়েন এবং বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হন।

সেদিন তারা দুর্গের বাইরেই অবস্থান করেন। পরদিন সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের সকল দ্বার খুলে দেয়া হলো। কিছুক্ষণ পর তাদমীর কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মুসলিম সৈন্যদলের দিকে আসতে থাকেন।

মুসলিম মুজাহিদরাও তাদমীরের আগমন লক্ষ্য করলেন। আবদুল আযীয মুজাহিদদেরকে তাদমীরের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার কাহিনী শুনিয়েছিলেন। মুসলমানরা নিজেরাও বীর পুরুষ, তাই তারা বীর পুরুষদের সম্মান করতেন। তারা তাদমীরকে স্বাগত জানানোর জন্য সবাই প্রস্তুত হন এবং তাঁবুর বাইরে এসে সাদর অভিবাদন জানান।

মুসলমানদের অনুরূপ আন্তরিকতা লক্ষ্য করে তাদমীর অত্যন্ত খুশী হন। তিনি আন্তরিকভাবে মুসলমানদের কৃতজ্ঞতা জানান এবং ধন্যবাদ দেন।

আবদুল আযীয তাদমীরকে নিজ তাঁবুতে নিয়ে যান এবং বিছানায় বসে পড়েন।

তাদমীর বললেন, আমাকে আপনারা যে আন্তরিকতা দেখালেন, তাতে আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নূইয়ে আসছে।

আবদুল আযীয বললেন, আমাদের নবী চরিত্রও সভ্যতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি স্বয়ং মুসলমানদেরকে সৎচরিত্র ও ভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছেন। চরিত্র মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। যে মুসলিম চরিত্রবান নন, তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। তাই সকল বিশ্বাসী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশংসামুখর। আমরা অসির সাহায্যে সমগ্র বিশ্ব জয়ের প্রয়াসী নই; বরং আমাদেরে চরিত্র মাধুর্য দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করতে চাই।

তাদমীর–এ জন্যেই খ্রিস্টানরা আপনাদেরকে শত্রু জেনেও আপনাদেরই মুখাপেক্ষী।

আবদুল আযীয–মনে রেখো, অস্ত্রবলে বিজিত দেশ ততক্ষণই নিয়ন্ত্রণে থাকে, যতক্ষণ অস্ত্রবল বিদ্যমান থাকে; কিন্তু চরিত্রবলে যা জয় করা হয়, চিরদিন তা অনুগত থাকে।

তাদমীর–তা ঠিক। আচ্ছা, আপনি আমাদের সঙ্গে দুর্গে যাচ্ছেন তো।

আবদুল আযীয –যখন কথা দিয়েছি, অবশ্যই যাব।

তাদমীর–তাহলে চলুন।

আবদুল আযীয হাবীব, উসমান, ইদরীস এবং আরো প্রায় একশ' অশ্বারোহীকে সঙ্গে নেন এবং তাদমীরের সঙ্গে দুর্গের দিকে যাত্রা করেন।

তাঁরা দুর্গের নিকট পৌঁছে দেখতে পেলেন, দুর্গের প্রাচীর আজ সম্পূর্ণ জনশূন্য। একজন সৈন্যকেও কোথাও ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল না।

আবদুল আযীযের মনে সন্দেহ হলো। কোনরূপ ষড়যন্ত্র পাকানো হয়নি তো? কিন্তু যেহেতু দাওয়াত গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তিনি যাত্রাও করেছিলেন, তাই কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করে নীরবে যেতে লাগলেন।

দুর্গ দ্বারে পৌঁছে দেখতে পেলেন দ্বারটি অত্যন্ত মজবুত ও দৃঢ়। তিনি দ্বার পেরিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে গিয়েই বাদ্যের সুর শুনতে পান। বালিকা বাদকদল বাঁশী বাজাচ্ছিল। তাদের পরনে ছিল সুন্দর সুন্দর পোশাক। আবদুল আযীয ও সঙ্গি মুজাহিদরা একবার তাদেরকে দেখেই চোখ নামিয়ে ফেলেন। তাদমীর মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করছিলেন। তার ধারণা ছিল, মুসলমানরা সুন্দরী বালিকাদেরকে দেখে খুশী হবেন; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, তারা চোখ নামিয়ে ফেলেছে, তখন তাদমীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। মুসলমানদের সততা ও চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে তার মনে আরো গভীর বিশ্বাস জন্মে।

আবদুল আযীয বললেন, আমাদের ধর্মে বাদ্য শোনা বৈধ নহে। দয়া করে তা বন্ধ করে দিন।

তাদমীর তৎক্ষণাৎ বাদ্যযন্ত্র বন্ধ করে দেন। মুসলিম মুজাহিদরা তাদমীরের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন। গতকাল প্রাচীরের উপর যেসব খ্রিস্টান সৈন্য দাঁড়ানো ছিল, মুজাহিদরা মনে মনে তাদেরকে খুঁজছিলেন; কিন্তু কাউকেই কোথাও দেখা গেল না। তাদমীর তা লক্ষ্য করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি দেখছেন?

আবদুল আযীয –গতকাল যেসব সৈন্য প্রাচীরের উপর মোতায়েন ছিল আমি তাদেরকে খুঁজছি।

তাদমীর মুচকি হেসে বললেন, আমি তাদের বিদায় দিয়ে দিয়েছি। সন্ধি হওয়ার পর এসবের আর প্রয়োজন নেই।

আবদুল আযীয–আমরা তো কাউকেই বেরিয়ে যেতে দেখিনি?

তাদমীর–তাদের কেউ বাইরেও যায়নি।

আবদুল আযীয–তাহলে তারা কোথায় গেছে?

তাদমীর–তারা দুর্গের ভেতরই রয়েছে, তবে তারা সৈন্য নয়।

আবদুল আযীয–তাহলে তারা কে?

তাদমীর–এখনই আপনি তা বুঝতে পারবেন।

কিছুদূর গিয়ে তাঁরা একটি সৈন্যদল দেখতে পান। সে দলের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত কিন্তু সকলেই ছিল ছোট আকৃতির। আরো নিকটে গিয়ে দেখতে পান, তারা সবাই সুন্দরী নারী, তারা পুরুষদের পোশাক পরে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে মুসলমানরা অত্যন্ত বিস্মিত হন।

আবদুল আযীয তাদমীরকে জিজ্ঞেস করলেন, এরাই কি সেই সৈন্যদল যারা গতকাল প্রাচীরের উপর দাঁড়ানো ছিল?

তাদমীর–জী হাঁ। আমি দুর্গে প্রবেশ করে দেখি, পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। সিপাহীর সংখ্যা দু'শতের অধিক ছিল না। তাই সর্বপ্রথম এই সকল মেয়েদেরকে পুরুষদের পোশাক পরিধান করাই। মাথায় চুল এমনভাবে বাঁধান হয় যে, তা দেখে দাড়ি বলে মনে হয়। এরপর তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে প্রাচীরের উপর মোতায়েন করি। এরাই ছিল আমার একমাত্র সৈন্য। মুসলমানরা তাদমীরের বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হন।

আবদুল আযীয–তুমি মেয়েদেরকে পুরুষ বানিয়ে এবং নিজে পাদ্রীর বেশ ধরে আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছ। তোমার এ কৌশল দেশকে রক্ষা করেছে।

তাদমীর–আমার এ কৌশলের সঙ্গে আপনার ইনসাফের সমন্বয়ের ফলেই দেশ রক্ষা পেয়েছে। আমার আত্মপ্রকাশের পর আপনারা যদি আমাকে হত্যা করে ফেলতেন, তাহলে তো এদেশ আপনাদেরই অধীন হতো।

আবদুল আযীয–আমরা মুসলমান। মুসলমানরা ওয়াদা করে কখনো ভঙ্গ করে না।

তাদমীর–আমার তা জানা ছিল। এজন্যই আমি এত সাহস করেছিলাম।

এরপর তারা দুর্গের রাজকক্ষের নিকট পৌঁছে যান। তারা অশ্ব ছেড়ে মহলে প্রবেশ করেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মুসলমানরা নিজ তাঁবুতে ফিরে এলেন। পরদিন তাদমীর জিযিয়া নিয়ে আবদুল আযীযের কাছে উপস্থিত হন। আবদুল আযীয এসব বুঝে নিয়ে পর দিন টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

চৌত্রিশ

তুষ্ট লোকদের আকঙ্ক্ষা

টলেডোয় আমোদ-প্রমোদের ধূম পড়ে গেল। প্রায় সকল মুজাহিদ দলই ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আবদুল আযীযও তাঁর সৈন্যসহ টলেডোয় পৌঁছে গেলেন; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোনরূপ অহংকার বা প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। ফলে খ্রিস্টান ইহুদীরা নির্ভয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা মুসলমানদের কাছে বসে থাকতো।

স্পেনের ইহুদীরা ছিল অধিকাংশই সম্পদশালী। এ জন্য খ্রিস্টান শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। তাদের নানাভাবে শোষণ করত। তাছাড়া খ্রিস্টান সমাজে তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না; সবাই তাদেরকে হীন দৃষ্টিতে দেখতো, যেমন আজকের ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে দেখা হয়ে থাকে। ইহুদীরা খ্রিস্টানদের পাশেও বসতে পারতো না; কিন্তু স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহুদীরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারা সকল প্রকার নাগরিক অধিকার ফিরে পেলো।

ইহুদীরা তাদের হারানো সম্মান ফিরে পেয়ে অন্যদের চোখেও সম্মানের পাত্রে পরিণত হলো। মুসলমানদের চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক ইহুদী ও খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমান হওয়ার ফলে তারা মুসলমানদেরই অনুরূপ সম্মান লাভ করে।

নও-মুসলিমদেরকে মুসলমানরা যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখতেন। তাদেরকে দেখে ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও নও-মুসলিমদেরকে যথেষ্ট সম্মান করতো। ধীরে ধীরে টলেডোয় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অনেক ইহুদী ও খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন।

রাহীলের পিতাকে তারিক মালাগা থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনিও সে সময় টলেডোয় অবস্থিত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। রাহীলের পিতা এবং আমামন একই সঙ্গে ছিলেন। তাদের দু'জনের দু'কন্যাও তাদের সঙ্গে ছিলেন। আবদুল আযীযের টলেডোয় পৌঁছার আগেই উক্ত দু'জন তাদের কন্যাসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই মহলে অবস্থান করছিলেন।

রডারিকের এ মহলটি ছিল খুবই প্রশস্ত এতে ছিল অনেক কামরা। কয়েকটিতে মূসা, কয়েকটিতে তারিক এবং বিভিন্ন অফিসাররা অবস্থান করছিলেন। কয়েকটি নাঈলার অধীনে ছিল।

আবদুল আযীযও এসে এখানেই অবস্থান করেন। আমামন ও ইয়াকুব একটি কামরায় অবস্থান করছিলেন। এখন সমগ্র স্পেনে মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। একদিন কাউন্ট জুলিয়ান এবং সেভিলের পাদ্রী স্ক্যাফ এসে উপস্থিত হলো।

মূসা আন্তরিকভাবে তাদেরকে অভিনন্দন জানান। জুলিয়াস মূসাকে বললেন, এ মহাবিজয়ে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্যেই আমি এখানে এসে পৌঁছেছি।

মূসা–এ সমৃদ্ধ ও অনুপম দেশটি আক্রমণে আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জুলিয়ান–একজন অত্যাচারী রাজার পতন ঘটিয়ে দেশবাসীকে অত্যাচার মুক্ত করার জন্য আমরা স্পেনবাসী আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মূসা–আপনার প্রতিশোধ স্পৃহা মিটেছে তো?

জুলিয়ান–জী হাঁ, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমনটিই হয়েছে। এখন কোথায় গেল রডারিক, কোথায় রইল তার দোসররা। সবারই তো পতন হলো। এখন দেশে শান্তির যুগ এসেছে। খ্রিস্টান ও ইহুদীরা সকলেই আপনাদের ন্যাপরায়ণতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মূসা–হয়ত আপনার কন্যা ফ্লোরিন্ডার মনের ক্ষোভও নিশ্চয়ই দূর হয়ে গেছে।

জুলিয়ান–জী হাঁ, সে এখন খুবই খুশী এবং আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি আমার ফরিয়াদে সাড়া না দিতেন, তাহলে আমি হয়ত এ লম্পট রডারিকের প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হতাম না। বরং মনের ক্ষোভে-দুঃখে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।

মূসা–আমি সিউটায় আপনার শাসন ক্ষমতা বহালের নির্দেশ দিচ্ছি।

জুলিয়ান–আপনার এ মহানুভবতার জন্যে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মূসা জুলিয়ানের শাসনক্ষমতা বহালের নির্দেশনামাটি তার কাছে হস্তান্তর করেন। তাতে জুলিয়ান আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে চলে যান। যেদিন জুলিয়ান চলে গেলেন এর পরদিন নাঈলা নিজ কামরার সামনে বসেছিলেন। এমনি সময় সেখানে আবদুল আযীয এসে উপস্থিত হন।

আবদুল আযীযকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলা করছিল। তিনি আবদুল আযীযকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন।

আবদুল আযীয সেখানে গিয়েই বসে পড়েন। নাঈলাও তাঁর সামনে বসে পড়লেন। আবদুল আযীয বললেন, আল্লাহর হাজারো শুকরিয়া যে, আমি তোমাকে আবার দেখতে পেলাম। নাঈলা মুচকি হেসে বললেন, আমার কথা আপনার মনে কি সব সময় ছিল?

আবদুল আযীয–নিশ্চয়ই মনে ছিল।

নাঈলা–ভণিতা রাখুন তো।

আবদুল আযীয –তুমি আমার উপর রাগ করছ নাকি?

নাঈলা–না, তবে আমি কোনরূপ ভণিতা পছন্দ করি না।

আবদুল আযীয –আমি ভণিতা করছি নাকি?

নাঈলা–না, ভণিতা করবেন কেন, খুবই ঠিক কথা বলছেন।

আবদুল আযীয–অদ্ভুত ব্যাপারে তো? তুমি বিশ্বাস করছ না কেন যে, আমি মুহূর্তের জন্য তোমাকে ভুলতে পারিনি; বরং তোমার ছবি সর্বদা আমার সামনে ভেসে উঠতো।

নাঈলা–এর প্রমাণ তো এটাই যে, টলেডো ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে এসে গেছেন, তাই না?

আবদুল আযীয টলেডো ফেরার দু'দিন পর নাঈলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এজন্যেই নাঈলা তাঁকে ক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আবদুল আযীয বললেন, আমি তো পৌঁছেই আসতে চেয়েছিলাম...............

নাঈলা তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বললেন, কিন্তু আসতে পারেননি, তাই তো?

আবদুল আযীয –হাঁ।

নাঈলা–কেন?

আবদুল আযীয–তোমার সৌন্দর্য-ভীতি আমাকে আসতে দেয়নি।

নাঈলা–তাহলে আজ সাহস হলো কি করে?

আবদুল আযীয–আজকে অনেক কষ্টে মনটাকে শক্ত করলাম।

নাঈলা–সে দিনও তো শক্ত হতে পারতেন।

আবদুল আযীয–চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

নাঈলা–আপনি এত ভীরু কেন?

আবদুল আযীয–এটাই তো বিস্ময়ের কারণ যে, আমি কখনো ভীরু নই; কিন্তু তোমার সামনে এলেই ভীত হয়ে পড়ি।

নাঈলা–এসব কথা আমার পছন্দ নয়।

আবদুল আযীয–কথা তো নয়; বরং এটাই বাস্তব।

নাঈলা–আমাকে কি একটা কিছু করবেন?

আবদুল আযীয–আমার পক্ষে যদি কিছু করা সম্ভব হতো তবে অবশ্যই করতাম।

নাঈলা আড়চোখে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, কি করে ফেলতেন আমাকে?

আবদুল আযীয–আমি তোমাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতাম।

নাঈলা–আমাকে মুসলমান বানাবেন কেন, আপনি খ্রিস্টান হতে পারেন না?

আবদুল আযীয–না, এইজন্য পারি না যে, খ্রিস্টানরা ইঞ্জীলকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। ফলে হযরত ঈসা (আ) যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, খ্রিস্টানরা আজকে আর তাতে নেই।

নাঈলা–আপনি তা কি করে জানলেন?

আবদুল আযীয–তুমি কি কখনো আল্লাহ্কে দেখেছো?

নাঈলা–না।

আবদুল আযীয–আল্লাহ কি মানুষের মতই?

নাঈলা–না।

আবদুল আযীয–তাহলে আল্লাহ্ মানুষের পিতা হন কি করে?

নাঈলা–আপনি কি জানেন যে, হযরত ঈসার পিতা ছিল না?

আবদুল আযীয–আমি জানি, তুমি তো এও জান যে আল্লাহ্ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

নাঈলা–হাঁ।

আবদুল আযীয–আল্লাহ তাঁর কুদরতের নমুনাস্বরূপ হযরত ঈসা (আ)-কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। শুধু হযরত ঈসা কেন, আল্লাহ্ কারো পিতা নন। তিনি একা। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে দিয়েছেন যে, "হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো জনক নন; তাঁকে কেউ জন্ম দেননি; কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়।"

নাঈলা–এসব কথার অর্থ কি?

আবদুল আযীয–অর্থ এই যে তুমি মুসলমান হয়ে যাও।

নাঈলা–কিন্তু আপনি খ্রিস্টান হতে পারবেন না।

আবদুল আযীয–কোন মুসলমান কোন অবস্থায়ই নিজ ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে না।

নাঈলা–তাহলে আপনার ভালবাসার দাবীর গুরুত্ব কতখানি?

আবদুল আযীয–গুরুত্ব যথেষ্ট, তোমার প্রতি আমার সীমাহীন ভালবাসা রয়েছে।

নাঈলা–কিন্তু ভালবাসার গুরুত্ব ধর্মের অনেক ঊর্ধ্বে। এ জন্য ভালবাসার খাতিরে ধর্ম ত্যাগ করতে হয়।

আবদুল আযীয–না, ধর্ম ভালবাসার ঊর্ধ্বে এবং তাই ভালবাসার জন্যে ধর্ম ত্যাগ করা যায় না।

নাঈলা–কেন?

আবদুল আযীয–ভালবাসা তো একটি জৈবিক ব্যাপার। তাই জীবনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসারও পতন ঘটে, কিন্তু ধর্ম চিরঞ্জীব। মৃত্যুর পর ধর্ম কাজে আসে এবং মানুষকে বেহেশতের সুখ দান করে।

নাঈলা–তাহলে আপনি ধর্ম ত্যাগ না করলে আমিই করব। আমি ভালবাসার জন্যে আমার জীবন দিতে পারি। তাহলে আমিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো।

আবদুল আযীয–তাহলে তো তোমার এ ধর্মান্তর অর্থহীন হবে।

নাঈলা–কি জন্য?

আবদুল আযীয–কারণ কোন কিছুর লোভে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ঠিক নয়।

নাঈরা–তাহলে?

আবদুল আযীয–ইসলামকে সঠিক ধর্ম জেনে গ্রহণ করলেই তা উপকারে আসবে।

নাঈলা–আমি ইসলামকে সঠিক ধর্ম বলেই জানি। কেননা ইসলাম যদি আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ধর্ম না হতো, তবে মুসলমানরা স্পেন জয় করতে সমর্থ হতো না।

আবদুল আযীয–তাহলে তুমি মুসলমান হতে পার।

নাঈলা–আপনি আমাকে মুসলমান করুন।

আবদুল আযীয কালেমা পড়িয়ে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং পিতা মূসাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। মূসা জানতে পেরেছিলেন যে, আবদুল আযীয নাঈলাকে, ইসমাঈল বিলকীসকে এবং তারিক রাহীলকে ভালবাসে। সুতরাং তিনি উক্ত তিনজনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সকলের সম্মতি পাওয়া গেলে ইসলামী নিয়ম মাফিক এক অনাড়ম্বর পরিবেশে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের পর আবদুল আযীয নাঈলাকে "হার পরিহিতা সুন্দরী" তারিক রাহীলকে 'স্পেনের সুন্দরী' এবং ইসমাঈল বিলকীসকে 'স্পেনের চন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর এ তিন দম্পতি অত্যন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে থাকেন।

এভাবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানরা যে দেশেই গিয়েছে, সে দেশকে, সে দেশের অধিবাসীদেরকে আপন করে নিয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত করেছে। মুসলমানরা সমকালীন বিশ্বে নজিরবিহীন নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে স্পেনকে সমৃদ্ধ করেছে। তাতে বিশ্ববাসী বিস্মিত হয়েছে। এসব আবিষ্কারের কথা আজো ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

ইফাবা-২০০৭-২০০৮-প্র/৯৮৮৭ (উ)-৩২৫০

তারিক ইব্ন যিয়াদ
মাওলানা সাদিক হুসাইন
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা অনূদিত
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন: ৭০
ইফাবা প্রকাশনা: ১৫৯৫/১
ইফাবা গ্রন্থাগার: ৮৯১.৪৩৩
ISBN: 984-06- 1153-4
প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৮
দ্বিতীয় সংস্করণ
অক্টোবর ২০০৭
আশ্বিন ১৪১৪
শাওয়াল ১৪২৮
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১২৮০৬৮
প্রুফ সংশোধনে
মোহাম্মদ মোকসেদ
বর্ণ বিন্যাস
আর. এম. ডট. কম
২৩১. পূর্বধোলাইরপাড়, শ্যামপুর, যাত্রাবাড়ী ঢাকা- ১২০৪
প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১৭২১১
মূল্য : ৮৫. ০০ টাকা

TARIQUE IB'N ZIAD (A Historical Novel Based on Life of Tarique Ibn Ziad): Written by Moulana Sadique Hussain in Urdu, translated By A.N.M Mahbubur Rahman Bhuiyan into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207. Phone 8128068. october 2007

E-mail: islamicfoundation@yahoo.com.
Website: www.islamicfoundation.org.bd
Price: Tk 85.00; US Dollar: 2.50